প্রহেলিকা

অনিরুদ্ধ বসু

অনুবাদ ঃ পার্থ মুখোপাধ্যায়

প্রহেলিকা

অনিরুদ্ধ বসু

অনুবাদ ঃ পার্থ মুখোপাধ্যায়



প্রহেলিকা

অনিরুদ্ধ বসু

অনুবাদঃ পার্থ মুখোপাধ্যায়



স্মৃতি পাবলিশার্স

PROHELIKA

A Bengali Novel by **ANIRUDDHA BOSE**

Website: **www.smritipublishers.com**

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০১৯

প্রথম ই-বুক প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০১৯

প্রচ্ছদপটঃ অদিতি চক্রবর্তী

অলংকরণঃ অনিরুদ্ধ বসু

প্রকাশকঃ

স্মৃতি পাবলিশার্স

'ওয়েসিস' সি এফ – ৪১

সেক্টার ১

সল্টলেক সিটি

কলকাতা ৭০০০৬৪

ISBN No: 978-81-941495-3-8

উৎসর্গ

বন্ধু অনিমেষকে

সূচি

ভূমিকা

বাংলায় হুডানিট গোছের রহস্য উপন্যাস বা গল্পের জন্ম ঢের আগে হলেও থ্রিলারধর্মী গল্প-উপন্যাসের সম্ভার খুব বেশিদিন জায়গা করে নিতে পারেনি। গত শতকের ছয় বা আরেকটু পিছোলে বড় জোর পাঁচের দশকে এই জঁরের কাহিনিমালা আস্তে আস্তে বাঙালি লেখকদের নজর টানতে শুরু করে। প্রবল গতিময় এইসব লেখা তখন যাঁরা লিখতে চেষ্টা করছিলেন তাঁদের সামনে সবথেকে বড় সমস্যা ছিল প্রধানত চোখে পড়ার মতো ওঠাপড়াহীন নিস্তরঙ্গ বাঙালি জনজীবন। ফলে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলুন বা নীহাররঞ্জন গুপ্তদের মতো প্রবল জনপ্রিয় লেখক থাকা সত্ত্বেও বাংলায় জেমস হেডলি চেজ, ডেসমন্ড ব্যাগলি বা ফ্রেডরিক ফরসাইথদের দেখা পাঠক পাননি। তখন তাই আমাদের সাধ মেটাতে হত এই ধারার বিদেশি লেখকদের লেখার কিছু প্রায়-অক্ষম বাংলা অনুবাদ বা তাঁদের ছায়া অবলম্বনেই নিঃসন্দেহে কিন্তু বাহ্যত কিছু আপাত-সিরিয়াস অথচ চরিত্রে মূলত পাল্প ঘরানার লেখাপত্র গোগ্রাসে গিলে। 'রোমাঞ্চ' বা 'রহস্য পত্রিকা' গোছের সাময়িকীগুলো তখন সবে বাজারে আসতে শুরু করেই আম-পাঠকদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। শহর-মফস্বলে তখনো রমরম করে চলতে থাকা লাইব্রেরির বইয়ের ক্যাটালগ ঘাঁটলে এসবের সাক্ষাৎ আজও মিললেও মিলতে পারে।

অবস্থার ভেতরে ভেতরে হলেও বদল ঘটতে শুরু করেছিল মোটামুটি আটের শেষ বা নয়ের দশকের গোড়া থেকে। এবং তার স্পষ্ট অভিঘাত টের পাওয়া যেতে থাকল একুশ শতকে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে। আন্তর্জালিক দুনিয়া বাঙালি পাঠককে এনে দাঁড় করিয়ে দিল ক্রম-পরিবর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের ঠিক মধ্যিখানে। মানসিকতায় বিশ্বগ্রামের বাসিন্দা হয়ত তখনো হতে পারিনি পুরোপুরি, তবু আমাদের ভাবনা তথা দৃষ্টিকোণের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু ঘটে যাচ্ছে বিপুল রদবদল। জীবনকে দেখার চোখটাই যেমন তখন বদলে যাচ্ছিল ভেতরে-বাইরে, বিভিন্ন চাপের মুখে পড়ে, তেমনি পুরোনো মূল্যবোধগুলোও একই সঙ্গে সম্মুখীন হচ্ছিল নানা প্রশ্নের, চ্যালেঞ্জের। সবথেকে বড় কথা, ভাঙতে ভাঙতে এতদিনে এসে টের পাওয়া যাচ্ছিল যৌথ পরিবার-ভিত্তিক মানসিকতার গড়নটাই কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন কোনো আঁকড়ে ধরার মতো মনো-সামাজিক অবলম্বন মিলছিল না যেহেতু, ফলে সামাজিক উপরিকাঠামোর চেহারাটাই যত দিন যাচ্ছিল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল বেশ খানিকটা বকচ্ছপ গোছের। এবং বাড়তি মজাটা হল, এর মধ্যেই যেহেতু রক্তের ভেতরে শিকড় গেড়ে থাকা আদ্যন্ত বাঙালি মূল্যবোধকেও টিঁকে থাকার জন্যে অবলম্বন খুঁজতে হচ্ছিল প্রাণপণে, ফলে উপরে উপরে আপাত-ঘটনাহীন জনজীবনের চেহারাটা হয়ত বজায় থাকছিল ঠিকই, কিন্তু তার গড়ন টোল খাচ্ছিল বিস্তর।

ডাঃ অনিরুদ্ধ বসুর পঞ্চম থ্রিলার **'কোনানড্রাম'**-এর অনুবাদ **'প্রহেলিকা'**-র ভূমিকায় অনুবাদকের তরফে এতগুলো কথা বলে নেওয়া দরকার হল একটাই কারণে যে, এর বৈশিষ্ট্য। ডাঃ বসু তাঁর এই লেখায় চেয়েছেন মূলত পাঠককে এই একুশ শতকে এসে সতত-বদলে যেতে থাকা আধুনিক বাঙালি মেগালোপলিসের মনো-বাস্তবিক সংঘাতগুলোর ঠিক মধ্যিখানে হিঁচড়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিতে।

'কোনানড্রাম'-এ যাকে ঘিরে একের পর এক খুনের ঘটনা ঘটেছে, যে সেই ঘটনাগুলি ঘটিয়েছে ও যে জন্যে ঘটিয়েছে তারা কেউ/ কোনোটিই অ-সাধারণ নয়। এমনকী এই থ্রিলারের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি একদম আর-পাঁচজনের মতোই সাধারণ এক বুদ্ধিমান বাঙালি যুবক মাত্র, যে নিজের পরিসংখ্যানবিদের পেশায় যথেষ্ট সফল। এবং একই সঙ্গে আধুনিক সময়ের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য উচ্চাকাঙ্ক্ষারও শিকারও বটে। তাকে

কে বা কারা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে নির্বিকারভাবে এই খুনগুলো করে চলেছে সেটা নিয়েই উপন্যাস - যার শেষে এসে লেখক পাঠককেও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবেন যে, আমাদের এই যে আইন ব্যবস্থার মূল ভিৎ, এইটাই বা অপরাধী শনাক্তকরণে কতটা যৌক্তিক! বাকি চরিত্রগুলির কেউও অ-সাধারণ তো নয়ই এমনকী একটি চরিত্র বিকাশ তো পেশায় পুলিশ হয়েও মোটেই আপনার-আমার থেকে বিরাট কিছু বুদ্ধিমান/ শক্তিমান নয়। দোষেগুণে মেশানো মানুষ হিসাবে প্রায়ই সে এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে বসে যা তাকে প্রায় হাস্যাস্পদ করে ছাড়ে। **'কোনানড্রাম'**-এ ভিড় এইসব অ্যাভারেজদেরই, আপনার-আমার মতোই যারা কিছুতেই নিজেদের গণ্ডি ভেঙে বেরোবার সাহস ধরে না তো বটেই, বেরোতে কিছুটা চায়ও না। এইসব অ্যাভারেজ মানুষগুলোর স্বার্থের দ্বন্দ্বই একদিকে যেমন এ লেখার প্রাণ তেমনি এ উপন্যাসের অন্তর্নিহিত প্রহেলিকারও কেন্দ্রভূমি --- যা শেষ পর্যন্ত পাঠককে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় নীতির তথা নৈতিকতার প্রশ্নের মুখোমুখি।

'কোনানড্রাম' পাঠককে আরো যে জায়গাটায় চমকে দেয় সেটা হল লেখকের নির্বিকার ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট দৃষ্টি তথা লিখন ভঙ্গি। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি আমাদের এই আধুনিক মেগালোপলিসের মনকে দেখেছেন, এবং পরতে পরতে মেলে ধরে আমাদেরও দেখিয়েছেন। নিপুণ যে ভাষাভঙ্গিতে এখানে কাহিনিকে বোনা হয়েছে তা অনুবাদে প্রাণপণ চেষ্টাতেও শেষ পর্যন্ত ঠিক কতটা ধরা গেল তা বলবেন পাঠকেরা।

অনুবাদে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন বন্ধু অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। আলাদা করে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট না-ই বা করলাম।

পার্থ মুখোপাধ্যায়

সেপ্টেম্বর ২০১৯

অনিরুদ্ধ বসু সম্বন্ধে কিছু কথা...



পেশায় প্লাস্টিক সার্জেন, নেশায় লেখক অনিরুদ্ধ বসুর জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ কলকাতায়। বি ই কলেজের স্নাতক ইঞ্জিনিয়ার বাবা স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্র মোহন বসু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রৌপ্য পদক প্রাপ্ত বাংলার স্নতাকোত্তর মা স্বর্গীয় ইলা বসুর-র উৎসাহে ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ। পরে ইউনাইটেড কিংডমের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেনস থেকে এফ আর সি এস। ইংল্যান্ডে বহু বছর কাটিয়েছে। দু-বছর মধ্য প্রাচ্যেও। এখন কলকাতার প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জেন। দেশে ও বিদেশে অন্যতমদের মধ্যে একজন।

ছোটবেলা থেকেই লেখায় আসক্তি। স্কুল পত্রিকা 'নিহিল উল্ট্রার' সম্পাদক পদের দায়িত্বে থাকাকালীন নিয়মিত সাহিত্যচর্চা। বহু পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি। পরে ইংল্যান্ড ও কুয়েতে সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ।

নিয়তি কেন বাধ্যতে। অনেক সময় নিয়তি বিভিন্ন আঙ্গিকে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ব্যস্ততার মধ্যে ২০০৬ শালে পায়ের হাড় ভেঙে ছ'মাস হুইলচেয়ারে থাকাকালীন সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় পুনরায় লেখালেখি শুরু। সেই সময় **'অন্বেষণ'** উপন্যাস রচনা। যা প্রকাশিত হয় ২৫ আগস্ট ২০০৭-এ। নতুন আঙ্গিকের এই উপন্যাস সাড়া ফেলে দেয় সংস্কৃতি মহলে। বেস্টসেলার শুধুই হয়নি, ব্যস্ত প্র্যাকটিসের মধ্যেও লেখায় অনুপ্রেরণা জোগায়। দ্বিতীয় উপন্যাস **'নিঃশব্দে'** ও বেস্টসেলারের খাতায় নাম লেখায়। শুধু তাই নয়, লন্ডন বুক ফেয়ার ও জাতীয় মাধ্যমে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ভবিতব্য নতুন সৃষ্টির দিক খুলে দিগন্তে নতুন দিশার আলো দেখায়। বহু দেশ থেকে সংগৃহীত মানুষ, সমাজ, উপলব্ধি বন্দি হয় তার লেখনীর বিভিন্ন আঙ্গিকে। ব্যস্ততার মধ্যেও সময় খুঁজে নেয় নতুন চেতনার রচনাশৈলীতে। খুনের গল্পের বিবর্তন থেকে বৈজ্ঞানিক দর্শন তার লেখাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

এই উপন্যাসটি **প্রহেলিকা**। ভিন্ন স্বাদের। বারবার নিজেকে ভাঙার মধ্যেই তার নতুনত্বের প্রকাশ। প্র্যাকটিসের বাইরে সেখানেই তার শান্তি। তার প্রতিটা উপন্যাস মৌলিক চিন্তাধারার ফসল। অনেক ক্ষেত্রে সাবেকিয়ানা ভেঙে বেরবার প্রয়াস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্যকে নতুন করে খুঁজে চিনতে। তাকে লেখনীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

লেখা তুমি আত্মদহনে জ্বলো
যদি নতুন সুরে, নতুন তানে না কিছু বলতে পার।

রবীন্দ্রসংগীত, ক্লাসিক্যাল সংগীতের অনুরাগী অনিরুদ্ধ বসুর শান্তির নীড় স্ত্রী স্মৃতি বসু।

প্রহেলিকা

‘ঠিক এক ঘন্টা বাদে গুরুসদয় রোডের অজন্তা অ্যাপার্টমেন্টে একটা খুন হবে।’

‘কে... কে বলছেন? কে আপনি?’

উত্তর না দিয়ে উল্টোদিকে ফোনটা কেটে গেল। হকচকিয়ে গেছিল সুমিত। মাথা কাজ করছিল না। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিটিউটে রোজকার কাজ সেরে সল্ট লেকের বাড়িতে ফিরে স্নান করে আরামে একটু বসেছিল। গোটা দিনটা যা দৌড়ঝাঁপ গেছে কলকাতার এই ভ্যাপসা গরমে শরীরের শেষ শক্তিটুকু অব্দি নিংড়ে নেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। গত কয়েক সপ্তাহ কেটেছে নিজের আগামী লেখাটা সময়ে জমা দেবার তাড়ায় রীতিমতো ঘাড় গুঁজে। মৌলিক কাজ। কবে যে তা ছাপার অক্ষরে দেখতে পাবে এ নিয়ে উত্তেজনায় ঘুম হচ্ছে না।

বাইরে আকাশের দিকে তাকাল। হালকা ঠান্ডা বাতাস বুঝিয়ে দিয়ে গেল শিগগিরই বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতায় বসে ভ্যাপসা এই গরমের দিনগুলো কাটানো সত্যিই বিড়ম্বনার। স্ত্রী আয়ুষী কবে থেকে যে তাকে ঝুলে থাকা সিকিম ট্যুরটা নিয়ে লোভ দেখিয়েই চলেছে! জ্বালা ধরানো এই গরম আর বিচ্ছিরি ঘামের হাত থেকে সপ্তাহ কয়েক গ্যাংটক, পেলিং, লাচুং, ইয়ুকসামে ছুটি কাটিয়ে আসার মতো দারুণ আর কী-ই বা হতে পারে! কাজ জমা দেওয়া হয়েছে। এখন দিন কয়েক একটু হাত-পা ছড়িয়ে কাটাবার কথা ভাবাই যায়।

মাথায় ঢুকল না, ফোনের ওদিকে লোকটা তাকেই কেন ফোন করল। স্ট্যাটিস্টিকসের লোক, এসব খুন-খারাপি থেকে যার শতহস্ত দূরে থাকার কথা, তার চেয়ে তো পুলিসই এসবের জন্যে ঠিক ছিল। তা না... আবার সে কলার আইডি-টার দিকে তাকাল। নাঃ, সম্পূর্ণ অচেনা নম্বর! মানেটা কী এসবের! ফালতু ব্যাপারটাকে ঘাড় থেকে নামাতে গিয়ে মনে হল, একজন কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক হিসেবে তার দায়িত্ব এখন বিষয়টা পুলিসকে জানানো।

সোজা ফোন লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে‘আজ আটটার সময় গুরুসদয় রোডের অজন্তা অ্যাপার্টমেন্টে একটা খুন হবে।’

‘অ্যাঁ, কে আপনি?’ কন্ট্রোল রুম অফিসার অবাক।

‘সুমিত দাস। বরানগরের আইএসআই-তে প্রফেসর।’

‘কী করে জানলেন?’

‘ফোনে বলল।’

‘কে বলল?’ অফিসার জানতে চাইলেন।

‘জানি না। নম্বরটা অচেনা।’

‘বাদ দিন তো! অচেনা একটা লোক ফোন করে বলছে খুন হবে... হুঁ:। তা-ও যদি বোমা-টোমা লুকিয়ে রাখার কেস হত, তা’লেও নয় দেখা যেত। এসব ফালতু জিনিস নিয়ে একদম মাথা ঘামাবেন না স্যার।’ অফিসার ফোনটা রেখে দিলেন।

একদম ঠিক। নিশ্চয় ফোন নিয়ে কোনো বাচ্চার বদমাইশি। নিজের নাগরিক কর্তব্যটি পালন করে, ফোনের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে টিভি নিউজটা চালিয়ে দিল।

মিনিট পনেরো বাদে আবার ফোন, 'বলেছিলাম না, আটার সময় একটা খুন হবে! গ্রাহ্য করলেন না। এবার ঘটনার জন্যে তৈরি থাকুন।'ফোনটা কেটে দিল।

থ্রেট!

ধরে নেওয়াই যাক না হয় তা-ই। যদি তা-ও হয়, লোকটা কী করে জানল সুমিত ফোনটা পেয়েও কিছু করেনি! তাহলে কি কেউ তার ওপর নজর রাখছে? নাকি স্রেফ আন্দাজে হাওয়ায় ঢিল? গুলিয়ে যাওয়া মাথাটা নিয়ে ক্লান্ত সুমিত কী করবে ভেবে পেল না। এরকম অচেনা কোনো ফোনের পেছনে দৌড়নোটা তার পক্ষে এই মুহূর্তে অন্তত বাড়াবাড়ি।

ডিনারের আগে ন'টার প্রাইম নিউজে চোখ রেখেছিল। টুকটাক খবরের পরেই... হাড় হিম হয়ে এল:

'ব্রেকিং নিউজ...অজন্তা অ্যাপার্টমেন্টে আজ একটা খুন হয়েছে... পুলিস তদন্ত করছে...'

***

খবরটা পেয়ে বিকাশ চৌবে বিরক্ত। সারা দিন বাদে গড়িয়াহাট থানা থেকে বেরিয়ে সাদার্ন অ্যাভেন্যুর ফ্ল্যাটে সোহিনীর সঙ্গে কোথায় একটু ফুর্তি করতে যাবে, আর এমন সময়েই কিনা অজন্তা কমপ্লেক্সে খুনের খবর! কপালকে বিচ্ছিরি গালাগাল করতে করতে ছুটল গুরুসদয় রোডে। মাঝেমধ্যে কর্তা রাজ রাতে না থাকলে সোহিনী একলা থাকে। তখন ওর বাড়িতেই ফুর্তি। ছামটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালেই মৌজ। মোটা ধুমসি বৌটা রীতিমতো পানসে। বহুকাল সহবাসে ইতি। পারিবারিক ঝামেলা না হলে তো সোহিনীকেই বিয়ে করত। বিয়ে করলে অবিশ্যি যৌন আকাঙ্ক্ষাটা এখনকার মতো চনমনে থাকত কি না, জানে না।

'যেতে পারব কি না বলতে পারছি না। এখন দৌড়তে হচ্ছে অজন্তা অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানে একটা মেয়ে মরেছে। খুন কি না তাই নিয়ে তদন্ত করতে হবে।' সোহিনীকে ফোন করল।

'হ্যাঁ, এখুনি টিভিতে দেখাচ্ছিল। ব্রেকিং নিউজ।'

'ওদের আর কী! শালা, কারো গাঁড়ে বাঁশ আর কারো পৌষ মাস...আমার বলে ফাটছে, আর...' বিকাশ বিড়বিড় করে উঠল। ইয়াঙ্কি কালচারটা এই কংক্রিটের জঙ্গলে যত ঢুকছে, ওপরের মহলে খুনটা যেন তত জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাভ নটসদের থেকে হ্যাভসদের মধ্যেই যেন চুলকানিটা বেশি। আর তাকে হরদম এদের সঙ্গেই ওঠাবসা করতে হয়। উচ্চবিত্ত বসতি, বালিগঞ্জ বলে কথা! দৈনন্দিন ব্যাপার। সময় নষ্ট। দৌড়তেও হবে। পুরস্কারের আশাও নেই। বরং তা-ও যদি কোনো ইললিগ্যাল কারবার কিছু চলত তাহলে আমদানিটা ঠিকঠাক থাকত। যা মাইনে তাতে টুকটাক বাড়তি কিছু না হলে চলে! সোহিনীর একটা আইপ্যাডের শখ। সোহিনী যেভাবে তার লিপ্সাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে মেটাচ্ছে, এবারে কিনে না দিলেই নয়।

'বছর তিরিশের এক মহিলা। খুনটা নিজের ফ্ল্যাটেই...' স্পটে পৌঁছতেই সাব ইন্সপেক্টর বলল।

'নাম—'

'প্রিয়াঙ্কা জয়সওয়াল। কর্তা টেকি।'

'সে কোথায়?'

'বাইরে। বাঙ্গালোরে।'

'খবর দিয়েছ?' বিকাশ জানতে চাইল।

'না। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম স্যার।'

অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সময়েই দরজার লকের দিকে নজর গেল,'ভেতর থেকে লকড ছিল নাকি?'

'হ্যাঁ। মহিলা একাই ছিলেন।'

'ছেলেমেয়ে?'

'প্রতিবেশীরা বলল বাচ্চাকাচ্চা নেই।'

'বয়ফ্রেন্ড-টয়ফ্রেন্ড...?'

‘খোঁজ নিইনি।’

‘আজকাল এরকম যতগুলো ডেথ কেস আসছে বেশিরভাগই প্রেমের লাফড়া। ওদিকেই নজর দেওয়া দরকার। মনে হচ্ছে স্যুইসাইড। ফরেনসিক এসেছে?’

‘আসছে।’

বিকাশ চাইছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক ঝামেলা মিটিয়ে বডিটা মর্গে পাঠিয়ে দিতে। সোহিনীর সঙ্গে শোয়াটা তাহলে পুরোটা একেবারে কেঁচে যায় না। পুরোপুরি তদন্ত শুরু সকালের জন্যে রেখে দেওয়াই ভালো। এখন স্বামীকে জানানো দরকার, যাতে কাল সকালের ইন্ডিগো ফ্লাইটে আসতে পারে।

শিট! ও কিছুতেই প্রিয়াঙ্কার লক করা আই ফোনটা পাচ্ছিল না। ওটা পেলেই তো গুচ্ছের ভাইটাল ক্লু হাতে চলে আসে।

প্রতিবেশী সঙ্গীতা মলহোত্রা বলল, ‘ও তো দিনের অধিকাংশ সময়টাই বন্ধুদের নিয়ে বাইরে বাইরেই থাকত’

‘বন্ধুদের কাউকে চেনেন?’

‘না। সেভাবে ঠিক নয়, কিন্তু...’ তারপর কী যেন ভেবে বলল,‘এক মিনিট। একজনকে মনে আছে। সুধা। রণবীর গোয়েঙ্কার বউ। দাঁড়ান, ক্লাবের ওয়েবসাইট চেক করলেই মেম্বার জোনে নম্বরটা পেয়ে যাব...’ সঙ্গীতা ফ্ল্যাটে ফেরত গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফরেনসিকের লোকেরা এসে তাদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিকাশ ভাবেইনি এত রাতে, বিশেষ করে এরকম অসময়ে এত তাড়াতাড়ি ওরা এসে পড়বে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ। এখনো আশা আছে। ভালোয় ভালোয় তাড়াতাড়ি সোহিনীর ওখানে যাওয়াই যায়! মিনিট কয়েকের মাথায় সঙ্গীতা ফিরল, ‘মেম্বারদের ডিরেক্টরিতে আছে। হ্যাঁ, সুবোধ গোয়েঙ্কা। এই নম্বর...’ বলতে বলতে নোটবইটা বিকাশের দিকে বাড়িয়ে দিল।

‘দারুণ! কাল সকালেই ওঁকে ধরতে হবে...’ নম্বরটা নিজের মোবাইলে তুলেই সোহিনীকে ফোন, ‘মোটামুটি মেরে এনেছি। এটা সেরেই রিং ব্যাক করছি...’

জমিয়ে বানানো ডিনারটা একটু দেরিতে হলেও শেষ করে কখন যে বিছানায় ঢুকবে তার অপেক্ষায় দুজনেই। সোহিনীও চায় না রাতটা বৃথা যাক। রাজ না থাকলে বিকাশই তার একমাত্র ওষুধ। ঠিক যেমন সে বিকাশের জন্যে।

ফরেনসিকের লোকেরা কাজকর্ম গুটিয়ে আনছে দেখেই সোহিনীর সান্নিধ্যে গরম হয়ে ওঠায় যাতে ফালতু দেরি না হয় তার জন্যে তড়িঘড়ি বডিটা মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে ফেলল।

কিন্তু সে কল্পনাতেও আন্দাজ করেনি ঘটনাপ্রবাহ এমন একটা দিকে গড়াবে, যেখানে ভাগ্যদেবী মুচকি হাসবেন।

***

লালবাজারে রীতিমতো একটা বিরক্তিকর অধ্যায় সেরে ফিরেই স্নানে ঢুকেছিল সুমিত। প্রিয়াঙ্কার খুনের ব্যাপারটা নিয়ে যা ফালতু ধাক্কা গেল সেটা সামলাতে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বসতেই হল। কথাটা আগে থেকেই ঘুরছিল মাথায়। বন্ধুর আনা স্কটিশ হাইল্যান্ডসের লাফ্রোয়াইগে সবে চুমুক দিয়েছে কি দেয়নি অমনি মোবাইলটা বেজে উঠল, ‘লালবাজারের খুনের মোডাস অপারেন্ডির সরঞ্জাম থাকলেও ওদের বুদ্ধি নেই তার সুরাহার’ এবার এক মহিলা।

‘কে?’

‘নাম তো ফালতু একটা সামাজিক পরিচয় মাত্র, তাই না? যেহেতু এক বাজার থেকে ফিরলেন, তাই আপনাকে আজ রাতে আবার আর এক বাজারে আরেকটা খুনের খবর আগেভাগে দিয়ে রাখি! বড়বাজারে

তারাসুন্দরী পার্কের উল্টো দিকে ৪এ গণপতি বাগলা রোডে। এবার অবিশ্যি পুরুষ মানুষ। আমিশ শা।'

'কে আপনি? খবরগুলো আমাকেই বা কেন?'

'বাজারের লোকগুলো আসলে বাজারি! আপনি তো আর তা নন। বাজারি লোকগুলো যে কোনো কাজের হয় না বহুদিন ধরে দেখে আসছি। তাই আপনার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি, এটুকুও বুঝলেন না!' সুমিতকে হতভম্ব করে ফোনটা কট করে কেটে দিল।

হতভম্ব ভাবটার সঙ্গে লাফ্রোয়াইগ জিনিসটা ঠিক যায় না। বরং কেমন একটু ছানা কাটিয়ে দেয়। এতক্ষণ ড্রিঙ্কের যে রিনরিনে ভাবটা কর্টিকাল নিউরোনগুলোকে চাঙ্গা করে তুলছিল, ধাঁধাটা সেই ভাবটা কাটিয়ে দিল। লালবাজারে আজ যে সময়টা কেটেছে সেটা তার কাছে যথেষ্টই ক্লান্তিকর। এর সঙ্গে ঘাড়ে পড়ে যদি সে আরো কিছু যোগ করতে যায় তাহলে এবার নিশ্চয় তাকে গিয়ে ঘষতে হবে হোমিসাইডের দপ্তরে। পুলিস হেড কোয়ার্টারে প্রথম অভিজ্ঞতাই যা হল তাতে হাতে কোনো প্রমাণ না থাকলে আর এদের সঙ্গে মুখ লাগানোর কোনো ইচ্ছেই নেই।

লালবাজারে ডাক পাবার পরে ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট উত্তেজিতই ছিল। একজন কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক। ওদের সাহায্য করতেই যাচ্ছে।

'আপনি প্রিয়াঙ্কা জয়সোয়ালের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু জানেন।' ডিসিডিডি ভারী চশমার মধ্যে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন।

'আমায় জানানো হয়েছিল।'সুমিত ভদ্রভাবেই জবাব দেয়।

'যদি না আপনার সঙ্গে এর কোনো যোগ থাকে তাহলে খামোকা আপনাকেই বা কেন?'

'কী করে বলব!'

'অদ্ভুত। কন্ট্রোল রুমে জানিয়েই থামলেন কেন?'

'নৈতিক কর্তব্যই বলতে পারেন।' সুমিত যতটা পারে ভদ্র থাকতেই চাইছে।

'হুঁ, কিন্তু আপনি তো আরো কোনো নিশ্চিত পদক্ষেপ নিতে পারতেন?'

'পুরো নিশ্চিত না হয়ে কী করে নিই? একবার কল করেই যে কেটে দিল!' সুমিত জবাব দিল।

'নিশ্চিত হলেন কখন?'

'রাতে প্রাইম টাইম নিউজের পরে।'

'মহিলার সঙ্গে আগে আপনার কোনো লেনদেন ছিল?'

'না। কোনো পরিচয়ের সূত্রই নেই।'

'আমায় বিশ্বাস করতে বলছেন, এমনি এমনি একজন খামোকাই আপনাকে ফোন করে জানিয়েছে।'

'আপনি যা খুশি মনে করতে পারেন, কিন্তু এটাই ঘটনা।' সুমিতের গলা এখন দৃঢ়।

'অজন্তা অ্যাপার্টমেন্টে না হয় একটা খুনই হল, মাথায় ঢুকছে না আপনাকে কেনই বা তার মধ্যে ডাকা হবে, যদি না আপনার তার সঙ্গে কোনো যোগ থাকে?'

'সেটা আপনাদের মাথাব্যথা। ওই মহিলা বা অজন্তা অ্যাপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই।'

'এর মধ্যেই আমরা খবর নিয়েছি। প্রিয়াঙ্কার হাজব্যান্ড যোগেশ জয়সোয়াল তাঁর কোম্পানির একটা প্রোজেক্ট নিয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। প্রোজেক্টটা কেন রিফিউজ করেছিলেন?'

'মনে পড়ছে না তো! অবিশ্যি হ্যাঁ, হতেই পারে। ন্যাসকম থেকে তো অমন কত লোকই আসে। অত কে আর মনে রাখে?'

'খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে উনি স্ত্রীর শেষকৃত্য নিয়ে ব্যস্ত। যোগাযোগ কিন্তু একটা আছেই।'

'বলছি তো, ওই নামের কেউ যদি কখনো এসেও থাকে, কবে কী ব্যাপার এসেছিলেন বলব কী করে?'

'আমাদেরও তো দেখতে হবে, তাই না! যে আপনাকে খবরটা দিয়েছিল সে-ও তো আপনাকে এমনি বাছেনি। আপনি যদি কিছু লুকিয়েও যান সেই সবও পরিষ্কার হয়ে যাবে নিশ্চয়। এখন যেতে পারেন। সবকিছু পেলে আমরাই আবার যোগাযোগ করব।'

পুলিসের তাহলে তার সততা নিয়েও সন্দেহ আছে। ওর ফোনটাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। বরং, তাকেও সন্দেহভাজনের তালিকায় ঢুকিয়ে নিয়েছে। হতাশই লাগছিল। নিজের কাজের জন্যে পুলিসের সঙ্গে তাকে যোগাযোগ করতে হয় না। পুলিস আর স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর। কদাচিৎ কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি-টাড়ি বাদে এদের সঙ্গে কক্ষনো মোলাকাত হয়নি। কিন্তু হুডানিট গোছের উপন্যাসে দেখেছে এরকম ক্ষেত্রে পুলিস একধার থেকে সব্বাইকে সন্দেহ করতে থাকে। বিরক্তিতে মন ভরে যাচ্ছিল। সবে বিশ্রি একটা জিজ্ঞাসাবাদের পর বাড়ি ফিরে লাফ্রোয়াইগ নিয়ে একটু হাঁফ ছেড়েছে অমনি এই ফোন সমস্ত স্বস্তিতে জল ঢেলে দিল। তার ওপর এবার আবার খুনের গপ্পোটা ফাঁদছে পুরুষের বদলে এক মহিলা।

আলাদা লোক বটে, কিন্তু ফের কিনা সেই তাকেই জানানো হচ্ছে! তাকেই বারবার এভাবে বেছে নেওয়া হচ্ছে কেন?

মহিলা তো দেখা যাচ্ছে তার লালবাজারে যাওয়ার কথাও জানে। তার মানে, তাকে সবসময় নজরে রাখা হয়েছে। মনে হচ্ছে তিনটে কলই প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা যুক্ত। যদিও কিছুই জোর দিয়ে বলা যাবে না। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে সে কোনো গ্যাং-এর ফাঁদে পড়েছে? উঁহু, সে সম্ভাবনাও মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সবথেকে বড় কথা, কিচ্ছু না জেনে সে আস্তে আস্তে হয়ত একটা হুডানিটের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। বিকেলের শান্ত বাতাস বা এসির আরামে ডুবে ড্রিঙ্কের আয়েসও স্বস্তি দিতে পারছে না।

পুলিসকে যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। ওদের কিছু জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। জানালে বরং ওদের সন্দেহেই আরো ইন্ধন দেওয়া হবে। ভেবেচিন্তে সে মহিলাকে পাত্তা দেবে না ঠিক করে ড্রিঙ্কের আমেজে ডুব দিল। স্ট্যাটিস্টিক্স তার ধ্যানজ্ঞান হতেই পারে, কিন্তু তা বলে খুনটাও নিশ্চয় সেই লাইনে পড়ে না। কয়েক পেগ লাফ্রোয়াইগ অন্য আমেজে ডুবিয়ে দিল। দিনটা যা গেছে! যাকগে, যা হবার হয়েছে। কাল থেকে সে নিজের কাজে মন দেবে। ইথানলের প্রভাব সেরিব্রামে যত ছড়িয়ে যেতে থাকল তত মহিলার গলার আওয়াজটা ভুলে যেতে লাগল।

ঘুম ভাঙল একটা হ্যাংওভার নিয়ে। লুচি-আলুর দম দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে চটপট বরানগরের পথে বেরিয়ে পড়ল। আজ ডক্টরাল ছাত্রী অচিরার সঙ্গে তার ডক্টরাল ডিসারটেশনটা নিয়ে বড়সড় একটা বসার ব্যাপার ঠিক করা আছে। প্রিয় ছাত্রী অচিরা গত চার বছর কাজটা করছে। শেষ হলেই স্টেটসে প্রেমিকের কাছে পাড়ি জমাবে। বি টি রোড ধরে ড্রাইভ করে যাবার গোটা পথটাই সে ডুবে রইল ডিসারটেশনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে। কাল রাতের ফোনটার কথা মনেই পড়ল না।

সে অবিশ্যি জানত না গোটা ভাবনা-চিন্তাই বৃথা যাবে। তবে হ্যাঁ, সে যদি আর একটু মনোযোগ দিত বেচারি অচিরা হয়ত অনেক প্রতিকূলতা থেকে রেহাই পেতে পারত।

***

'গপ্পোটা কী?'পরদিন সকালে ওর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ফ্ল্যাটে বসে বিকাশ সুধার কাছে জানতে চাইল। কাল রাতে সোহিনীর ফ্ল্যাটে খাওয়া-দাওয়ার পরের উদ্দাম ফুর্তির রেশ এখনো পুরো কাটেনি। তবু রাতের আধখ্যাঁচড়া তদন্তের কাজটা তো ফেলে রাখা যায় না। মুস্কিল হল, রাজ সচরাচর বাইরে যায় না। যখন গেছে সুযোগটা ছাড়তে চায়নি। সোহিনী বিছানায় ফাটাফাটি। আজ অব্দি একটা মেয়েকেও পাওয়া গেল না যে বিছানায় ওকে টেক্কা দিতে পারে। ওদের বিয়েটা হলে ওই মোটকা বৌটাকে নিয়ে সারা জীবন কাটাতে হত না, যার ক্ষমতাই নেই বিকাশের ফুর্তির জোগান দেওয়ার! খালি বাচ্চা পয়দার যন্ত্র মাত্র।

‘চেষ্টা করছি শকটা কাটিয়ে উঠতে। কর্তা নেই, প্রিয়াঙ্কা বোর হচ্ছিল। ফোনে জিজ্ঞেস করল। ক্যালকাটা ক্লাবে যাওয়ার প্রোপোজালটা ওরই! ভাবলাম অন্য-সবাইকেও ডেকে নিই! আসলে আয়নায় কয়েকটা পাকা চুল দেখে অব্দি ওর মাথার ঠিক ছিল না। বি বনি বিউটি পার্লারে দেখা করলাম। ওখানে সেরে গেলাম ক্যালক্যাটা ক্লাবে। বেশিটাই কাটিয়েছি ক্রিস্টাল রুমে। সন্ধ্যেয় ফিরলাম।’

‘কারা কারা ছিলেন?’

‘আমরা ছ’জন। প্রিয়াঙ্কা, অমৃতা, মণিদীপা, শ্রেষ্ঠা, আইরিন আর আমি।’

‘ওর ব্যবহারে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছিলেন?’ বিকাশ গভীরে যেতে চেষ্টা করছিল।

‘না তো! খুবই হাসিখুশি আর হৃদয়বান। একদম স্বাভাবিক।’

‘কী নিয়ে কথা হল?’

‘মেয়েরা যা নিয়ে কথা বলে। আলাদা কিছু নয়।’

‘খুনটা হয়েছে ফেরার পর।’

‘তা-ই শুনলাম।’

‘অন্যদের মোবাইল নম্বরগুলো দিন।’

‘ব্লু টুথ অন করুন। ওদের ভি কার্ড পাঠাচ্ছি।’

বিকাশ বেরোল। যদিও ওর ধারণা প্রিয়াঙ্কার মৃত্যুটা স্যুইসাইড, কিন্তু তার জন্যে আগে অটপ্সির রিপোর্ট চাই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। যখন মরেছে তখন ভেতরে কেউ ছিল না। মহিলার মেডিক্যাল হিস্ট্রি চেক করে দেখতে হবে কোনো ডিপ্রেশনের ব্যাপার ছিল কিনা। পোস্ট মর্টেম হয়ে গেছে। এখন ওর টেকি বরটাকে দিয়ে স্বীকৃত বলে ছাপ্পা মারিয়ে নিলেই কাম খতম।

পুলিশের গাড়িতে উঠেই যোগেশের ফোন, ‘শহরে নেমেছি। ওর বডি কোথায়?’

‘কাঁটাপুকুর পুলিশ মর্গে।’

‘একঘন্টার মধ্যে আসছি।’

এই পেশার জ্বালাই হল মরা লোকের জ্যান্ত আত্মীয়দের মোকাবিলা। এতদিনে এটা রুটিনে দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু এখনো ওর ভেতরে কোথায় যেন একটা খচখচ করে এদের মুখোমুখি হতে। মানুষের মনটাকে তো মারতে পারেনি। যাবার পথে ঠিক করল বি বনি ঘুরে যাবে। ওরা আন্তরিক ব্যবহারই করল। চা-ও খাওয়াল। মহিলারা যে এসেছিলেন তা-ও বলল। ওঁরা সবাই নিয়মিত খদ্দের। জানাল মহিলার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক কিছু দ্যাখেনি।

সব কিছুই যদি স্বাভাবিক থাকে তাহলে মহিলা আত্মহত্যা করতে গেলেন কেন? অন্য কিছুর আভাস?

***

গোটা খেলাটাই মজার। বিশেষ করে যখন কেউ মজাটা মন আর শরীর দুই দিয়েই নিতে তৈরি থাকেন। বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে মাথার খেলার মতো। সবসময় যাঁরা স্ট্র্যাটেজিক পাজল নিয়ে নাড়াচাড়া পছন্দ করেন তাঁদের জন্যে তো বটেই। নিঃসন্দেহে আর-সব খেলার মতোই এখানেও চ্যালেঞ্জ আর মিথষ্ক্রিয়া একেকটা দানের জন্যে জরুরি। আর তথাকথিত তদন্তমূলক মানসিকতা এখানে বিরক্তিকর। কারণ সেই পদ্ধতিটা হল নিয়মে বাঁধা, তেমন অনুপ্রেরণা সেখানে মেলে না।

সুমিত এখানে যথেষ্টই নিপুণ। শুধুমাত্র যদি সে পুরোপুরি জড়িয়ে যেতে পারত! দুঃখের বিষয়, সে তার গবেষণায় ডুবে আছে। দরকার তার ভেতরকার মানুষটাকে জাগিয়ে দেওয়ার। আশা করা ভুল সে প্রথম থেকেই বিপুলভাবে জড়িয়ে পড়বে। সে দানটা পুলিসের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এরকম কারোর পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। পুলিসেরও বেছে নেবার ব্যাপার ছিল - হয় জড়িয়ে পড়ো নয়ত উড়িয়ে দাও। তারা শেষটাকে বেছেছে। এমনকি যদি প্রথমটাও বাছত তাহলেও প্রিয়াঙ্কার বাঁচার সম্ভাবনা ছিল খুবই সামান্য। তার মৃত্যুর বীজ পোঁতা হয়ে গিয়েছিল অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার আগেই। যত সময় গেছে সেগুলো নড়াচড়া করেছে, খুঁজে বার করে তাকে চিহ্নিত করেছে, এবং সে মারা পড়েছে। এটাই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী প্রাথমিক চাল।

সুদোকুতে সমস্যার স্তরভেদ হয় সদ্যশুরু করা আর দক্ষ খেলোয়াড় ভেদে। এখানেও একই নিয়ম কাজ করছে। কেবল খেলাটা সুদোকুর মতো অত সহজ নয়। অন্তত পুলিসের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের ছকবাঁধা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী প্রিয়াঙ্কার মৃত্যু পড়ছে ১৫৬ ধারা সি আর পি সি-তে। তার অ্যাপার্টমেন্ট ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। প্রাথমিক সন্দেহ তাই আত্মহত্যা। এবার বডি পোস্টমর্টেমে গেলেই প্রশ্ন উঠবে। কেউ কোনো সূত্র দিতে পারবে না। সন্দেহ মোড় নেবে যোগেশের দিকে, যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরকম মৃত্যুর পেছনে থাকে পারিবারিক গণ্ডগোল বা ডিপ্রেশন। প্রিয়াঙ্কার সম্পত্তি, পলিসি ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখা শুরু হবে। যোগেশ বাঁচতে পারবে যদি সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে। নইলে তাকে পচতে হবে আদালতের ঘোরপ্যাঁচে যার শেষ নেই।

একমাত্র সম্ভাবনা যদি কোথাও থাকে তা হল পোস্টমর্টেম। যদি ফরেনসিকেরা সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দিয়ে ধরতে পারেন এর পেছনে সুপার ভ্যাসমল থার্টিথ্রি কেশকালার হাত আছে তাহলেই কেবল কেসটা নিয়ে আবার নাড়াচাড়া পড়বে। নইলে আরো অনেক অসমাপ্ত কেসের মতোই ঝুলে থাকবে। যোগেশ শহরে নেই, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করার মতো কেউ না থাকলে প্রিয়াঙ্কা একদম একা, এরকম ক্ষেত্রে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রচণ্ড গলাব্যথা, কাশি, শ্বাসকষ্ট, অ্যাঞ্জিওনিউরোটিক ইডিমার জন্যে ফ্যারিংস, গলা আর জিভে বিচিত্র একটা ফুলে ওঠার অনুভূতি, বমি, গ্যাস্ট্রিকের কষ্ট, ব্রঙ্কিয়াল একটা খিঁচুনি, চকোলেটের মতো বাদামি পেচ্ছাপ সব একসঙ্গে মিলে তাকে কার্ডিওরেস্পিরেটরি অ্যারেস্টের জন্যে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাবে। খুব কম সময়ের মধ্যে এইসব উপসর্গের জন্যে সে কাউকে ফোন করে ডাকতেও পারবে না। যদি সে বেরোতে চেষ্টাও করে তাহলেও হাত-পা কাজ করবে না।

নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা।

যদি বা কেশকালা খাওয়ার ব্যাপারটা ধরাও পড়ে যায় তাহলেও ঝামেলা পোয়াতে হবে বি বনি বিউটি পার্লারের লোকেদের। খুব সম্ভাবনা না থাকলেও ক্যালক্যাটা ক্লাবেও হয়ত তদন্তের সুতো ধরে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বেরোবে না। মোটিভই যেখানে অস্পষ্ট সেখানে একটা খুনের কেস দাঁড় করানোই কঠিন। শেষে কেসটায় দাঁড়ি পড়বে স্যুইসাইড হিসাবেই। পুলিসের খামোকা স্যুইসাইডের পেছনে দৌড়ে সরকারের টাকা ওড়ানো বাতুলতা। এইসব নিয়ম, চ্যালেঞ্জ এবং সেই সুতো ধরে সমাধানের দিকে এগোনোর চেষ্টা তাদের মানসিক বা শারীরিক এক্তিয়ারের বাইরে। উৎসাহে ভাটা পড়তে বাধ্য।

অব্যর্থ ব্লুপ্রিন্ট। প্রাথমিক স্তরটা একদমই এলেবেলে। কেবল পুলিস আর সুমিতের টানাপোড়েনটাই যা কিছু মশলা - ব্যাস! সোহিনীকেই এবার একটু ঘেঁটে দেখা যাক কিছু বেরোয় কিনা!

সময় কাটছিল। 'মাই অপারেটর'-এর মারফত তার মোবাইলে একটা মেসেজ 'বিকাশ তোমার কোলে দোলে। প্রিয়াঙ্কা খতম দুজনের গোলে'।

***

ব্রেকফাস্ট বানাতে একলা মানুষ আমিশের প্রবল অনীহা। কয়েকটা বাড়ি পরের জৈন শুদ্ধ ভোজনালয় থেকে সেটা দিয়ে যায়। যদিও দোকান খোলে দশটায়, কিন্তু তার খাবার চলে আসে একঘন্টা আগেই। তাতে তৈরি হওয়ার জন্যে বেশ সময় পাওয়া যায়। ডেলিভারি দিতে এসে আমিশের কোনো সাড়া মিলল না। যে খাবার এনেছিল বার কয়েক চেষ্টা করে আমিশ নেই ধরে নিয়ে হাল ছেড়ে দিল।

বিল্ডিংটায় কয়েকটা বিজনেস ইউনিটের সাজানো-গোছানো অ্যাপার্টমেন্ট। কয়েকটায় ব্যবসার কাজ হয়, বাকিগুলো রেসিডেন্সিয়াল। বাসিন্দাদের কদাচিৎ কারো সঙ্গে দেখা বা কথা হয়। সবাই যে যার ধান্দায়। হোলসেল গার্মেন্টসের ডিলার আমিশ অনেক সময় ব্যবসার কাজে বাইরে থাকে। কাজের সূত্রে বা বিবাহিত মহিলাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টিতে। বিবাহিতরা অবিবাহিতদের থেকে বেশি নিরাপদ। প্রেগন্যান্সি নিয়ে ন্যাকামি নেই। সামলাতে জানে।

আজ অব্দি অফিসে মুখ দেখানোয় ছেদ পড়েনি তার। ফোনের জবাব মেলে। কর্মীরা নিশ্চিত থাকে। কিন্তু তারাও একইভাবে বিফল হল। কিচ্ছু না জানিয়ে আচমকা এভাবে হাওয়া হয়ে যাওয়ায় পুলিসে খবর গেল। নিয়মমাফিক মিসিং ডায়রি হল আরেকটা।

'ব্যাস। এবার বলো?' আলোচনার শেষে সুমিত অচিরার দিকে তাকাল।

সারাদিন ব্যাপক খাটনি গেলেও হলদে সালোয়ার-কামিজে অচিরাকে নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল। নীল এবার অধীর হচ্ছে। ওকে পেতে চায়। সে-ও বছর চারেক আগে প্রফেসার সুমিত দাসের কাছেই থিসিস শেষ করেছে। প্রফেসরও তাদের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে জানেন। কবে চার হাত এক হবে তার অপেক্ষায়। নীল চাবুকের মতো স্মার্ট। অচিরাকেই কেবল তার সঙ্গে মানায়।

'জমা দিয়েই সোজা স্টেটসে। নীলের তর সইছে না। ইন্টারভিউতে আসব।'

'জানি। এসব নিয়ে ভেবো না। কেবল ফাইন্যাল সাবমিশনের আগে দেখার জন্যে এক সপ্তাহ সময় দিও।' সুমিতও চায় না অচিরাকে আটকে রাখতে।

যে যে জিনিস জুড়তে বলেছে সেসব সেরে যখন অচিরা ফিরবে ততদিনে ওর থিসিস জমা পড়ার জন্যে তৈরি।

'কিছুই করলেন না। আমিশ শাহ্‌র ডেডবডি কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টেই পড়ে আছে।' টেক্সটটা ঢুকতেই ও থমকাল।

এরকম একটা কাজের দিনের শেষে এ আবার কী ন্যুইসেন্স! সে কেন! নম্বরটা চেক করল। সেন্ডারকে ফোন করতে গিয়েও করল না। একে তো প্রিয়াঙ্কার মৃত্যুটা নিয়ে ঝামেলায় আছে, নতুন করে জড়াতে চাইল না। পুলিসে গেলেই তারা হাজার প্রশ্নের প্যাঁচে ফেলবে। ওদের সঙ্গে ফালতু জড়ানোর দরকার নেই। তার চেয়ে আয়ুষীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে বিছানায় যাওয়াই ভালো।

সকালে ঘুম ভাঙল রামকলির সুরে। প্রিয়াঙ্কার কলটা এসেছিল পুরুষের গলায়, এবার মেয়ের। দুটো নিশ্চয় একসূত্রে গাঁথা নয়। আসল জায়গায় গিয়ে দেখলে কেমন হয়? সকালে চনমনে মন নিয়ে ঠিক করল বড়বাজারে ৪এ গণপতি বাগলা রোডে গিয়ে আমিশ শাহের হাল দেখে আসবে।

বাড়িটার সামনে ছোটখাটো একটা ভিড়।

'কী হয়েছে দাদা?'

'এখানকার আমিশ শাহ্ বলে একজনের ফ্ল্যাট থেকে বিশ্রি গন্ধ বেরোচ্ছে।'

'লোকটা থাকত এখানে?'

'হ্যাঁ। গারমেন্টসের হোলসেলার। একাই থাকত।'

পুলিসকে অনুসরণ করে ভিড়টা ভেতরে ঢুকে এসেছিল। যতক্ষণ না দরজা ভাঙা হল তারা রইল। আমিশকে পাওয়া গেল টয়লেটে। ন্যাংটো, পেচ্ছাপ-পায়খানার পচা গন্ধের মধ্যে। সে রাস্তায় নেমে আসতেই রামকলি বদলে গেছে আদানায়। রোদটা এখন জ্বালা ধরাচ্ছে।

চলে আসবে এমন সময় অজানা সেন্ডারের মেসেজ ঢুকল, **'বিশ্বাস হল তো! আমায় বিশ্বাস করো, পুলিসকে নয়'**।

ফের কেন তাকেই? একা তো এসব সামলাতে পারবে না। যদিও আমিশের জন্যে খারাপ লাগছে, কিন্তু... মন থেকে অস্বস্তিটা মুছে ফেলল। দিনে এরকম হাজারটা মরছে। কিন্তু সেইসব ছায়া তো তাকে দায়ী করতে পারে না!

***

'বিকাশ তোমার কোলে দোলে। প্রিয়াঙ্কা খতম দুজনের গোলে'। অচেনা নম্বর থেকে মেসেজটা আসতে সোহিনী চমকেছিল। কে? আচমকা এই মেসেজ কেন? বিকাশকে ডাকার আগে সে আকাশপাতাল ভাবছিল। রাজের কীর্তি নয় তো? যদিও অসম্ভব, তবু তার কেন জানি মনে হচ্ছে রাজ ওদের ব্যাপারে জানে! এমন কী হতে পারে না যে সে-ই অচেনা নম্বর থেকে মেসেজ পাঠিয়ে ওকে চমকে দিতে চাইছে! রাজ আর তার বিয়েটা যতটা মনের টানে তার থেকে বেশি সামাজিক হিসেব মেনে। অতীতে তার যা কীর্তিকলাপ তাতে তার বাপ-

মায়ের পক্ষে তড়িঘড়ি এরকম একটা কিছু না করে উপায় ছিল না। তাদের আশা ছিল এর পর সে ধীরে সবকিছু ভুলে যাবে।

মিক্স নামে পার্ক স্ট্রিটের নাইট ক্লাবটায় ফুর্তিফার্তার পর একদিন যখন মাতাল হয়ে পার্ক স্ট্রিটে পেচ্ছাপ করছে তখন বিকাশের খপ্পরে পড়ে। তখন ও পার্ক স্ট্রিট থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট এস আই। লকআপে নিয়ে যাচ্ছিল।

'প্লিজ আমায় ছেড়ে দিন... আমি ভদ্রঘরের মেয়ে... বিশ্বাস করুন...' সে কেবল কাঁদতে বাকি রেখেছিল।

'ভদ্রঘরের মেয়েরা পার্ক স্ট্রিটে পেচ্ছাপ করে?' বিকাশ শক্ত মুখে।

'আসলে ড্রিঙ্ক করেছি তো...'

'এক রাত লক আপে থাকলেই ওসব নেশা-টেশা ছুটে যাবে।'

'প্লিজ প্লিজ...'

বিকাশ ওকে মাপছিল। বিশের কোটায় বয়েস হবে। মাতাল হলেও মালটা তো মন্দ নয়! ছিপছিপে শরীর। ঘাড়ে ঢল খাওয়া সিল্কের মতো কালো চুল মেয়েটার বাড়তি আকর্ষণ। ঝকঝকে চোখ দুটো যেন বেয়নেটের মতো ফুঁড়ে দিচ্ছে। ভিজে ঠোঁটদুটো কামুক ম্যাজিকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকেও যেন ছাড়িয়ে যায়। কালো মিনি ফুঁড়ে বুকদুটো যেন ফেটে বেরোচ্ছে। সব মিলে তার নেভা আগুনে ঘি দিল। এক রাত একে লক আপে রাখলে একটা পয়সাও আসবে না, কিন্তু... তার খিদেটা চনমন করে উঠল।

'এখুনি চলে যাও। বেশি মাল খেও না আর। রাস্তাটা মোতার জায়গা নয়...' মেয়েটা ঘাড় নাড়ল, 'কোথায় বাড়ি?'

'ভবানীপুর...'

'এসো সঙ্গে।'এত রাতে মেয়েটাকে রাস্তায় একা ছেড়ে দেওয়া বোকামি। ওকে ভবানীপুর বলরাম ঘোষ ঘাট রোডে ছেড়ে এসেছিল।

সেই শুরু। কামের নয়, প্রেমের। দিন কয়েক বাদেই সে ফোন করে, 'একবার থানায় আসতে পারবে?'

'ঝামেলা শেষ হয়নি নাকি...' সে অবাক। রাতের ওরকম ঘটনার পর পুলিসের থেকে ডাক। তাহলে কি এখনো ঝামেলা মেটেনি? সেই প্রথম তার পুলিসের পাল্লায় পড়া।

'ওটা রেকর্ডে ঢোকেনি! যদি একবার দেখা হত...' মেয়েটা কি রাজি হবে!

বিষয়টা রেজিস্টার্ড হয়নি শুনে এইবার সে সহজ, 'থ্... মানে থানায়... অন্য কোথাও যদি...ভিক্টোরিয়া বা মিলেনিয়াম পার্ক বা ঐরকম কোথাও...'

'বেশ। ৬টায় মিলেনিয়াম পার্ক।'

পুলিসের পোশাক ছাড়লে বিকাশ বেশি পুরুষালি। ৬ফিট পেটানো শরীরটা মেয়েটাকে যাদু করেছিল। ওরা হাঁটল, কথা বলল, খেল, এবং তারপর রাস্তাটা গিয়ে শেষ হল তার এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে। হয়ত এরকম প্রথম নয়, কিন্তু আবেগের সঙ্গে মিশে এই দেখা হওয়াটা অন্য পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'অচেনা কেউ এই টেক্সটটা পাঠাল।' মেসেজটা ফরোয়ার্ড করে সে ফোন করল।

পড়েই বিকাশের প্রেমিক সত্তাকে ছাপিয়ে উঠল ভেতরের পোড় খাওয়া পুলিসটা। ঠান্ডা মাথায় নম্বরটা জালি করা হয়েছে ধরে সে ফিরতি ফোন করল না। আগে ব্যাপারটা চেক করতে হবে। হতেই পারে এটা একটা ফাঁদ। এতদিনের পুলিসি অভিজ্ঞতা!

'কী ভাবছ?'

'ফিশি। আগে চেক করে দেখি।'

'আমায় কেন?' সোহিনীর মাথা কাজ করছিল না।

'তাই তো ভাবছি। আমার বদলে তোমায় কেন? রাজ কি কিছু আন্দাজ করেছে?'

'আমাদের আগের ব্যাপারটা ও জানে। কিন্তু তার পরে এখন কী হচ্ছে সেটা নয়।'

‘হতেই পারে। হয়ত প্রাইভেট আই লাগিয়েছে। কে বলবে!’

‘হলে, আমায় সরাসরি নয় কেন?’

‘কারণ তাতে বাড়িতে ঝামেলা বাড়বে। প্রিয়াঙ্কার মৃত্যুটাকে আমাদের সঙ্গে জুড়ে... এতে কি ওর হাত আছে?’

‘ও কেন এরকম করবে?’ সোহিনী যেন শক খেল।

‘কে জানে! ওর কার কার সঙ্গে কী কী ছিল দেখতে হচ্ছে। লিঙ্ক থাকতেই পারে। মেসেজটা আমায় কিন্তু পাঠানো হয়নি। তোমাকে হয়েছে, তাই রাজের কথাই উঠছে। আমাদের ব্যাপারে আর কার উৎসাহ থাকবে?’

‘এখন তা’লে কী করব?’

‘আমার ওপর ছাড়ো। রিল্যাক্স... রাজ ফিরেছে?’

‘রাতে আসছে।’

বিকাশ ছাড়ল। প্রিয়াঙ্কার বন্ধুদের লিস্টটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার। মৃত্যুটাকে এতক্ষণ স্যুইসাইড ধরে সে হালকা করে নিয়েছিল। সুইসাইড বলে চালাতে চাইছিল। এখন মেসেজটা ওকে গভীরে দেখতে ইঙ্গিত করছে। হতে পারে সোহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্কের জের টেনে খুনের অনুসন্ধানের দিকেই ঠেলছে।

ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে কেশকালা পেটে যাওয়ায় গ্যাস্ট্রিক সমস্যার জন্যে দম আটকে মৃত্যু। যদি স্যুইসাইডই হয় তাহলেও প্রিয়াঙ্কা খামোকা কেশকালা খেয়ে স্যুইসাইড করতে গেল কেন? ওটা তো কেউ সচরাচর স্যুইসাইডের জন্যে ব্যবহার করে না। কেউ কি ওটা তাহলে ওর খাবারে মিশিয়ে দিয়েছিল? বি বনি বিউটি পার্লারের ওদের একটু নেড়েঘেঁটে দেখতে হচ্ছে! সেই সঙ্গে ওর সঙ্গে যারা ছিল তাদেরও।

***

ফ্ল্যাট থেকে যখন আমিশের মৃতদেহ কাঁটাপুকুর মর্গে নিয়ে যাবার জন্যে সরানো হচ্ছিল তখনো গোটা জায়গাটাই বিশ্রি গন্ধে ভরা। মৃত্যুটা যেহেতু হয়েছে বন্ধ ফ্ল্যাটে, পুলিসের ধারণা এটা স্যুইসাইড। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কেস ক্লোজ করার আগে কিছু প্রাথমিক তদন্ত প্রয়োজন। জৈন শুদ্ধ ভোজনালয়ের ডেলিভারির লোকটা বাদে ফ্ল্যাটবাড়ির কেউ ওর সম্পর্কে কিচ্ছু জানে না।

‘তুই রোজ সকালে ওকে খাবার দিতে যেতিস?’ খাঁকি শর্টস, হাফ হাতা গেঞ্জি পরা ছেলেটা মাথা নাড়ল।

‘কখনও এবাড়িতে অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়েছিল?’ ছেলেটা আবারও মাথা নাড়ল।

ভোজনালয়ে কাজ করা ছোকরা দাঁড়িয়ে পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদ হজম করছিল। বেচারি বাইরের লোকমাত্র। এখানে কী হচ্ছে দেখতে এসেছিল। এখন ভাবছে, তাড়াতাড়ি এই যন্ত্রণা শেষ হলেই মঙ্গল।

‘কে কে এখানে আসত কিছু জানিস?’

‘আমি তো কেবল খাবার দিতে আসি। উঁকি মারি না।’

ওসি শ্যামাশিস নরম গলায় কথা বলছিল। যদি খুব কড়া হয় তাহলে মুখ খুলবে না। নরম থাকলে বরং কিছু বেরোতে পারে। বাচ্চারা যেমন নিজের মনে থাকলেই কেবল কথা বলে। রিপোর্ট লিখতেও তো কিছু তথ্য চাই। সে নরম গলায় বলল, ‘লোকটা কেমন ছিল? হাসত? টিপস দিত নাকি?’

‘মাঝেমধ্যে দিত।’

‘মাঝেমধ্যেই বাড়িতে থাকত না?’

‘মাঝেসাঝে। তবে কখনোই বেশিদিন বাইরে থাকত না।’

‘কখন বাইরে গেছে বা কখন ফিরল জানতিস কীভাবে?’

'বাইরে গেলে সব সময় জানিয়ে দিত। কখনো খুব দেরিতে উঠলে মালিককে ফোনে বলে দিত দেরি করে পাঠাবার জন্যে। আমাদের রেস্তোরাঁ খোলে দশটায়।'

'এরকম কি প্রায়ই হত?'

'না। খুব কম।'

'এসে কি তখন অ্যালকোহলের গন্ধ পেয়েছিলি?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল।

'কখনো কি ব্রেকফাস্ট ছাড়াও আর কোনো খাবার দিতে বলত?'

'না। ফেরার সময়ে গিরনার রেস্তোরাঁয় খেয়েই ফিরত।'

'কী করে জানলি?'

'একবার দেরি হওয়ায় ডিনারের অর্ডার দিয়েছিল। ডেলিভারি দিতে আসতে বলেছিল, 'ডিনারের জন্যে আবার গিরনার যেতে ভালো লাগছে না।' তাই মনে হয়েছিল ওখান থেকেই ডিনার করে ফেরে।'

'তুই পরিষ্কার জানিস না।'

'না।'

হোমিসাইড না স্যুইসাইড ধরার মতো শ্যামাশিস কিচ্ছু পেল না। এই বিশ্রি গন্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাও কষ্টকর। দরজা সিল করার আগে সঙ্গের লোকটিকে বলল মৃতের নোটবুক আর মোবাইলটা নিয়ে নিতে। কম্পিউটারে তেমন সড়গড় নয়। এ দুটো কাজে লেগে গেলেও যেতে পারে। খুব গভীরে গিয়ে তদন্ত তার ধাতে নেই। প্রত্যেক দিন অনেক মৃত্যুই তো হয়। তার এলাকাও বাদ যায় না। নেহাত স্থানীয় কাউন্সিলার বা এমএলএ-র অনুরোধ বাদে এসবের তেমন তদন্ত হয়ও না। মিডিয়া আসে কেবল কোনো সেলেবের ঘটনা হলে। সৌভাগ্যক্রমে এটা তাদের অভ্যেসের মধ্যে পড়ে না। তার একমাত্র চিন্তা, দোকান থেকে সাপ্তাহিক তোলার হিসেব নিয়ে। আজকের দিনে টাকা মৃত্যুকেও ছাপিয়ে যায়।

***

'কী কী বিউটি কেয়ার সেদিন এখানে ওই মহিলারা করিয়েছিলেন?' বিকাশের উগ্র মূর্তির সামনে বি বনি-র চিনা খুকিটি রীতিমতো খাবি খাচ্ছিল।

'অত মনে নেই।'

'মনে করার চেষ্টা কর। কেউ হেয়ার ডাই করিয়েছিলেন?'

'দুজন। নাম জানি না।' সে থতমত খেয়ে জবাব দেয়।

'তাঁদের ছবি দেখলে চিনতে পারবে?'

মেয়েটি কী বলবে ভেবে পেল না। সে খদ্দেরদের মুখের থেকে চুলটাই বেশি চেনে। যে মহিলারা এখানে নিয়মিত আসেন তাঁরা সবাই ওপর মহলের। সেলেব ছাড়া সে ক'জনের হাড়হদ্দ মনে রাখবে! কেবল গায়ের রং বাদে সমাজের সব ওপরের স্তরের মহিলাকেই এক রকম মনে হয়। বিরক্ত মুখে মাথা নাড়ল।

'কেউ হেয়ার ডাই কিনেছিলেন?'

'আমরা এখান থেকে ওসব বেচি না।'

বিকাশের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এখান থেকে না হলে প্রিয়াঙ্কা হেয়ার ডাই পেল কোত্থেকে! ফের একবার মহিলার ঘরটা দেখা দরকার। প্রথমটায় এদিকটায় নজর দেয়নি। কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্টের পর ওটা দেখা দরকার হয়ে পড়ছে। পোকা মারার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা সাধারণ ঘটনা। কিন্তু কেশকালা খেয়ে ... নাঃ, বাপের জন্মেও শোনেনি। এর মৃত্যু নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। আধুনিক জীবনযাপনের চাপ থেকে শহরে আকছার যেসব মৃত্যু হচ্ছে সেসব নিয়ে প্রায়ই সিরিয়াল-ফিরিয়াল হয় জানে। তবে তার অধিকাংশেরই

পেছনে প্রাথমিকভাবে বিয়ের পর বনিবনা না হওয়া, বিবাহ বহির্ভূত প্রেম-ফ্রেম এইসব। কারণ যা-ই হোক, মারার ধরন খুব সাধারণ।

কেশকালাটাই এক্ষেত্রে বিশ্রি একটা চাপ, মৃত্যুটা নয়। এটা কি স্যুইসাইড? যদি তা-ই হয়, তাহলে সোহিনী অমন একটা মেসেজ কেন পেল? কেউ যদি শোনে টেক্সটটার বয়ান **'বিকাশ তোমার কোলে দোলে। প্রিয়াঙ্কা খতম দুজনের গোলে'** তাহলে মূল সন্দেহ তার ঘাড়েই এসে পড়বে। সেই সঙ্গে সোহিনীকেও জড়িয়ে একটা রহস্যের খাসমহল বানানো হয়েছে। সে বুঝতে চাইছিল পেছনের গপ্পোটাকে, কিন্তু মাথায় ঢুকছে না। হয়ত বাকি চার জন কোনো সূত্র দিলেও দিতে পারে। সে তো শুধু সুধাকেই নেড়েছে। অমৃতা, মণিদীপা, শ্রেষ্ঠা, আইরিন - সবাইকেই দেখা দরকার।

'বি বনিতে কী কী হয়েছিল?' বালি হাইটসের ফ্ল্যাটে বসে মণিদীপার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ল বিকাশ।

'অমৃতা, সুধা আর আমি ফেসিয়াল করালাম। প্রিয়াঙ্কা আর আইরিন হেয়ার ডাই করিয়েছিল। শ্রেষ্ঠা হেয়ার কাট।' বাঙালি গুডি গুডি বউটি মুখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'প্রিয়াঙ্কা মারা গেছে কেশকালা খেয়ে।'

'জীবনে শুনিনি কেউ ওই জিনিস খেয়ে মরেছে বলে। মেয়েরা সবাই তো ও-জিনিস নিয়মিত ব্যবহার করে।'

বিকাশ দেখছিল। গোলমুখের দিশি মাখনের তালটা প্রিয়াঙ্কার থেকে একটু ছোটই হবে। ঘাড় অব্দি চুলগুলোর খুব পরিচর্যা না করলেও চলে যায়। ভেলভেট মার্কা সিল্কের মতো চামড়ার জন্যেই ওর যত চিন্তা। নীল শাড়িতে আত্মবিশ্বাসী ওই পুডিঙের মতো মুখে এমন কিছু নেই যা থেকে একে এই ঘটনায় জড়িত ভাবা যায়। তাহলে কি প্রিয়াঙ্কা জিনিসটা পেয়েছিল অন্য কোথাও থেকে? ও কি ফালতু এইসব মেয়েগুলোর পেছনে সময় দিচ্ছে? হতে পারে। কিন্তু কেসটা ক্লোজ করার আগে এদের নেড়েঘেঁটে না দেখলেও তো চলবে না। এই অস্বাভাবিক ফরেনসিক রিপোর্ট না এলে সে এসব ঘাঁটতেও আসত না।

'অথচ ম্যাম এটাই তো ঘটেছে।'

'এত জিনিস থাকতে কেশকালা কেন?'

'আমার প্রশ্নও তো তা-ই...'

'উত্তর খোঁজা আপনার দায়, আমার নয়।'

বালি হাইটস থেকে গড়িয়াহাট রোডে নেমে বুঝতে পারছিল, আর যাই হোক এই মহিলার পক্ষে সত্যিই খুনের মতো কিছুতে জড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। যত তাড়াতাড়ি পারে কেসটা ক্লোজ করতেই চাইছিল। কারণ, এটা যদি চলে, এবং মাথামুণ্ডুহীন টেক্সটটা যদি বেরোয় তাহলে তো ও-ও জড়িয়ে যাচ্ছে!

***

'শনিবার অমৃতার সোলো প্রোগ্রামটায় আসছ তো' শ্রেষ্ঠা আইরিনের কাছে জানতে চাইল।

'ভালোই হল মনে কারালে। ভুলেই গেছিলাম। ও বলেছে বটে। কখন যেন?'

'আইসিসিআর-এ সাড়ে ছটায়।'

'বিকেলের ফ্লাইটে রোনাল্ডো মুম্বই যাচ্ছে। তারপর ফ্রি।'

'একজন ছোটবেলার বন্ধুকে সঙ্গে আনছি কিন্তু। সোহিনী। ও ক্ল্যাসিক্যাল এত ভালোবাসে না!'

'দেখেছি আগে?'

'মনে হয় না। খুব ভালো। সাদার্ন অ্যাভেন্যুতে থাকে।'

'অমৃতার গান মুগ্ধ করার মতো! আগে যতবার শুনেছি... আর আইসিসিআরের অ্যাকোয়াস্টিক সত্যিই ভালো।'

অমৃতা মানুষ যত ভালো গানও তেমনই ভালো গায়। রাগের উপর যেমন দখল গলাও তেমনই সুরেলা। শ্যামলা মেয়েটি যথেষ্ট রিজার্ভডও বটে। মিউজিক যেহেতু তার প্যাশন, ফলে এখানেই তার বাড়তি জোর। গুণে সে সবদিক ভরিয়ে রেখেছে। গান ছাড়া সে আর কিছুতেই মাথা দেয় না, ফলে হাতে সময়ও থাকে। কৃতী গায়িকা হিসেবে সবদিকেই তাকে নিয়ে টানাটানি।

শুনেছে অমৃতা নাকি বিখ্যাত পালচৌধুরী বংশের কন্যা। নদিয়ার বালাখানার মহেশগঞ্জ এস্টেটের উত্তরাধিকারিণী। এস্টেট থেকে ওর ভালোই হাতখরচা আসে। তাতে একলা অবিবাহিতা হিসেবে এই মেট্রোপলিসেও দিব্যি চলে যায়। যখন গান নিয়ে থাকে না তখন সামাজিক ওঠাবসা।

'যা যাচ্ছে, আর বলিস না!' রাস্তায় ভিড় বাঁচিয়ে আইসিসিআরের পথে শ্রেষ্ঠা।

'কেন রে?'সোহিনী তাকাল।

'এই বিকাশ চৌবে লোকটা একেবারে ছিনেজোঁক।'

সোহিনী সাবধান। শ্রেষ্ঠা ওদের খবর রাখে না। কিছু বললেই ঝামেলা হয়ে যেতে পারে।

'আবার কী হল?'

'আমাদের গ্রুপের প্রিয়াঙ্কা ছিল না, মেয়েটা কদিন আগে অদ্ভুতভাবে মারা গেছে। ব্যাপারটা যেদিন ঘটেছিল সেদিন আমরা বেরিয়েছিলাম। সেই নিয়ে আজ সারা দুপুর জেরা। বিকেলের মুডটাই চটকে দিয়েছে।'

'কেসটা নিয়ে পুলিসের যা করার রুটিন মেপে সে তো করবেই। চাকরি না? অত রাগছিস কেন?'

'নিকুচি করেছে রুটিনের! মনে হচ্ছিল আমাকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছাড়বে! ওর পক্ষে এটাও সহজ। তারপর চারদিকে খুনের কিনারা করেছে বলে ফাটাবে। যত্তসব।'

সোহিনী চেপে যাচ্ছিল। সে জানে নিজের কাজে বিকাশের ফাঁকি নেই। এই ভ্রূক্ষেপহীন ভাবটাই ওকে লোকটার মাচো ভাবটার থেকে বেশি টানে। তবে শ্রেষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। ও একটু বেশি ছেলে-ছেলে। সাউথ পয়েন্টে ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করত, সিনেমা যেত, এমনকী জামা-কাপড়ও পরত। মিসেস মজুমদার ওকে বদলাবার কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু বদলায়নি। নারীত্ব যাদের আছে বিকাশ তাদের খুব ঘাঁটায় না, তাদের চালনা করেই তার সুখ। আন্দাজ করতে পারছিল শ্রেষ্ঠাকে কেন সে রীতিমতো সেঁকেছে - স্রেফ ওর ব্যক্তিত্বের জন্যে। চৌকো মুখ, ঘনবদ্ধ চোখ, দৃঢ় পীনদ্ধ স্তনদ্বয়, জিনসের শার্টের নিচে ওর শক্তপোক্ত শরীরটা দেখলে কে বলবে ও ছেলে নয়। কেবল নামটা থেকেই বোঝা যায় মেয়ে। সোহিনীর সন্দেহ, লেসবিয়ান সম্পর্কে গেলে ও নিশ্চয় ছেলেদের ভূমিকাই নেবে। ওর কি তেমন কোনো প্রেমিকাও আছে? পুরুষরা চায় নারীত্ব, পৌরুষ তাদের সয় না। বিয়ে নিয়ে মাথাও ঘামায় না।

'আরেক বন্ধু আইরিন গেটে সঙ্গে এসে যাবে।'

'খুব ঝামেলা চলছে?' আইরিনের থেকে তদন্ত নিয়েই মাথাব্যথা বেশি সোহিনীর।

'না। কিন্তু ব্যাপারটা খুব বিরক্তিকর, বুঝলি না! প্রিয়াঙ্কা নাকি কেশকালা খেয়ে মারা গেছে। তুই-ই বল ও কোত্থেকে কেশকালা পেল, কেন এটা করল এসব আমি কীভাবে জানব!'

'নিশ্চয় লোকটা ক্লু খুঁজছে।'

'বার কয়েক দেখা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি ওকে তেমন চিনতামই না। আমি তো ওদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডও নই। ঘটনাচক্রে প্রিয়াঙ্কা এসে গেছিল আমাদের কিটি গ্যাং-এ। ব্যাস--' শ্রেষ্ঠার বিরক্তি প্রকট,'ক্লু আমার চেয়ে যোগেশের কাছ থেকে বেশি পাবে।'

'যোগেশ কে?'

'কে আবার, ওর বর।'

'আত্মহত্যা বলছে!'

‘মনে তো হয়। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। যোগেশ বাঙ্গালোরে। অ্যাপার্টমেন্টে কাক-পক্ষী নেই। আবার কী হবে এ ছাড়া?’

‘ডিপ্রেশন?’

‘মনে তো হয় না। মানুষের ভেতরে কী হয় না-হয় কে বুঝবে! তোর মনে কী আছে আমি জানি? জানি না তো!’

ভাগ্যিস জানে না। জানলে ছোটবেলার বন্ধুত্বটাই কেটে যাবে। সোহিনী ভাবছিল, যদি সব প্রমাণই থাকে তাহলে ওই অজানা টেক্সটটার মানে কী? সত্যি স্যুইসাইড তো, নাকি কেউ ব্যাপারটা ওভাবে সাজাচ্ছে? একটা ঠান্ডা স্রোত তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। কেউ কি বিকাশের উপর প্রতিহিংসা নিতে চাইছে? পুলিশকে তো কত অপরাধীকেই ধরতে হয়। তাদেরই কারো রাগ রয়ে যায়নি তো? উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ভাবনাটা আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজের কথাটা মনে এসে গেল। এইসব বজ্জাতগুলোকে তুমি ধরতেই পারবে না। এরা স্বার্থে আঘাত লাগলে সব পারে। তার ওপর দাম্পত্যের ব্যাপারটা আছে না! সব মেয়েরই চিন্তায় সেক্স জিনিসটা থাকে। তার সঙ্গে ইমোশন জড়িয়ে গেলে কথাই নেই। সবাই জানে অবৈধ যৌনতা আজকের জীবনের সঙ্গে কতটা ওতপ্রোত। খাওয়া, জামা-কাপড়, আশ্রয় যেমন, যৌনতাও তেমনি জীবনে চাই-ই। আগেও তার অভ্যেস ছিল। তাহলে বিয়ের পর খামোকা সতী সাজতে যাবে কেন! সতীত্ব তো শুধুমাত্র সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারণা মাত্র। যতদিন যাচ্ছে আগেকার ভারতীয় সংজ্ঞাও বদলাচ্ছে। আর সে সেইভাবে বড়ও হয়নি। এটা তো আসলে একটা সামাজিক বৈবাহিক সংস্কার। একটাই পেছুটান, তার কর্তা। রাজ আবার খুব বেশি পাত্তা দেয় এইসব সামাজিক ব্যাপারগুলোকে। কিন্তু এটা তো কেবল সে জানে, অজানা ওই মেসেজ করা লোকটার তো জানার কথা নয়।

‘এখন প্রোগ্রামে মন দে তো! বাদ দে ওসব। দারুণ একটা অনুষ্ঠানে এসেছিস। এতেই মন দে। ওসব মাথা থেকে হটা।’

শ্রেষ্ঠা গাড়িটা সোজা হোচিমিন সরণিতে ঢুকিয়ে গোল্ডেন পার্ক হোটেল পেরিয়ে আইসিসিআরের কাছে এনে ফেলল। গেটে ওকে নামিয়ে বলল, ‘দাঁড়া, নীচে গাড়িটা পার্ক করে আসি...’

***

কী যে স্বস্তি!

কেবল বাইরের গা জ্বালানো গরমটা থেকে মুক্তিই নয়, থিসিসটাও তাহলে মোটামুটি সেরে আনা গেল। অচিরা সপ্তম স্বর্গে ভাসতে ভাসতে আইএসআই থেকে ফিরল। স্নানে যাবার আগে এসি-টা বাড়িয়ে দিয়ে জিনসের টপটা খুলে বিছানায় ঝাঁপ দিল। ভ্যাপসা গরমটা মারাত্মক। কলকাতা কুখ্যাত তার এই ট্রপিক্যাল অ্যাটমস্ফিয়ারের জন্যে। দিনে তিনবার স্নান করেও ঘাম থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। স্টেটসে নীলের কাছে গিয়ে উঠতে পারলে কী মজাটাই হবে! থিসিসটা যেহেতু মেরে এনেছে, ফলে এখন সে পাড়ি জমাবার জন্যে তৈরি হতেই পারে। হোয়াটস অ্যাপ বা ফেসটাইম ভিডিও কলিং-এ ইমোশনাল স্বস্তি হয়তো মেলে, কিন্তু শরীর! ভাইব্রেটার তো আসল স্বাদ দিতে পারে না। এই নিঃসঙ্গ দিনগুলোয় হস্তমৈথুনই তার একমাত্র সাথী।

স্নানের আগে তার কাম উদগ্র হয়ে উঠেছিল। লেক টাউনের অ্যাপার্টমেন্টের এই পর্দাটানা ঘরে সাদা লেসের ব্রা আর প্যান্টি পরা শরীরটা এখন গরম। নীলের কথা ভাবতে ভাবতে এই মুহূর্তে সারা শরীরটা ঘামে ভিজে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ বাদে উত্তেজনার উপশম ঘটিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। কোনো তাড়া নেই। স্নান করে গায়ের ঘাম থেকে মুক্তি পেয়ে অল্প বিশ্রাম সেরে ধীরেসুস্থে ড্রেস করে বসের ডিনারে গেলেই চলবে।

সুমিত আজকের দিনটাকে উদযাপন করবে বলেই বেছে রেখেছিল। নিজের বিষয়ে দখল থেকেই জানে অচিরার থিসিস অ্যাকসেপ্টেড হবেই। এখন মেয়েটা একটা ওলা ধরে সল্ট লেকে চলে এলেই দিনটার যথার্থ

উদযাপন সম্ভব। এই ক্যাবগুলো বাজারে আসায় জীবনটা অনেক সহজ হয়েছে।

নীল যে ফোন করবেই অচিরা জানত। ও একটা হোয়াটস অ্যাপ মেসেজ পাঠাল: 'থিসিস জমা হয়ে গেছে। সাড়ে ছটায় কল করি?' সে জানে উইক এন্ডে ও কখন ঘুম থেকে ওঠে। তার আর তর সইছে না। এবার যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভিসার জন্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে। রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে ও নীলের ইউনিভার্সিটিকেই যেহেতু বেছে নিয়েছে, ফলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কেবল শেষ উড়ানটাই যা বাকি।

সিগারেটের শেষটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে একটু ঝিমিয়ে নিল। ঘন্টাখানেক বাদে উঠে স্নানে গেল। বেরিয়ে সিলিং ফ্যানটা চালিয়ে চুলটা শুকিয়ে নিতে যেটুকু সময়, তারপরই নীলকে হোয়াটস অ্যাপ ভিডিও কলে ধরল।

'উঠেছ?'

'প্রায়। শনিবার বলে কথা! রিল্যাক্স করছিলাম।' নীলের ঘুম-জড়ানো চোখদুটো দেখতে পাচ্ছে। ও যথেষ্ট দেরিতে ওঠে জানা বলেই অবাক হল না অচিরা। দেশ বদলায় কিন্তু মানুষের অভ্যেস যাবে কোথায়!

'দেখতেই পাচ্ছি। হাল কী?'

'জামাকাপড় পরতে ভালো লাগছে না বুঝি?'ঘুম জড়ানো চোখে নীল।

'নির্ভুল দৃষ্টি। জেগেছ বুঝলাম...' হেসে বলল, 'স্নান সেরে উঠলাম। প্রফেসর সেলিব্রেট করতে রাতে নেমন্তন্ন করেছেন।'

'পার্টি?'

'না। প্রাইভেট ডিনার। আমিই কেবল...'

'আমার প্রণাম দিও।' আধখোলা ঊর্ধ্বাঙ্গের দিকে লুব্ধভাবে তাকিয়ে বলল,'ক্যামেরাটা জুম আউট করো প্লিজ...'

'শাট আপ। সোমবার এম্ব্যাসিতে যাব।'

'কাগজপত্র নিয়ে যেও। আরো কিছু ডকুমেন্ট লাগলে আমায় বোলো। এ মাসটা দারুণ ব্যস্ত। পরের মাসের শেষের আগে বিয়ের জন্য যেতে পারব না।'

'তাড়াতাড়ি দিনটা ঠিক করে ফেলো কিন্তু। বাবাকে বলতে হবে তো।'

বাবা-মা বর্ধমানে থাকেন। বাবা সেখানে লাকুরদির কাজিরহাটে পদ্মজা নাইডু কলেজ অফ মিউজিকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষক আর মা গোলাপবাগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপিকা। মফসসল শহরে বড় হয়ে সে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে পড়তে চলে আসে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে ডক্টরেট করতে ঢোকে আইএসআই-তে। কলেজ জীবনে পা দিয়েই সে গা থেকে মফসসলি গন্ধটা মুছে ফেলেছে। হাজার চেষ্টাতেও তার মাথায় ঢোকে না সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দুজন মানুষের মধ্যে এই প্রেমের বন্ধন টেঁকে কী করে! শুনেছে একসময় পেরিভাটায় ওঁরা দুজনেই প্রতিবেশী ছিলেন। সেই থেকেই নাকি প্রেমের সূত্রপাত। তখন এরকম হত। কিন্তু নিজেদের জীবনে আজ ওরা কেউই কল্পনাও করতে পারে না নিজেদের কাজের জগতের বাইরে কাউকে বিয়ে করার কথা।

ওর খোলা শরীর দেখার উত্তেজনা ছাপিয়ে এই মুহূর্তে বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেলাই নীলের কাছে জরুরি মনে হল। ব্যাঙ্কোয়েট অবশ্য আগেই বুক করা আছে, কিন্তু বেশি দেরি হলে কেঁচেও যেতে পারে।

'তাড়াতাড়ি জানাচ্ছি...' নীল বলল।

'ভাট ছেড়ে আসল কথায় এসো। বিয়ের পরে দেখার অনেক সময় পাবে।'সদ্য হস্তমৈথুন সারা , এখন জলজ্যান্ত মানুষটাকে কাছে চাইছে।

'সোমবার ফোন করছি। এখন রাখি!' নীল ছেড়ে দিল।

অচিরার চুল শুকিয়ে আসছিল। ক্লোজেট থেকে নীল শিফনের একটা শাড়ি বেছে রেখেছিল। সামাজিক অনুষ্ঠান বেশি না হওয়ায় টুকটাক এটায় হাত দেয়নি। মানানসই ব্লাউজের খোঁজে ক্লোজেট হাতড়াতে লাগল।

সঙ্গে যায় তেমন একটা আছে, কিন্তু সেটা ফিট করছে না। থিসিসের পেছনে দৌড়তে গিয়ে অনেকটা রোগা হয়েছে। প্রসাধন সেরে পছন্দের শিফনটা গায়ে চাপাল। সেলাই করে লুজ অংশগুলো টাইট করল। মুখে প্রসাধন দিয়ে, তার প্রিয় শিফন শাড়িটা পরে উপহার পাওয়া অ্যাক্সের অ্যানার্কির সুগন্ধে মন ভরে গেল। আয়নায় নিজেকে শেষবারের জন্যে মেপে নিতে নিতে ওলার জন্যে তৈরি হয়ে নিল।

বারান্দায় বসে সুমিত যে কোনো সময়ে অচিরাকে আশা করছিল। একটা মেসেজ ঢুকতেই থমকাল,'ওয়ার্নিং-এ পাত্তা দিলেন না। আপনার অচিরার সময় শেষ।' ঘাবড়িয়ে তৎক্ষণাৎ অচিরাকে ফোন, 'কোথায়?'

'ক্যাব উল্টোডাঙা থেকে সল্টলেকে ঢুকল। আসছি...'

খানিকক্ষণের মধ্যে অচিরার গাড়ি দেখল।

'এসে গেছ। বাঁচালে!' সুমিত হাফ ছাড়ল।

'দেরি করে ফেললাম!' অচিরা হাসল।

'একেবারেই নয়। আয়ুষী আয়ুষী, ও এসে গেছে...'

'আসছি...' কিচেন থেকে সাড়া দিল আয়ুষী,'এক সেকেন্ড, এটা নামিয়েই আসছি।

কাউচে বসতে বসতে সুমিত অচিরার দিকে তাকাল,'দারুণ দেখাচ্ছে।'

'এই বছরটায় তেমন বেরোনো হয়নি। তাই এই শাড়িটাই পরলাম।'

মিনি বার ক্যাবিনেট থেকে শ্যান্ডন ব্রুট ক্ল্যাসিক শ্যাম্পেনের বোতলটা বার করল 'আজ এটা তোমার অনারে...'

'গ্রেট!' অচিরার লজ্জামাখা হাসি।

'এমিগ্রেশনের কাজ শেষ?'

'সোমবার অ্যাপ্লাই করব। দেখি কদ্দিন নেয়! হয়ে গেলে বর্ধমানে বাবা-মায়ের সঙ্গে কটা দিন থেকে আসব।'

'ওঁরাও তাহলে খুশি হবেন।'

'দুজনেই বিয়ের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।'

'দেখো ঝামেলা হবে না। তোমায় তো ভাইভার জন্যে ফিরতেও হবে।'

আয়ুষী আজকের জন্যে তাঁতের শাড়ি বেছে রেখেছিল। এসে বসতেই অচিরা টোস্ট করল।

ডিনার শেষ, এবার অচিরার ক্যাব ধরার পালা। সুমিত জিগ্যেস করল, 'রাত হয়ে গেছে। থেকেই যাও।'

'দূর তো নয়! রাতে মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।'

'জানি... কিন্তু তা-ও। থেকেই যাও।'

সুমিতের মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখে অচিরা অবাক। আগেও সে এবাড়ি থেকে দেরিতে ফিরেছে। আজ কী হল?

'নাইট ড্রেসও কিছু আনিনি।' থাকার ইচ্ছে নেই।

'আমার একটা নাও না!'আয়ুষী বলল।

শেষ পর্যন্ত তাই হল। অচিরা গেস্টরুমে ঢুকল। সারা দিনের পর চোখ বুঁজে আসছিল। সুমিত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার গণ্ডির মধ্যে অচিরার গায়ে হাত দেবে কে?

সুমিতের ঘুম ভাঙল বমি আর ওয়াকের শব্দে। অচিরার ঘর থেকে আসছে। কী হল? – শারীর খারাপ নাকি?

উঠে গিয়ে ওর দরজায় দাঁড়াল,'কী হল? ঠিক আছ?' ভেতরে আওয়াজ নেই। আবার ডাকল,'তুমি কী অসুস্থ?'

উত্তর পেল না। দরজা খুলতে চেষ্টা করল। ভেতর থেকে বন্ধ। বারবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে ভয় হল। আতঙ্কে ১০৬৬-এ অ্যাপোলোতে ডায়াল করল। বিধাননগর থানাতেও। অ্যাপোলো গ্লেনিগলস থেকে অ্যাম্বুলেন্স আসতে আধঘন্টা। পুলিস ততক্ষণে দরজার লক ভেঙেছে। অচিরা বিছানায়। চোখের তারা দুটো ছাদের দিকে তাকিয়ে, স্থির। পালস নেই। শ্বাস পড়ছে না। তাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ছুটল হাসপাতালে। এমারজেন্সিতে জানা গেল মৃতই আনা হয়েছে।

অজানা ফোনের কলার আবারও জিতে গেল। সুমিত অচিরাকে আশ্রয় দিতে চেয়েও পারল না। এরকম মৃত্যুতে অটপ্সি হয়ই। বডি গেল মর্গে। খবরটা বাবা-মার কাছে বিনা মেঘে বজ্রের মতো।

বন্ধ ঘরে মৃত্যু বলে পুলিস বিষয়টাকে ধরল শরীরের সমস্যা বলেই। তারা অবশ্য আত্মহত্যার দিকটা নিয়েও ভাবতে চেয়েছিল। একা সুমিতই কেবল জানে যে, বিষয়টা দুটোর একটাও নয়। বরং খুন। কিন্তু সে যদি এখানে বেশি কথা বলতে যায় তাহলে তাকেই মূল সন্দেহভাজন হিসাবে আইপিসি-র ৩০২ বা ৩০৪-এ ফাঁসতে হবে। বিষয়টা যাবে মিডিয়ার কাছে, এবং তারা এখানে মশলা খুঁজবে। আইএসআই-এর অধ্যাপকের পক্ষে ব্যাপারটা ভালো হবে না।

কেন, এবং পেছনে কে? কেনই বা তাকে এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলা হল?

যেহেতু তার ঘরেই প্রিয় ছাত্রীর ভাগ্যে এটা হল, তারও কি দায় এসে যায় না অপরাধীকে খুঁজে বার করার? এইসব খুনের পেছনে কে তা খুঁজে বার করা কি তার নৈতিক দায় নয়? নইলে তো এরকম আরো ঘটনা ঘটেই চলবে। সে তল পাচ্ছিল না। ঘটনা ঘটতে চলেছে জেনেও সে সক্রিয় হয়নি এ জন্যে সে-ও কি জড়িয়ে যাচ্ছে না?

'ও তো বাড়ির খাবারই খেয়েছিল...' আয়ুষীরও মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল।

'তোমার রান্নাই বা বলছ কেন, আর-কিছু থেকেও তো...' সুমিত সত্যিটা আন্দাজ করতে চাইছিল।

কিন্তু, সত্যিটা কী?

***

তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। প্রিয়াঙ্কা জয়সোয়ালের মৃত্যুটা নিয়ে যে কোনো মূল্যে এগোতে চাইছিল বিকাশ। মাথাটা বিগড়ে আছে যতটা নিজের পুলিশি পরিচয়ের জন্যে তার থেকে ঢের বেশি সোহিনীকে করা টেক্সটটার কারণে। যদি এগোতে না পারে, অজানা সেন্ডারের জাল থেকেও বেরোনো যাবে না। তার ওপর যদি ওর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে আরেক কেলেঙ্কারি! সোহিনীকে বাড়িতে যা ফেস করতে হবে মোটেই কহতব্য নয়।

শেষ অব্দি একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞকে পাকড়ে প্রিয়াঙ্কার আই-ফোনের অন্দরে হানা দিল। এটাই এখনো পর্যন্ত অন্ধকারে একমাত্র আলোর রেখা। কেবল সেই বিশেষ দিনের ব্যাপারেই নজর। বেশি ঘাঁটতে গেলে সব গুলিয়ে যেতেই পারে। ঘটনার আগের ফোন কলের মধ্যে বেশি ফোন এসেছে এক আমিশ শাহের, সেই বিকেলে বার কয়েক। তাহলে কি এই লোকের সঙ্গে কোনো ঘাপলা ছিল মহিলার? এসব ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। একে ধরলেই হয়ত কিছু সন্ধান মিললেও মিলতে পারে!

আমিশকে ফোন করল। সাড়া নেই। মোবাইল বন্ধ। অনেক বার চেষ্টার পর ঠিক করল টেলিকম অপারেটরকে ধরে লোকটার ঠিকানা বার করতে হবে। তারা জানাল ঠিকানা দেওয়া আছে বড় বাজারের ৪এ গণপতি বাগলা রোড। লোকটাকে ধরতে হাজিরও হল ঠিকানায়। জানা গেল আমিশ দিন কয়েক আগে নিজের ফ্ল্যাটে বন্ধ ঘরে মারা গেছে।

কী অভাবনীয় ঘটনার ঘনঘটা!

লোকটাকে পাওয়া গেলে তা-ও হয়ত কিছু খবর পাওয়া যেত। তারও কোনো উপায় নেই। একটা আতঙ্কের স্রোত নেমে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। পুলিসের কাজ করতে এসে তাকে অনেক খুনখারাপির

মুখোমুখি হতে হয়েছে, কিন্তু এই মৃত্যুটা ওকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। এটা কি তাহলে আরো বড় কোনো র‍্যাকেটের কাজ? হতেও পারে। ইচ্ছে থাকলেও স্যুইসাইড বলে বিষয়টাকে উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। প্রথমত কেশকালা, তারপর টেক্সটটা, এবার আমিশের এই মৃত্যু - সমস্ত কিছু মিলে বিরিয়ানিটায় মশলা পড়ছে তো পড়ছেই। তা-ও সোহিনী যদি মেসেজটা না পেত তাহলে এতদিনে মৃত্যুটাকে গুমঘরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই যেত। যতবার ভাবছে মেসেজটা সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

'দেখা করা যাবে?' সোহিনীকে ফোনে ধরল।

'রাজ শহরেই...'

'বোসপুকুরের ফ্ল্যাটে কোনোভাবে আসা যায়? জরুরি ছিল...'

ওর চাগিয়ে ওঠা আন্দাজেই বলল,'সন্ধ্যেবেলায় হবে না। দুপুরের পর ঘন্টাখানেকের মতো...'

'ফাইন। দুটোয় তাহলে...'

'প্রবলেম...' বিকাশ চিন্তিত।

'কেন, কী হল?' সবুজ শালোয়ার লাল কামিজে জ্বলন্ত সোহিনী ওকে জড়িয়ে রেখেছে।

'মনে হচ্ছে প্রিয়াঙ্কার নিজেরই প্রব্লেম ছিল। অমিত শাহ নামে একজনের সঙ্গে ইয়ে ছিল। সে ব্যাটাও কয়েক দিন আগে অদ্ভুতভাবে মারা গেছে। ওর ফরেন্সিকের পাত্তা লাগাচ্ছি। বড়বাজারের ওসি শ্যামাশিস বন্ধু। পুলিস ট্রেনিং স্কুলে দারুণ জমত। ওকে দিয়েই বার করাতে হবে। এসএমএসটাই আসলে ঝামেলা পাকাল। মনে হচ্ছে বড় কিছু ঘোটালা আছে।'

চমকালেও সোহিনী শক্ত থাকতে চাইছে,'কেউ ফাঁসাতে চাইছে?'

'না হওয়াই স্বাভাবিক। আর কেউ জানবে কী করে?'

'তাহলে?'

'হয়ত টাকার চক্করে ফাঁসাতে চায়...' কালো টাকার কথাটা ভুলতে পারছে না।

'প্রমাণ করতে হবে তো!'

'প্রমাণ কি তোমার বাড়ির ঝামেলার থেকেও বড়? কী হতে পারে ভাবতে পারছ? একটা মার্ডার আর তারপর...'

সোহিনী বিকাশের বুকে নিজেকে লেপ্টিয়ে শান্ত করতে চাইছিল। কিন্তু ফল হচ্ছে না। এই টেনশনটাই ওকে যুক্তিবুদ্ধি থেকে সরিয়ে আনতে পারে। এই এসির মধ্যেও বিকাশের কপালে ঘামের বিন্দুগুলো দেখা যাচ্ছে। পেছন ফিরে বলল, 'যা গরম! এটা একটু খুলে দাও না প্লিজ।' অন্যদিনের মতো এই ডাকেই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল না বিকাশ। পোশাক ছেড়ে লেসের ব্রা আর প্যান্টি পরা অবস্থায় ওর কোলে উঠল। কিন্তু তারপরেও আজ মাউন্ট নিয়ারাগঙ্গোর মতো ফুসে উঠল না বিকাশের কামনা।

ওকে যতভাবে পারে উত্তেজিত করতে চাইলেও আজ আর পেরে উঠল না, 'কী হল আজ?'

'কে হতে পারে বলো তো!' বিকাশ ভেবেই চলেছে।

'এমন কেউ, যাকে হয়ত তুমি কখনো লাথ মেরেছিলে। আর সে-ই হয়ত এখন...' ছেড়ে রাখা প্যান্টিটা পরতে পরতে বলল।

'না মনে হয়। তারা কেউ হলে সোজা আসত। এরকম টিজ করত না। এ লোক খুব শ্রুড। টেক্সটটা আছে?'

'হ্যাঁ।'ড্রেস করতে করতেই ব্যাগ থেকে ফোনটা বার করল।

বিকাশ একবার ভাবল ফোন থেকে কল করবে। পরে ভাবল, থাক। পরে করা যাবে। নম্বরটা সেভ করে নিল।

'ফিরবে তো?'

'হ্যাঁ...' বুঝতে পারছিল বিকাশ একা হতে চাইছে। তাহলে ডাকলই বা কেন? অবশ্য বিশ্রি ঝামেলায় ফাঁসলে মেয়েছেলে মাথায় ওঠে এটাও ঘটনা।

'দরকার পড়লে ফোন কোরো।' বেরিয়ে এল সোহিনী। তার মাথা এখন গরম। গাড়ির এসি কিছুটা স্বস্তি দিলেও ট্রাফিক মেজাজ খিঁচড়ে দিল। জ্যামে যখন ফেঁসে আছে এমন সময় টিং করে মেসেজ ঢুকল'**তোমার শান্তি বিকাশে নয়, তোমার মধ্যেই। হোয়াটস অ্যাপ দ্যাখো।**' চেক করল। অচেনা নম্বর। আগের নম্বরটা দেখল। না, তা-ও না।

হাত-পা কাঁপছিল তার। এখন বাড়ি পৌঁছতে পারলে বাঁচে। এর আগে নিজের ঘর যে এত কাম্য জানত না। ওখানেই সে নিরাপদ। বাইরে নয়।

সোহিনী বেরিয়ে যাবার পরেও বিকাশ বসেই। কী করা যায় ভেবে বার করতেই হবে। টেক্সটটা সোহিনীকে করা, তাকে না। যে-ই করুক সে ওকেও তার সঙ্গে জড়িয়েছে। নিজে অর্জুনের ভূমিকা নিয়ে সোহিনীকে শিখণ্ডীর মতো ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। একটু ভুল চাল দিলেই সে-ও ফাঁসবে। দুটো অদ্ভুত মৃত্যুর সঙ্গে ওই বিচিত্র অজানা মেসেজের নিশ্চয় যোগ আছে। যদিও দুটোকেই আপাত ভাবে দেখলে মনে হতে বাধ্য আত্মহত্যা, কিন্তু'**বিকাশ তোমার কোলে দোলে। প্রিয়াঙ্কা খতম দুজনের গোলে**' মানে তো পরিষ্কার খুনের ইঙ্গিত। স্যুইসাইড না হোমিসাইড তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। কিন্তু এই মাকড়সার জালটা ভাবিয়ে তুলছে।

ফ্ল্যাট থেকে থানায় ফিরবে বলে বেরোবে, ঠিক মুখেই সোহিনীর দিগ্বিদিক জ্ঞান হারানো ফোন, 'ফের আসার সময় টেক্সট এসেছে। বলল হোয়াটস অ্যাপ দেখতে। খুলে দেখি আজ বিছানায় আমাদের দুজনের ছবি পাঠিয়েছে।'

'কী?' বিকাশ লাউঞ্জেই বসে পড়তে যাচ্ছিল।

'পাঠাচ্ছি দ্যাখো।' সোহিনী কাঁপাকাঁপা আঙুলে মোবাইলের বোতাম টিপল।

'অবিশ্বাস্য। ফ্ল্যাটে নিশ্চয় ক্যামেরা আছে।'

'কিছু করো। ফটোপ্রুফ থাকলে ভাবতে পারছ হাল কী দাঁড়াতে পারে!'

বিকাশের চেয়ে ভালো কে জানে! রাজ জানার আগে যেভাবে হোক লুকোনো ক্যামটা বার করতেই হবে।

'ভেবো না। দেখছি। পুলিসের হাত পড়লে মালটা লুকোতে পারবে না।'

কিন্তু এত কি সহজ হবে!

***

'অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ।' ডিসিডিডি সুব্রত পত্রনবীশ ভারী চশমার আড়ালে তাকালেন,'হুঁ, পিএম রিপোর্ট দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, স্যার...' শ্যামাশিস মাথা নাড়ল।

'তাহলে আর এটা টেনে লাভ নেই। কেস ক্লোজ করে দিন। কোন দোকানের খাবার ছিল?'

'শুনলাম রোজ ডিনার করত গিরনারে।'

'আগের রাতে কী খেয়েছিল জানা গেছে?'

'মালিক একজনকে জিগ্যেস করে বলল রাইস আর মাটন কারি।'

'দোকানে এটাই সাধারণত লোকে খায়। অস্বাভাবিক কিছু নেই বলেই মনে হচ্ছে। ওখানে কীভাবে বিষটা গেল! রিপোর্ট বলছে ব্যাসিলাস সেরিয়াস ফুড পয়জনিং। মেডিক্যাল ভাষা ভালো বুঝিও না। ফরেন্সিক প্যাথোলজিস্টকে ফোন করেছিলাম। গুচ্ছের টেস্ট রিপোর্ট পাঠিয়েছে দেখছি...' ভারী চশমার আড়াল দিয়ে কাগজগুলো দেখলেন, 'স্পেসিমেনে হেমোলিসিন, এন্টারোটক্সিন, সাইটোটক্সিন, সেরেউলাইড ইত্যাদি

মিলেছে। এসব ডাক্তারি জারগন কে বোঝে! কিন্তু বলা হয়েছে খাবার যদি সারারাত সামান্য যত্ন না নিয়ে রাখা হয়, টাটকা না হয়, তাহলে ব্যাক্টেরিয়া বেড়ে টক্সিনে পরিণত হতেই পারে। এটাই আসল কেস। সিম্পল ফুড পয়জনিং। কেস ক্লোজ করুন। আগে স্বাস্থ্য ভবনে ফুড সেফটি কমিশনারকে বলুন গিয়ে গিরনারের ফুড হাইজিনটা চেক করে নিতে।'

শ্যামাশিস শুনতে শুনতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছিল। যদি এটাকে হোমিসাইড ধরা হত তাহলে ফের সেই তদন্তের ঝামেলা। এতে পকেটে এক পয়সাও ঢুকত না। ফালতু ঝামেলায় ফাঁসার মানে হয়! যেহেতু ক্লোজারের সিদ্ধান্ত তার নয় ফলে আচমকা আর এই কেসে নতুন করে নাড়াচাড়া পড়বে না।

'ভিক্টিমের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলেছেন?' পত্রনবীশ জানতে চাইলেন।

'না, বলব। রিপোর্টটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হদিসও তো জানি না...'

'মোবাইল চেক করুন। যেসব নম্বরে ও বারবার ফোন করত তাদের সঙ্গে কথা বলুন।'

'বলেছি স্যার। বেশিরভাগই ব্যবসার ফোন, কেবল একজন মহিলারই নম্বর...'

'বউ হয়ত।'

'ভিক্টিম বিয়ে করেনি স্যার।'

'তবুও। মহিলার সঙ্গে কথা বলুন...'

'চেষ্টা করেছিলাম স্যার। মোবাইল স্যুইচড অফ। মহিলা থাকেন গুরুসদয় রোডে। অজন্তা অ্যাপার্টমেন্টে। শুনলাম তিনিও নাকি অদ্ভুতভাবে মারা গেছেন।'

এই কেসটার ব্যাপারেই তো পত্রনবীশ আইএসআই-এর অধ্যাপককে জেরা করেছিলেন। দু জনেই বন্ধ ঘরে মারা গেছিল। স্যুইসাইডের ব্যাপারটায় ফাঁক থেকে যাচ্ছে কি? স্যুইসাইড কি না সে ব্যাপারে তদন্তের জন্যে সময় বা তেমন তথ্য কিছু হাতেও নেই। তা ছাড়া পুলিসের এত কাজ থাকে! কোনো নিশ্চিত কারণ না পেলে কোনো মৃত্যু নিয়ে ছুটোছুটি করা অনর্থকও।

'বডি পোড়ানোর ব্যবস্থা করুন...' বিষয়টা নিয়ে পত্রনবিশের ফালতু টানাহেঁচড়া করার কোনো ইচ্ছেই নেই।

শ্যামাশিস লালবাজার থেকে বেরিয়ে নিজের অফিসের দিকে ফিরতে ফিরতে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। যাক, ফালতু টানাহ্যাঁচড়া ছাড়াই কেসটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। সকাল দুপুরের দিকে যত গড়াচ্ছে ভ্যাপসা গরম তত বাড়ছে। রবীন্দ্র সরণির ভিড় ঠেলে গাড়ি আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল। আগেই মরো আর পরে, সবই আসলে ভাগ্যের ব্যাপার। নেহাত কাছের মানুষ নাহলে এসবে বেশি পাত্তা দিতে গেলে চলে না।

***

প্রিয়াঙ্কা নেই। আমিশ মৃত। দুটো মৃত্যুই মাথা গুলিয়ে দেওয়া। বিকাশের কিছুই মাথায় ঢুকছিল না। প্রিয়াঙ্কার আই ফোন থেকে বোঝা যাচ্ছে দুটোর মধ্যে যোগ আছে। কতটা? সোহিনী আর তার সঙ্গে এসএমএসের খেলাই বা খেলছে কে? প্রথমে আত্মহত্যা মনে হলেও মেসেজ থেকে বোঝা যাচ্ছে দুটোই খুন। পুলিসে এতদিন হয়ে গেল, জানে অপরাধীকে ধরতে চাইলে মোটিভটা জানা দরকার। ওদের ব্যক্তিগত জীবনে ঢোকা গেলে জানা যেত হয়ত সত্যিটা কী। সেদিন বিকেলে যারা মহিলার সঙ্গে ছিল তারা এই খুনের ব্যাপারে এমন কিছু নতুন তথ্য দিতে পারেনি।

যদিও অমৃতার ব্যবহার খুবই ভালো, সহযোগিতার মনোভাব আছে ব্যবহারে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলেও কোথাও পৌঁছনো যায়নি।

'আমি তো খুব নিয়মিত ওদের সঙ্গে বেরোতে পারি না। গান নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝেমধ্যে একঘেয়েমি কাটাতেই ওদের সঙ্গে বেরোই। খুবই মাঝেসাঝে। ঘটনাচক্রে সেদিন ফ্রি ছিলাম। ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার হলেও ক্লাবে তেমন যেতে-টেতে পারি না। নেহাৎ সুধা খুব করে ডাকছিল, তাই...'

‘আপনি কি প্রিয়াঙ্কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?’

‘না। আমাদের কিছু কমন বন্ধু আছে, ব্যাস! ওর মারা যাওয়াটা খুবই শকিং, কিন্তু বুঝতেই পারছেন... আসলে এত কম চিনতাম ওকে যে---’

‘সেদিন ওঁর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছিলেন কি?’

‘না তো! আর-সব দিন যেমন থাকত তেমনই।’

‘আপনি বিবাহিত?’

মাথা নাড়ল। ও চলে যেতেই বিকাশের মনে হল এ মহিলাকে এই এলিট দঙ্গলে ঠিক মানায় না। এমনকি, বাকিদের মতো ও ঠিক শহুরেও নয়। খানিকটা মফসসলি ব্যাপার আছে ওর মধ্যে। ওর নিরীহ মুখচোখ, তামাটে রং, লম্বা চুল, শরীরের সঙ্গে মানানসই বুক, নম্র আর ভদ্র নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার ওকে চিনিয়ে দেয়। কেবল মুখচোখই নয়, ব্যবহারও। এ কী করে এদের সঙ্গে ভিড়ল! হতেই পারে এলিটদের সঙ্গে এই মেশামেশি সমাজে জায়গা করে নেবার ধান্দায়। সহকর্মীদের কাছ থেকে তার পারিবারিক ইতিহাসের কিছুটা ওর জানা। যদিও মোটামুটি রোজগার ভালোই কিন্তু হাবেভাবে চালচলনে তার তেমন প্রকাশ নেই। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে এই মেয়েটাকে ঠিক মেলানো যায় কি?

শ্রেষ্ঠা মোটেই ওর মতো নয়। দেমাকি বলে ওকে জেরা করা কঠিন। টুকটাক কয়েকটা প্রশ্নের পরেই সে বিদ্রোহ করল।

‘যা জানতাম বলেছি। ওর বিষয়ে প্রায় কিছুই জানি না। আমায় বেরোতে হবে। তাড়াতাড়ি করুন।’

বিকাশ বুঝতে পারছিল, ও সাহায্যের ধার ধারে না। সঙ্গীসাথীদের মধ্যে কেউ অস্বাভাবিকভাবে মারা গেলে অধিকাংশই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু একে মনে হয় বারবার প্রশ্ন করায় খেপে আছে। কেন? তাহলে কি এতে ওর কোনো হাত আছে? প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কোনো গুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা? টমবয় টাইপের মেয়েটা যতটা না নমনীয় তার থেকে বেশি উদ্ধত। ওর ব্যাপারটা দেখতে হবে!

‘উঠছি। ভয়ের কিছু নেই। আবার হয়ত আসতে হবে।’

বিকাশ বেরোবার পর শ্রেষ্ঠা একটু ঠান্ডা হল। একে পুলিস-টুলিস তার সয় না, তার ওপর খুনের তদন্ত! এর সঙ্গে আবার সে যদি জানত সোহিনীর অবৈধ সম্পর্কও আছে তাহলে নিজেদের ছেলেবেলার বন্ধুত্বটা নিয়েও বোধহয় অন্যভাবে ভাবত।

সঙ্গীতা মলহোত্রা এক কাপ কফি দিয়ে বিকাশকে অভ্যর্থনা জানাল।

‘আপনি তো ওঁর প্রতিবেশী। পাশেই থাকতেন। কতকগুলো প্রশ্নের জবাব খুঁজছি।’ সঙ্গীতা চুপ,‘আচ্ছা, প্রিয়াঙ্কার কি কারো সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল?’

‘আজকাল এটা তো আমাদের আধুনিক জীবনের একটা অংশই। অনেকেরই এরকম আছে। প্রিয়াঙ্কা অধিকাংশ সময়েই একা থাকত। যোগেশ তো বাইরে বাইরেই। স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষসঙ্গ চাইতেই পারে। কী বলছি বুঝতে পারছেন তো!’

ওর নিঃসঙ্কোচ বক্তব্যে বিকাশ পরের প্রশ্ন করার সুযোগ পেল, ‘আমিশ শাহ নামে কাউকে চেনেন?’

‘নামে চিনি না। মুখ দেখলে...আমি তো যতই হোক বাইরের লোক...’

‘আপনাকে কখনো কিছু বলতেন?’

‘খুব কাছের কেউ বাদে বিয়ে হওয়া মেয়ে কি কাউকে এসব বলে? আমি তো অত কাছের কেউ নই, ফলে...’

‘বড়বাজারের কাপড়ের ব্যবসায়ী কেউ।’

‘নামে তো ওভাবে বলতে পারব না। আর ওদের কার কী পেশা তা-ই বা জানব কী করে?’ একটু থামল,‘কী বললেন, কাপড়ের ব্যবসায়ী?’

‘হ্যাঁ।’

‘এ-ই কি আমার ভাগ্নির বিয়েতে ড্রেস মেটেরিয়াল সাপ্লাই করেছিল? প্রিয়াঙ্কা যেহেতু বিয়েতে খুব জড়িয়েছিল তাই ওর সঙ্গে ভালোই পরিচয় হয়ে যায়। যোগেশ বাইরে থাকলে লোকটা ওদের অ্যাপার্টমেন্টে আসত। নাম বলতে পারব না, তবে আপনি যাকে খুঁজছেন হতেই পারে।’

‘আপনি বলছেন আপনার ভাগ্নির বিয়েতে সে কাপড়-চোপড় সাপ্লাই করেছিল, তাহলে নাম তো আপনার জানা উচিত…’

‘আমার এক দূরসম্পর্কের কাজিন বিয়েটা অ্যারেঞ্জ করেছিল, বাকিটা দেখাশোনার ভার ছিল প্রিয়াঙ্কার।’

মুখ ফসকে বলে ফেলা কথাটায় লজ্জিত হল। বিয়েটা সঙ্গীতার মেয়ের নয়, ভাগ্নির। বিয়েতে সব সাপ্লায়ারের সঙ্গে পরিচয় না থাকারই কথা। প্রিয়াঙ্কার আইফোন থেকে এখন জানে আমিশ-প্রিয়াঙ্কার মধ্যে সম্পর্ক একটা সত্যিই ছিল। এখন দুজনেই মৃত, এবং মৃত্যুর ধরনই বলে দিচ্ছে এটা আত্মহত্যা না হয়ে খুনও হতে পারে। তা যদি হয় তাহলে মোটিভের ক্ষেত্রেও দুটো মৃত্যুর মধ্যে সম্পর্ক থাকতেই পারে। খুব সম্ভবত প্রতিশোধই। তা-ই যদি হয় যোগেশ নিঃসন্দেহে সন্দেহের তালিকায়। কিন্তু সন্দেহভাজনদের তো বিচার বা শাস্তি সম্ভব নয়, যদি মোটিভই না জানা যায়।

প্রতিশোধ!!!

সে এরকম খুনের কেসে ফালতু সময় নষ্ট করা পছন্দ করে না। পরে এর ঝাড় নিজেদের ঘাড়েই আসে। গোপনে সে সোহিনীর জন্যে একটা হিরের নেকলেস কেনার জন্যে টাকা জমাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি না করলে সেই হিরের ছটায় নিজের মুখই পুড়তে কতক্ষণ!

বাড়ি ফিরে শ্যামাশিসকে ফোন করল,‘মনে হচ্ছে আমাদের দুজনের কেসেই কমন কিছু আছে। এবং সেটা খুন। দেখা হওয়া জরুরি…’

‘আমার কেস সালটে এসেছে। খুন না। ডিসিডিডি পত্রনবীশ এখুনি ডেকেছিলেন পিএম রিপোর্ট নিয়ে। আমিশেরটা ফুড পয়জনিং। ওই জন্যেই মরেছে। এখন খুন বলে ফের কাজ শুরু কঠিন…’

‘কী?’বিকাশ প্রায় চেয়ার থেকে উলটে পড়ে আর কী! প্রতিশোধের থিওরি প্রায় ফেঁসে যেতে বসেছে। হুডানিটের কেসে এ তো নতুন আলো।

‘পিএম রিপোর্ট তা-ই বলছে।’

‘কী করে?’

‘খাবারটা ঠিকমতো করা হয়নি, ঠিকঠাক ভাবে স্টোর করাও নয়। সাধারণত ও খেত গিরনার হোটেলে। ওইখান থেকেই ঘটনাটা ঘটেছে। পত্রনবীশ কলকাতা কর্পোরেশনের ফুড ইন্সপেক্টরদের ডেকে বিষয়টা দেখতে বলেছেন। চাইলে বলো, রিপোর্ট ফ্যাক্স করছি।’

‘না, তার দরকার নেই।’ বিকাশ কী করবে ভেবে পেল না।

সোহিনীর হিরের নেকলেসের ভাবনা আপাতত শিকেয়। এখন আমিশকে নিয়ে কী করা যায় সেটাই কথা। প্রিয়াঙ্কার কেসটার কিচ্ছু করা যাবে না যতক্ষণ তার প্রেমিকের ব্যাপারটা যাচাই হচ্ছে।

***

অমন ঝকঝকে মেয়ের এ হেন পরিণতিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছিলেন অচিরার বাবা-মা।

‘আপনার বাড়িতে এটা হল কী করে?’

‘কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।’ অপরাধী মুখে সুমিত বসেছিল। যদিও ওঁরা অভিযোগ কিছু করেননি, কিন্তু ওঁদের চাউনিই বলে দিচ্ছে ওঁরা ওকেই অপরাধী ঠাওরাচ্ছেন। বিশেষ করে ঘটনাটা যেহেতু ওর বাড়িতেই

ঘটেছে, তাই আপাতত কিছু বলারও নেই। কেবল সে-ই জানে যে ব্যাপারটা মোটেই অ্যাক্সিডেন্ট নয়। আয়ুষীকেও টেক্সটগুলো দেখায়নি।

'নীল নেক্সট ফ্লাইটে আসছে।'

'আমায় বলেছে। বিরাট শক বেচারার কাছে। যখন ওর যাওয়ার সব ঠিক তখনই... সব বাতিল করে আসতে হচ্ছে!'

'ইন্সটিটিউটে জয়েন করার পর থেকে ও আপনার কেয়ারেই ছিল। নীল আর আপনি - আপনাদের কাছে ওকে ছেড়ে আমরাও নিশ্চিন্তে ছিলাম।'

'বার করতে চাইছি এখানে আসার আগে কিছু খেয়েছিল কিনা।'

'কে বলবে! যে চলে গেছে সে তো আর কথা বলতে আসবে না।'

'পোস্টমর্টেমই বলবে। তার জন্যেই অপেক্ষা।'

যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে মৃত্যুটা কী থেকে হয়েছে ততক্ষণ কিচ্ছু বলার মানেই হয় না। বমি হয়েছিল। সে তো নানা কারণেই হতে পারে। নিঃসন্দেহে গ্যাস্ট্রোনোমিক বলা যায় না। অচিরার মারা যাওয়ায় অনুতাপ, মৃত্যুর আপাত অর্থে কারণ যা-ই হোক, সুমিতই কেবল জানে এটা খুন; অথচ কারণ অজানা, মোটিভও গূঢ়... সুমিতের বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

অচিরা মোটেই চরে বেড়ানো মেয়ে ছিল না। ইন্সটিটিউটে জয়েন করার পর চার বছর ধরে মেয়েটাকে দেখেছে। বর্ধমানে বড় হওয়ায় প্রেসিডেন্সিতে পড়া সত্ত্বেও সে মফসসলি ভ্যালুজ ছাড়তে পারেনি। ইন্সটিটিউটেই পড়ে থাকত মেয়েটা। এই ঠান্ডা মানসিকতা নিয়ে মেয়েটা কী করে নীলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল তার মাথায় আসে না। কেবল তার মানসিকতার সঙ্গে একটাই বিচিত্র জিনিস মেলানো যায় না সেটা তার স্মোকিং-এর হ্যাবিট। মফসসলি মানসিকতার যায় না। সুমিত বোঝে একাকীত্ব আর তার ওপর রিসার্চের খাটনি ওকে আর সব কলকাত্তাইয়ের থেকে পরিণত করে তুলেছিল।

'তোমাকে বলেছিলাম। তুমি ভাবলে তুমিই অচিরাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে বাঁচাতে পারবে। কোনো বুদ্ধিমত্তাই যোগ্যতা হতে পারে না। তা নিহিত আছে ধাঁধার গভীরে।'টিং টিং করে টেক্সট ঢুকল।

কে এই রহস্যময় নাক গলানো লোক? কেন সে এরকম মৃত্যুর ধাঁধায় তাকে ফাঁসাচ্ছে? সুমিত ভেবে পাচ্ছিল না। সে যে-ই হোক, অচিরার মৃত্যুর পর এখন সে চাইছে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হোক। পরের আরেকটা মৃত্যুর চাপ নেওয়া আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার আগেই বার করতে হবে। যে কোনো খুনেরই তো একটা মোটিভ, একটা প্যাটার্ন থাকবে। নিঃসন্দেহে ক্লু-ও আছে। কেবল তা গোপন করা আছে... এই যা! শিকড়ে পৌঁছলেই সমস্ত ধাঁধার সমাধান মিলবে। ক্রাইম সব সময় কোনো না কোনো চিহ্ন রেখে যায়। তা-ই যদি হয় তাহলে অপরাধের ঘটনাস্থলে নিশ্চয় তার চিহ্ন কিছু রয়েছে। আগের দুটো না হয় তার হাতের বাইরে ছিল, কিন্তু এটা তো তা নয়। সে অচিরা যে ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে সেই ঘরে। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিচ্ছু মিলল না।

'হল কী করে এটা?' সময় নষ্ট না করে নীল পরের ফ্লাইট ধরেছে। প্রেমিকার শেষ স্মৃতিটুকুর আশ্রয় চাইছিল।

'কোনো কারণই তো ধরতে পারছি না...' সুমিত ওলা ধরে তাদের বাড়িতে ডিনারে আসার সময় থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত অচিরার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি উগড়ে দিচ্ছিল।

'কিন্তু ও বাড়ি গেল না কেন?' নীল জানতে চায়।

'বেশ দেরি হয়ে গেছিল। একলা এতটা যাবে, অত রাতে - আমিই তাই থেকে যেতে বলি। আমার বাড়িতে এসেছিল, নিরাপত্তার দিকটা দেখব না?'

'তারপরেও তো আপনার বাড়িতেই...' নীল কথা শেষ করতে পারল না।

সুমিত চুপ করেই ছিল। ট্র্যাজিক মৃত্যুটা সম্পর্কে কী বলা যায় খুঁজে পেল না।

'পোস্টমর্টেমের চক্কর মিটবে কখন?'

'মনে হয়, কাল। যেহেতু অস্বাভাবিক মৃত্যু, ওরা নিশ্চয় প্রাথমিক তদন্তও সেরে নেবে, যেন কোনো ক্লু-ই চোখের আড়ালে না থেকে যায়।'

'আপনার এখানে আসবার আগেও ওর সঙ্গে হোয়াটস অ্যাপে কথা হয়েছিল।'

'কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলে?'

'না। এমনি উইক-এন্ডের টুকটাক কথা। বলেছিল সোমবারেই ভিসার জন্যে এমব্যাসিতে যাবে...'

পিএম রিপোর্টেও এমন কিছু মিলল না যা থেকে বোঝা যায় এটা অ্যাক্সিডেন্ট, সুইসাইড না খুন। কেউ যখন কিছুই বলতে পারছে না, তখন কেবল অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায়?

***

মাকড়সার জাল ছড়িয়ে পড়ছিল। সুমিত পুরো জড়িয়ে যায়নি। আগে প্রিয়াঙ্কা আর আমিশের মৃত্যুতে সে নড়ে বসেছিল বটে কিন্তু তাদের সঙ্গে সুমিতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে ক্ষেত্রে টিজারটাই ছিল মূল কথা, যে, কেন তাকে এসব বলা হচ্ছে... অপরাধের যারা শিকার বা বলি তারা তার কেউ ছিল না। স্বভাবতই মানুষ একদম তার নিজের কেউ না হলে কারো মৃত্যু নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতে চায় না। কিন্তু অচিরা তার কাছের। তার মৃত্যু ওকে তাতিয়ে দিতেই পারে। প্রতিদ্বন্দ্বী যদি চাবুকের মতো টানটান না হয় তাহলে খেলায় মজা কই!

এইসব খুন নিয়ে পুলিস তেমন মাথা ঘামাতে না-ই পারে। তাদের মাথাব্যথা সাধারণ গুন্ডা, খুনের অস্ত্র, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ এসব থেকে খুনের মোটিভ বার করা। বিকাশ চৌবেও সেপথেই এগোচ্ছিল। শ্যামাশিসও তার ঘাড় থেকে ঝামেলা নামায় খুশি। বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের খুন নিয়ে পুলিস খুব একটা তোলপাড় করে না, কারণ সবাই জানে এরা অবৈধ কারবারে জড়িয়ে থাকে। আর কে না জানে খুনের ক্ষেত্রে অনেক সময় টাকা ব্যাপারটা খুব ভাইটাল রোল নেয়।

বিকাশ কেসের সমাধানের চেয়ে সোহিনীর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক গোপন করতেই বেশি উৎসুক। যে কোনোভাবে সোহিনীকে সাইডলাইনে রাখাটাই ওর আসল ধান্দা। বার করার চেষ্টা করুক কীভাবে ওদের দুজনের ছবি হ্যাক হল। কপি নাইন, মেটাস্পয়েন্ট, ক্যামেরা রিমোট, অ্যালফ্রেড, ওয়ার্ডেন ক্যাম, আইপি ওয়েবক্যাম প্রো-র মতো অজস্র অ্যাপ্লিকেশন আছে যা দিয়ে ওদের ক্যামেরা ফোনের দখল নেওয়া যায়। গোপনে ইন্সটল করা এমস্পাই স্টেলথ মোডে রাখলে কোনো ক্যামেরা রেকর্ডিং-ই ধরা যাবে না। এই নেট যুগে স্রেফ যান্ত্রিকভাবেই যখন নজরদারি সম্ভব তখন সশরীরে গিয়ে নজর রাখার দরকার কী! তাদের ঘনিষ্ঠতার ছবির জন্যে সোহিনীর ফোনে নজর রাখাই তো যথেষ্ট। সুমিতই আমার লক্ষ্য, বিকাশ নয়। ও সোহিনীর কী হল না হল তা-ই নিয়ে ভাবুক, আমি বরং সুমিতের মাথা গোলানোর বন্দোবস্ত নিয়েই থাকি। বিকাশ, শ্যামাশিসরা আমার চায়ের কাপ নয়।

ফালতু টেক্সট না করে কথাই বলা যাক। লিঙ্গ আর গলার স্বর লুকোনোর জন্যে না হয় সবথেকে ভালো ভয়েস চেঞ্জারের সাহায্যই নেওয়া যাক। সোজা ব্যাটেই খেলা যাক!

'সুমিত দাস, চিনতে পারছেন?'

'না।' সুমিত অচেনা মহিলার গলায় বিহ্বল।

'চার নম্বরের জন্যে তৈরি তো ?' প্রলুব্ধ করা নারীকণ্ঠের মুখোশই যা করার করল।

'কে আপনি?' ও তোতলাতে লাগল।

'আমি না আমরা? আমি কি কখনো ফোন করেছি আগে?'

'না, আগে গলা ছিল পুরুষের।'

‘নাম, লিঙ্গ এসব তো পার্থিব পরিচয় মাত্র। বুদ্ধির খেলায় এগুলো কোন কাজে আসবে?’

সুমিত ভাবছিল...কথা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। যদি... আচ্ছা, লালবাজারকে বলে কলের হদিশ করা তো যায়ই। করতে পারলেই তো তদন্তের রাস্তা খুলে যাবে। কিন্তু সে পথে কিছু করাও মনে হচ্ছে সহজ হবে না! তা-ও হাল না ছেড়ে বলল, ‘এক সেকেন্ড, ল্যান্ড লাইনে একটা কল এসেছে...’

‘পুলিসকে বলবেন তো কল ট্রেস করতে!’ হেসে,‘ বুদ্ধু পেলেন? কাম’ন, পুরুষের মতো খেলুন। যত ওই গাঁটগুলোকে জোটাবেন তত ফাঁসবেন! বুদ্ধি খাটান। অন্যেরা পারবে না। কেন বুঝছেন না, আমি সমস্ত আটঘাট বেঁধেই নেমেছি!’

নিঃসন্দেহে তা-ই। এসব আদ্যিকালের চালাকিতে ফল হবে না। বরং তাতে পুলিসেরই সন্দেহ বাড়বে।

‘লোকগুলোকে মারছেন কেন?’

‘আপনাকে পথে আনতে। আপনার প্রিয়পাত্রী অচিরা গেল। এতেও আপনি নড়ে বসবেন না?’

‘বসেছি। কিন্তু এতে আমায় ফাঁসানো যায় না। আমার বাড়িতে ঘটেছে ঘটনা। অটপ্সি রিপোর্ট আজ পেয়ে যাব।’

‘সেটা ডিকোড করতেও কিছু সূত্র চাই। আপনি ওদের চেয়ে বেশি স্মার্ট। আপনার কাছে যুক্তিসম্মত জবাব আছে তো, নীল বা ওর বাবা-মা তো জিগ্যেস করবেন!’

না, নেই। কলার ওকে খোলা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। বলছে ধাঁধার সমাধান করতে। কোনো পুরনো ধাঁচের কায়দায় নয়। মেসেজ জ্বলজ্বল করছে। এইসব খুনের সমাধান। কারণ? সেটাই কলার চায় ও খুঁজে বার করুক।

‘আমায় কী করতে বলেন?’

‘আপনি কী করবেন বলে দেবার আমি কে? নিজে ঠিক করুন। পরের জন খসবে আজ রাতে স্প্যানিশ গিটার ফেস্টে। ওটা অরগানাইজ করছে দ্য ক্যালক্যাটা মিউজিক স্কুলের সহায়তায় ইন্সটিটুটো সেরভান্তেস। ঝেড়ে আর কী কাশব! তৈরি হোন...’ যথেষ্ট বলা হয়ে গেছে।

এবার ও নিজের চরকায় তেল দিতে চাইলে দিক। সময় নেই।

***

সুমিত ভাবছিল কী করবে! ধাঁধায় ডুবে যাওয়াটা কি ঠিক হবে, নাকি হাত ধুয়ে ফেলে এমন ভাব করবে যেন এরকম কোনো কলই পায়নি। হাতে কোনো প্রমাণ না নিয়ে পুলিসকে কিছু জানানোর ফল কী হতে পারে ভালোই জানে। যদি কলের কথা সত্যি হয় তাহলে ও আরেকটা ঝাড়ের মুখে পড়তে চলেছে।

আরেকটা মৃত্যু সামনে তাথৈ নাচছে।

তার পক্ষে আর হজম করা অসম্ভব। এটা তার মানবিকতার প্রতিই যেন চ্যালেঞ্জ। হাতে এখনো সময় আছে। আয়ুষীর দিয়ে যাওয়া লস্যি তার উত্তেজিত মাথা ঠান্ডা করছে। কলার খুব কায়দা করে বলটা তার কোর্টে ঠেলে দিয়েছে। মাথায় নানা চিন্তার স্রোত সত্ত্বেও নেটে গিয়ে দ্য ক্যালক্যাটা স্কুল অফ মিউজিক খুঁজে বার করল। আগে এর নামও শোনেনি। ওয়েবসাইট থেকে জানা গেল যথেষ্ট নামী মিউজিসিয়ান ডাঃ ফিলিপ্পে সান্দ্রে ১৯১৫ সালে এই প্রখ্যাত সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্ভবত দেশে এটাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে মিউজিকের পাশাপাশি নাচ, স্পিচ ট্রেনিং, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তালিম দেওয়া হয়। ১৯৭৫-এ এখানকার ভারতীয় সঙ্গীত বিভাগের উদ্বোধন করেছিলেন স্বয়ং পণ্ডিত রবিশঙ্কর। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের সঙ্গেও যুক্ত। যেমন, সারা বছর এখান থেকে নানা ধরনের ট্রেনিং, কনসার্ট, মিউজিক অ্যাপ্রেসিয়েশন কোর্স ইত্যাদির আয়োজন হয়। প্রথমে ১৯৭২-এ ওয়েলেসলি স্ট্রিটে চালু হবার পর সংস্থাটি নিজেদের বাড়ি করে চলে আসে ৬বি সানি পার্কে।

এখন এরা ভারতে স্পেনের দূতাবাসের হয়ে এল ফেস্টিভ্যাল দে লা গুইতাররা দে কর্দোবা নামে একটি ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করছে। একঘন্টার একটি ধ্রুপদি গিটারের অনুষ্ঠান দিয়ে উদ্বোধনের পর প্রতিযোগিতা। পুরস্কারের মধ্যে আছে ১০,০০০ টাকা অর্থমূল্যের সঙ্গে দূতাবাসের খরচে দুদিনের দিল্লি ট্যুর।

এই প্রতিযোগীদের মধ্যেই একজন তাহলে এবারের ভিক্টিম। কিন্তু কে, সেটা এতজনের মধ্যে থেকে বার করা সত্যিই কঠিন। আর কীভাবে ঘটবে ঘটনাটা সেটাও অস্পষ্ট। তার মাথায় আসছিল না কীভাবে এর মোকাবিলা করবে; যদিও অন্যান্যবার সন্দেহের দোলায় দুললেও এবার একেবারে নিশ্চিত যে ঘটনাটা ঘটছেই। তার অসহায় লাগছে, একটা খুন হবে জেনেও জানে না কীভাবে সেটা ঠেকানো সম্ভব। একটা কেবল পথ ছিল পুলিসকে জানানো। তারাই পারত কনসার্ট বন্ধ করতে। কিন্তু কোনো প্রমাণ বাদে সে তাদের কাছে যায় কী করে!

সে অন-লাইনে কনসার্টে একটি সিট বুক করে ফেলল। শারীরিকভাবে ওখানে উপস্থিত থাকলে হয়ত কোনো যৌক্তিক ক্লু মিললেও মিলতে পারে।

***

অটপ্সি রিপোর্ট বেরোতেই সুমিত হতবাক। অচিরার মৃত্যু হয়েছে হার্ট ও লাং প্রবলেম থেকে লিভার ফেলিওরের পর মাল্টি-অর্গান ফেলিওরে। বুটেন টক্সিসিটির জন্য।

তার অনুরোধে পুলিস তাকেও রিপোর্টের একটা জেরক্স কপি দিয়েছে। সেই রিপোর্টে ডাক্তারি পরিভাষার জঙ্গল সাফ করতে না পারায় সে এক প্যাথোলজিস্ট বন্ধুর দ্বারস্থ হয়েছিল। ডাঃ বিশ্বাস গোটা রিপোর্টটা মন দিয়ে পড়লেন। সেখানে পরিষ্কার বলা আছে **শ্বাসের সঙ্গে বুটেন নেওয়ায় সেরিব্রাল ইডিমা, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, পালমোনারি ইডিমা, হেপাটিক ফেলিওরের জন্য মৃত্যু।**

'বুটেনে মরে কী করে?' সুমিত বুঝতে পারছে না।

'ও কি স্মোক করত?'

'হ্যাঁ। কিন্তু বেশি না। হয়ত খুব খাটনি গেল, একটু বসার সুযোগ পেয়েছে, তখন হয়ত... খুব যে নেশা ছিল তা নয়।'

'সিগারেটের জন্য নয়। বুটেন গ্যাস লাইটারে ব্যবহার হয়।'

'সে তো সবাই ইউজ করে। তাতে কি কেউ মারা যায়?'

'বলতে পারছি না। বুটেন থেকে বমি হয়, ল্যারিঙ্গোস্প্যাজম শুরু হয়, ফ্রেওন ইলেভেন আর ফ্রেওন টুয়েলভের ফ্লুরোঅ্যালকেন প্রপেল্যান্টস থেকে কার্ডিয়াক ডিসরিথমিয়া হয়। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলে স্নিফিং ডেথ সিন্ড্রোম।'

'কিন্তু ও তো আমার বাড়িতে সিগারেট খায়নি।'

'হয়ত আপনারা চলে আসার পরে---'

'মনে হয় না। ঘরে ঢুকে আমরা কোনো গন্ধ পাইনি।'

'আমার মনে হয় পুলিসের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া ভালো।'

সুমিত পারছিল না। তাকে তো অচিরার বাবা-মাকে কিছু বলতে হবে, নীলকেও বলতে হবে। কেউই অবশ্য জানে না এটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নয়, ভেবেচিন্তে খুন। প্রশ্নটা বাতাসে ভাসছে -- বব ডিলান নয়, বরং তার কর্টিকাল গ্রে ম্যাটারই প্রশ্নটা করছে। এরকম মৃত্যুর কথা আগে কক্ষনো কেউ শোনেনি। খুনের অত্যন্ত চতুর পদ্ধতিটা তাকে চমকে দিয়েছে। কেবল তো অচিরার আত্মীয়রাই নয়, তার নিজেরও স্বস্তি নেই যতক্ষণ না লোকটাকে হাতে পাচ্ছে।

নীলের হাতে দিল রিপোর্টটা।

'অদ্ভুত!' নীলও চমকাল।

'যতক্ষণ না পুলিসের তদন্ত শেষ হচ্ছে ততক্ষণ কী বলি বলো!' সুমিত ভালোই জানে পুলিস কোনো উত্তরে পৌঁছতেই পারবে না, তবুও বলল।

'ততদিন তো এখানে বসে থাকতে পারব না! আমায় কাজের ওখানে ফিরতেই হবে!' নীল দোলাচলে ভুগছিল।

হাঁফ ছাড়ল সুমিত। যাক, তদন্ত যদ্দিন চলবে তাকে বিচিত্র সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হবে না। একটু সময় চাইছিল খুনের মোটিভ আর মোডাস অপারেন্ডি নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে।

'ওর বাবা-মাকে কী বলি বলো তো! তুমিই বরং ওদের একটু সান্ত্বনা দিতে পারো!'

অচিরা নেই, নীলের মাথাও কাজ করছে না। তার দীর্ঘদিনের লালিত সুখের নীড়ের স্বপ্ন চুরমার। সে এখানেই বিষয়টায় ইতি টানতে চাইছিল। অতীত নিয়ে হাহাকার করার চেয়ে এখন নিজের কেরিয়ার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। বাইরে পলাশের লাল ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছিল জীবনটা কোনদিকে তাকে নিয়ে চলেছে। এই বিপুল পরিবর্তমান বিশ্বে তার ক্ষুদ্র স্বপ্নের জায়গা কোথায়!

কিন্তু সুমিতের তা নয়। তাকে তার নিজের বিবেকের কাছে অনেক প্রশ্নের জবাবই দিতে হবে। যতক্ষণ না সেই উত্তর পাচ্ছে নিজের কাছ থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

***

বিড়লা সভাঘরে বসে সুমিত রয়্যাল কনজারভেটরি অফ মিউজিক অফ মাদ্রিদের তরফে আসা মিগুয়েল ত্রাপাগা-র একঘন্টার একক পরিবেশন শুনল। ত্রাপাগার জন্ম একটি স্প্যানিশ পরিবারে। তারপর প্রতিযোগীদের অনুষ্ঠান।

দেখল প্রত্যেক প্রতিযোগী মহা উৎসাহে ধ্রুপদি গিটা বাজানোর প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। ঘোষক প্রত্যেক প্রতিযোগীর নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্টেজে আসার সময় তাদের পরিচয় দিচ্ছিলেন। সুমিত উদ্বেগের সঙ্গে সবাইকে লক্ষ করছিল, যদি কোথাও কোনো ক্লু পাওয়া যায়। প্রথম পাঁচজনের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। কোথাও কোনো অসুবিধে হল না। সুমিত ভাবতে শুরু করেছিল এবার হয়ত হুমকি কাজ করল না। কিন্তু শেষ অব্দি খাড়া হয়ে বসে থাকা বাদে করারও কিচ্ছু নেই। ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিক্যাল যেহেতু তার বিষয় নয়, ফলে বসে থাকাও বিরক্তিকর। কিন্তু তার কী-ই বা করার আছে! প্রাণ বেরিয়ে গেলেও যেভাবেই হোক তাকে শেষ অব্দি বসে থাকতেই হবে।

গিটারের কর্ডে আঙুল ছুঁইয়েই রোনাল্ডো নামে এক প্রতিযোগী ঢলে পড়তেই সে সটান উঠে বসল। হার্টবিট বেড়ে গেছে বুঝতেই পারছে। অসুস্থতা, না মৃত্যু? কনসার্ট চলাকালীন মৃত্যুর উদাহরণ একেবারে নেই এমন নয়। মেডিক্যাল সমস্যা থাকতে পারে, মনের ওপর চাপ হতে পারে, শরীরের ওপর চাপ হতে পারে - নানা কারণেই এমনটা সম্ভব। তার স্বামী রোনাল্ডোকে গিটারের কর্ডে আঙুল ছুঁইয়েই অমন ঢলে পড়তে দেখে আইরিন চমকে গেল। প্রথমটায় ভাবল বুঝি অসুস্থ। গত এক মাস নাওয়া খাওয়া ছেড়ে কেবল প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস করে গেলে যা হবার তা-ই হয়েছে। বেশি চাপ নিতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চটপট স্টেজের দিকে দৌড় দিল সে। স্বভাবতই রোনাল্ডোর জন্যে প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। অর্গানাইজাররা ওকে ঘিরে রেখেছে। একজন ডাক্তারকেও ডেকে আনা হল। তিনিই ঘোষণা করলেন রোনাল্ডো মারা গেছে। আইরিন নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝতেই পারছে না কোত্থেকে কী হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মৃতের কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার বলল, 'ইলেক্ট্রোকিউশনে মৃত্যু, বাকিটা পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বলবে।'

ফের আরেকজন শিকার। এর মৃত্যুর কারণ যা-ই হোক সুমিত জানে এ-ও আরেকটি খুন। কলার লোকটি তার কথা রেখেছে। বডি সরানো হচ্ছিল বলে ও সাইড উইঙের দিকে সরে এল। যদি দেখে কিছু বোঝা যায়।

স্প্যানিশ গিটারের তার থেকে ইলেক্ট্রোকিউশন! সুমিতের মাথায় ঢুকছে না খুনি কীভাবে এই প্রফেশনাল ঘেরাটোপের মধ্যেও তার কার্যসিদ্ধি করে গেল। চারদিকে তাকিয়ে ঘুরেফিরে বেড়ানো লোকজনের মধ্যে কোনো মহিলাকে দেখা যায় কিনা খুঁজছিল। নাঃ, নেই। ভাইব্রেশনে রাখা মোবাইলটা কেঁপে উঠতেই বোঝা গেল মেসেজ ঢুকেছে। বলা হয়েছেঃ **শেষ অব্দি এটাও হল। অস্ত্রটা খোঁজো। তুমি ছাড়া কেউ পারবে না।**

সুমিত হতচকিত। পরিসংখ্যান নিয়ে তার কাজ, বাজনা সম্পর্কে তার আর কী জ্ঞান! তার ওপর এইসব যন্ত্রপাতিতে কীভাবে বিদ্যুৎকে কাজে লাগানো হয় তা-ও ভালো জানে না। এরকম কোনো ওয়েস্টার্ন মিউজিক কনসার্টে এই প্রথম। তা-ও দেশি ধ্রুপদি সঙ্গীত সম্পর্কে টুকটাক জানা আছে, কারণ স্ত্রী আয়ুষী এই বিষয়ে কেবল আগ্রহীই নয়, এক সময়ে কিছুদিন সরোদও শিখেছিল। অধিকাংশ দেশি বাদ্যযন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার হয় না। কিন্তু এ তো পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সংগীত!

সবাই যখন ব্যস্ত তার মন তখন কাজ করে চলছে। নিঃসন্দেহে গিটারটা একটা অ্যামপ্লিফায়ারের সঙ্গে যুক্ত যেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ সক্রিয় ছিল। সেই সারকিটেই নিশ্চয় কারসাজিটা করা হয়েছে। কিন্তু কোথায়? গিটার থেকে অ্যামপ্লিফায়ার বা অ্যামপ্লিফায়ার থেকে মেন স্যুইচ-এর মধ্যেই কোথাও, কোনো জংশন পয়েন্টেই হওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে প্রশ্ন, আরো তো অনেক প্রতিযোগী ছিল, কিন্তু কারো কিছু না হয়ে একজনেরই হল কেন? তাহলে কি এই রোনাল্ডোই খুনির লক্ষ্য ছিল, নাকি আর কেউ? তা যদি হয় তাহলে সবাইকে ছেড়ে রোনাল্ডোর ক্ষেত্রেই এটা হয় কী করে! হতে পারে রোনাল্ডোর সেট-আপটা অন্যদের থেকে আলাদা। কিন্তু তা-ই বা হয় কী করে!

চারদিকটা যখন মোটামুটি শান্ত হয়ে এসেছে, সে গিয়ে অর্গ্যানাইজারদের একজনকে ধরল, 'আচ্ছা, উনি কি নিজের যন্ত্রই বাজাচ্ছিলেন?'

'আপনি?'

'প্রফেসর সুমিত দাস। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট থেকে...'

'জানতে চাইছেন কেন?'

'রিসার্চের জন্যে। ব্যক্তিগত আর সংগঠন থেকে দেওয়া ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে পরিসংখ্যানগতভাবে দেখলে...' সুমিত গম্ভীরভাবে শুরু করে।

অর্গ্যানাইজারদের লোকটি চোখ সরু করে ওকে বুঝে নিতে চাইল। পাগল! 'উনি বলেছিলেন উনি নিজের যন্ত্রই বাজাবেন।' রোনাল্ডোকে আলাদা করে দিয়ে চটপট হাওয়া হয়ে গেল।

পাওয়া গেছে!

তাহলে পুরো সেটআপই রোনাল্ডোর। গিটার, অ্যামপ্লিফায়ার শুদ্ধু গোটা সিস্টেমটাই ওর নিজের। কেউ নিশ্চয় জানত ও নিজের সেট নিয়েই বাজাবে। খুব কাছের কেউ না হলে আর কে হবে! মিউজিক্যাল কিটটা দেখতে হচ্ছে। লোকজন জিনিসপত্র বার করছে দেখে সুমিত সাইড উইঙের ধারটায় সরে এল। এখানে রোনাল্ডোর মিউজিক্যাল কিটটা রাখা।

যেহেতু ইলেক্ট্রিক সার্কিটের কাজ বিষয়ে জানে না, এক পরিচিত ইলেক্ট্রিসিয়ানকে ফোন করে জানতে চাইল,'স্টেজে স্প্যানিশ গিটার বাজাতে গিয়ে কারো পক্ষে ইলেক্ট্রিফায়েড হয়ে মারা যাওয়া সম্ভব কীভাবে?'

ইলেক্ট্রিসিয়ান লক্ষ্মণ শুনে বলল,'একটু খুলে বলুন।'

ছোট করে পুরো ঘটনাটা বলল সুমিত।

'বাকিদের অবস্থা?'

'কারো কিছু হয়নি। ওর জিনিসপত্র এখানে রাখা।'

'ওর মধ্যেই প্রবলেম। সমস্যা গিটারে না। হয় অ্যামপ্লিফায়ারে, নয়ত পাওয়ার সাপ্লাই আসছে যে কানেকশন থেকে, সেখানে। খুব সম্ভব অ্যামপ্লিফায়ারের ডিফেক্টিভ সার্কিট থেকেই ঘটনা ঘটেছে। সাউন্ডে কোনো ত্রুটি ছিল কি?'

‘কোনো কিছু তো বোঝা যায়নি।’

‘তাহলে পাওয়ারেই সমস্যা। বাজনা চলাকালীন কি খোঁচ ছিল কিছু? মানে, কখনো থেমে যাওয়া বা ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন কোনো রকম?’

‘না।’

‘তাহলে যে প্লাগ থেকে অ্যামপ্লিফায়ারে পাওয়ার সাপ্লাই সেখানেই সমস্যা। থ্রি পিন সকেটের আর্থিং ডিট্যাচড হয়েছে। লাইভ সার্কিট বসানো ছিল প্লাগ অ্যামপ্লিফায়ার আর গিটারের মধ্যেই। সেটা কাজ করতে চেষ্টা করলেও ইলেক্ট্রিসিটি পাঠাবার যে জিনিস সেটাই কাজে বাধা দিয়েছে। ’

‘ধন্যবাদ।’ সুমিত ফোন কাটল।

তাহলে প্লাগেই। ভেতরটা দেখতে চাইলেও খোলার জন্যে স্ক্রু ড্রাইভার নেই। তা ছাড়া এসব করতে গেলে কারো চোখে পড়লেই সন্দেহ হবে। আর তাহলেই তাকে দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী করা হবে। অসহায়ের মতো ও অডিয়েন্সে ফেরত এল। কনসার্টের পরের অংশ শেষের পর ও একটা রিপ্লাই টেক্সট পাঠাল, ‘অ্যামপ্লিফায়ারের প্লাগেই কারসাজিটা।’

‘একদম।’ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর।

***

বিকাশ তিতিবিরিক্ত। তারই এলাকায় আবার একটা মৃত্যু!!!

সোহিনীকে অচেনা লোকটার এসএমএসের পর ও তদন্তে একটু বেশি পাত্তা দিচ্ছিল। রোনাল্ডোর মৃত্যুর ব্যাপারটা তার ওপর বাড়তি চাপ হয়ে গেল। খুনের কেস নিয়ে এতটাই চিন্তায় যে বেআইনি চক্কর ধরে দু’পয়সা ঘরে আনার দিকেও নজরই দিতে পারছে না। সোহিনীর সঙ্গে তার গোপন অভিসারের ব্যাপারটা এর মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলেছে। ঝামেলার মধ্যে আইরিনকে প্রশ্ন করার কথা ভুলেই গিয়েছিল। রোনাল্ডো যে আইরিনের স্বামী এটা জেনে আন্দাজ করতে পারছিল কী পরিমাণ ফালতু কথা তাকে ওপরওয়ালার কাছ থেকে শুনতে হবে। যাক গে, নিজের ঝামেলা শিকেয় তুলে আগে এই লাফড়া থেকে বেরোনো দরকার। এতে ফেঁসে থাকলে শেষ পর্যন্ত হয়ত ট্রান্সফারের কাগজ অব্দি ধরিয়ে দেওয়া হতে পারে।

পিএম রিপোর্ট পাবার আগেই আইরিনকে ধরতে বেরিয়ে পড়ল ওর সানি পার্কের অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশে। দামি ফার্নিচারে সাজানো ঝকঝকে ফ্ল্যাটটায় পা রাখলেই টের পাওয়া যায় আইরিনরা যথেষ্ট উচ্চ মধ্যবিত্ত স্তরের লোক। একদিকের দেওয়ালে দুজনের একটা ফটো ঝোলানো। আইরিনকে দেখেই তাকে বেশ ভালো নম্বর দিয়ে ফেলল। সোহিনী যদি ৭ ++ হয় তাহলে এ মেয়ে ৬+-এর নীচে নয়। শরীরের খাঁজগুলোকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে চোখে পড়ার মতো করে রেখেছে। সাড়ে পাঁচ ফিট হাইটের স্লিম মেয়েটির মুখচোখ রীতিমতো ফটোজেনিক। ঘাড় অব্দি চুল, মাঝারি বুক, কোমর প্রায় মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। আইরিন ওকে বসাল লাউঞ্জে।

‘কদ্দিন বিয়ে হয়েছে?’

‘পাঁচ বছর।’

‘সন্তান?’

‘না।’

জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল বাচ্চাকাচ্চা কি তারা ইচ্ছে করেই করেনি না কোনো মেডিক্যাল সমস্যা ছিল; কিন্তু করল না। প্রাইভেসিতে বেশি নাক গলানো মনে করতে পারে। ফালতু প্রাইভেসিতে নাক গলিয়ে লাভ? রোনাল্ডো মারা গেছে ইলেক্ট্রোকিউশনের জন্যে। অবিশ্যি এখনো বোঝা যাচ্ছে না অ্যাক্সিডেন্ট না খুন, তবু...

‘আপনার সঙ্গে ওঁর শেষ কথা হয়েছিল...’

‘একসঙ্গেই ছিলাম, তারপর ওকে স্টেজে ডাকা হল। আমি অডিয়েন্সে ছিলাম।’

‘স্প্যানিশ গিটারই কি ওঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল?’

‘পুরো তেমন হয়ত বলা যাবে না, তবে ছোট থেকে এটাই ওর হবি ছিল। সবটা সময় দিত ওরই পেছনে। বিশ্বাসই করতে পারছি না এরকম কিছু হতে পারে !’

‘আপনি তো প্রিয়াঙ্কারও বন্ধু ছিলেন!’

‘ঠিক বন্ধু বলতে যা বোঝায় তা হয়ত নয়। আমরা সবাই একই কিটিপ্যাকে থাকতাম!’

‘প্রথমে প্রিয়াঙ্কা তারপর রোনাল্ডো। আপনার আশেপাশে পরপর এরকম দুটো...’

‘সেটা আপনাদের ব্যাপার। আপনারা... রোনাল্ডোর ঘটনাটা খুন হলে যত তাড়াতাড়ি হোক অপরাধী ধরা পড়ুক চাইব বুঝতেই পারছেন।’ তার গলায় শোক।

‘আপনাদের গ্রুপে সব মৃত্যুই যে খুন হবে তা নিশ্চয় না। আচমকা কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যেতেই পারে। কিন্তু দুটোই হয়েছে আপনাদের দলের মধ্যে--- এতে সন্দেহ হতেই পারে। জানা গেছে প্রিয়াঙ্কার বড়বাজারের এক কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। তিনিও মারা গেছেন। সবগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকলেও থাকতেই পারে।’

‘তাই! এটা তো কানে আসেনি...’ আইরিন প্রিয়াঙ্কার অবৈধ সম্পর্কের কথাটা শুনে চমকেছে। তারা ঘনিষ্ঠ ছিল না। ওর অনুপস্থিতিতে এসব নিয়ে কারো সঙ্গে কথাও হয়নি।

‘উনি কি ওঁর মিউজিক সিস্টেমের সার্কিট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন?’

‘অফ কোর্স। এতদিন ধরে ওই নিয়েই পড়ে আছে , আর ওটা চিনবে না? এবং যেহেতু এটা একটা কন্টেস্ট, ফলে শো শুরুর আগে ডাবল চেক করে তবেই বসেছিল।’

‘তাহলে কীভাবে হল?’

‘জানতে নিশ্চয় পারব আশা করি। প্লিজ আপনারা খুঁজে বার করুন...’

‘ওঁর পেশা বলতে...’

‘এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের ব্যবসা ছিল।’ আইরিন ঠান্ডা গলায় বলল।

‘একটু স্পেসিফিক্যালি যদি বলেন...’

‘সারা পৃথিবীতে মিউজিক্যাল গুডস এক্সপোর্ট করত।’

‘তাহলে সার্কিট্রির বিষয়টা ওঁর ভালোই জানার কথা।’

‘নিঃসন্দেহে। বিশেষ করে সেই জন্যেই ও ইলেক্ট্রোকিউশনে মারা যাবে এটা নেওয়া যাচ্ছে না।’

‘অটপ্সিতে কী বেরোয় দেখা যাক। তখন পরিষ্কার ছবিটা পাওয়া যাবে। দলের কাউকে এই বিষয়ে সন্দেহ হয়?’

‘কোনো কারণই নেই। যখন ফ্রি থাকত তখন তো ওদের সঙ্গেই অনেকটা সময় থাকত। দেখুন, আমরা প্রত্যেকেই যে যার নিজের জগতে বাস করি! এখানে আলাদা করে স্বার্থের সংঘাত হয় কী করে?’

বিকাশ উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে যাবার আগে আচমকা জিগ্যেস করল, ‘ওঁর স্প্যানিশ গিটারটা কোথায়?’

‘পাশের ঘরে। দেখুন না... প্লিজ...’ আইরিন পাশের ঘরটা দেখাল, ‘ওর মিউজিক রুম।’

ঘরটা নানানরকম বাজনায় ভরা। ইলেক্ট্রিক গিটার, অ্যাকোয়াস্টিক গিটার, ভায়োলিন, চেলো, ডাবল বাস, ইলেক্ট্রিক বাস, কী বোর্ড, ড্রাম কী নেই! ঘরের একদিকে কিছু ভারতীয় সঙ্গীত যন্ত্রও আছে। সেতার, সরোদ, তবলা, সন্তুর, হারমোনিয়াম কিচ্ছু বাদ নেই। একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা ডেস্ক টপ কম্পিউটার বলে দেয় এটা যার ঘর সে নিঃসন্দেহে একজন রীতিমতো সিরিয়াস মিউজিক প্রেমী।

‘উনি বুঝি ভারতীয় যন্ত্রও বাজাতেন?’

‘না। আসলে ওকে যারা অ্যাসিস্ট করত তাদের জন্যে সবই রাখতে হত।’

‘ভারতীয়?’

‘অনেক সময় তো ফিউসন মিউজিকও বাজাতে হত। ফলে সবই রাখতে হত, যাতে দরকারের সময়ে কাউকে এসব ফালতু ক্যারি না করতে হয়। রেকর্ড করে কম্পিউটারে হারমোনাইজ করে নিত।’

‘ওঁর সঙ্গে যাঁরা থাকতেন তাঁদের নামের একটা তালিকা যদি পাওয়া যেত! মানে নিয়মিত যাঁরা থাকতেন...’

‘সিওর। দিচ্ছি। আসুন।’ আইরিন লাউঞ্জে ফেরত এল, ‘মোবাইলে তো নেই। এক মিনিট, কম্পিউটার থেকে দিয়ে দিচ্ছি...’ ও বেডরুমে ভ্যানিশ হতেই বিকাশ আবার আকাশপাতাল চিন্তায় ডুবে গেল। কিছু কি ভুলে যাচ্ছে? কোনো প্রশ্ন?

আইরিন একটা প্রিন্ট আউট নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলল,‘স্যরি, বসিয়ে রাখতে হল; মনে হয় এই দিয়েই আপনাদের কাজ হয়ে যাবে...’

‘ওঁর সঙ্গীদের কাউকে সন্দেহ করছেন কি?’

‘প্রশ্নই ওঠে না। তবে ওর ব্যবসাপত্রের ব্যাপারে আমি নাক গলাতাম না। চিনতামও না কাউকে। দরকার হলে আপনাকে ওদের কোম্পানি মর্গ্যান ডি’স্যুজা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।’

‘মর্গ্যান কে?’

‘ওঁকে কখনও দেখিনি। শুনেছি উনি একজন ব্রিটিশ যিনি কোম্পানিটা বানিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে ফেরার আগে উনি রোনাল্ডোকে এটা বেচে দেন। সারা দুনিয়ায় তার মধ্যেই যেহেতু এই নামটা পরিচিত হয়ে গেছে, ফলে ও ঠিক করে নাম আর বদলাবে না। স্রেফ মার্কেটিঙের স্ট্র্যাটেজি হিসেবে।’

‘ও, ভুলেই যাচ্ছিলাম, ওঁর মোবাইলটা কোথায়? অনেক ভাইটাল ক্লু থাকতেই পারে।’

‘জানি না কোথায় রেখেছি। একটু দেখতে দিন, প্লিজ। আসলে ওর মৃত্যুটা এমন একটা ধাক্কা! সব একেবারে এলোমেলো করে দিয়েছে...’ বলতে বলতেই আইরিন আবার বেডরুমে ঢুকল। খানিক বাদেই ফিরে এল, ‘কী ভাগ্য, ওর বেডসাইড টেবলটার ওপরেই ছিল।’ মোবাইলটা এগিয়ে দিল।

‘ধন্যবাদ।’

জিপে বসেই বিকাশ ঠিক করে ফেলল মন থেকে সোহিনীকে মুছে ফেলে এই গ্রুপটকে নিয়েই পড়ে থাকবে। মাথার মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছিল **‘বিকাশ তোমার কোলে দোলে। প্রিয়াঙ্কা খতম দুজনের গোলে’**। প্রিয়াঙ্কার কেসটা যতক্ষণ না সলভ হচ্ছে কেবল সোহিনীর সঙ্গে গলাগলির সূত্রেই তারও ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে ষোলো আনা।

***

সুমিত একটা মেসেজ পেলঃ **পরের জন তোমার এলাকায়।** স্যাটেলাইট টাউনশিপ হিসেবে সল্টলেক বিশাল এলাকা। ফলে ‘তোমার এলাকা’ বললে কিছুই বোঝায় না। সে হাজার ভেবেও বার করতে পারছিল না কী করে এই থ্রেটের মোকাবিলা করা যায়। কোনো সামান্য ক্লুও যদি না মেলে তাহলে কী করে কিছু করবে? অথচ যা হবার হবেই এটা বুঝতে পারায় অসহায়ও লাগছিল। আরেকটা মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে জেনেও... যদি শুধুমাত্র আন্দাজটুকুও করা যেত মোটিভটা কী, বা প্যাটার্নটা কী হতে পারে তাহলেও হয়ত কিছু করা যেত! এতদিন ধরে যতগুলো খুন হয়েছে তার একটা মহিলা হলে পরেরটা পুরুষ। যদি এই মডেলই চলে তাহলে এবার মৃত্যু হওয়া উচিত কোনো মহিলার। আর এই ধারা বজায় থাকলে তারপরে পালা হবে কোনো পুরুষের।

প্রিয়াঙ্কার মৃত্যুর পর তড়িঘড়ি বাঙ্গালোর থেকে ফিরে এসে থেকে অর্চনা তার সল্টলেক ই ই ব্লকের ফ্ল্যাটটা নিয়ে কী করবে ভেবে ওঠার সময়টাই পাচ্ছিল না। যোগেশের দরকারের সময়ে তার পাশে থাকতে

চাওয়ার জন্যেই তাকে এখন সল্ট লেক আর গুরুসদয় রোডের মধ্যে পাক খেতে হচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পর তার এমনকি দিনের রুটিনটুকু নিয়েও মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না। ফ্ল্যাটটা তাই রীতিমতো অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। এখানে কাপড়-চোপড় পড়ে আছে তো কিচেনে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে এঁটো বাসন, সর্বত্র ধুলো, টয়লেটে ভ্যাপসা গন্ধে পা রাখা যায় না।

অর্চনা সকালে ঠিক করেছিল হাতে সময় নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটটাকে পদে আনবে। কাপড়-চোপড়গুলোকে ওয়াশিং মেশিনে ঢোকাল, ডিশগুলোকে ধুয়ে ফেলল, ক্লোসেটের কাপড়গুলোকেও গুছিয়ে ফেলল, তারপর নজর দিল টয়লেটের দিকে। প্রথমে হারপিক দিয়ে সাফ করার পর বাকি দিকগুলোয় নজর দিল।

এর মধ্যেই মোবাইলটা বাজল। কাজ করতে করতেই সে ফোন ধরল,'ফ্ল্যাটটাকে একটু পদে আনতে চেষ্টা করছি। যা হয়ে আছে...'

'যোগেশের আজ অফিসে যেতে দেরি হবে।'অচেনা মহিলার গলায় চমকাল।

'ফাইন। ও তো ফোন করল না!' সে জিগ্যেস করল।

'ও এখন আমার সঙ্গে বাঁধা! আশা করি ছবিটা পরিষ্কার!' ফোনের ওপারে খিকখিকে একটা হাসি।

অর্চনার মাথা গুলিয়ে গেল। যোগেশ মানুষটা খোলামেলা। প্রিয়াঙ্কা ছিল তার জীবনে স্রেফ শো-পিস মাত্র। সে যখন যোগেশের সঙ্গে বাঙ্গালোরে তখনই প্রিয়াঙ্কার মৃত্যুর খবরটা আসে। যোগেশ মনেও করতে পারে না প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে তার কখনো কোনো প্রেমের সম্পর্ক হয়েছিল কিনা। অর্চনাও চায়নি এরকম কিছু ঘটুক। খেপে কাঁই হয়ে ফোনটা রাখতে যাবে এমন সময় উলটো দিকের মহিলা বলল, 'খেপে যাওয়ার কিছু নেই। প্রত্যেকেরই নিজের শেয়ার দরকার!'

শেয়ারের বদলে যোগেশের বদমাইশিতেই তার মাথা চনচন করছিল। খেপে গেল, 'ফাইন। জানলাম। ওকে বোলো, আমার এই ঝামেলার পর আমি গিয়ে ওর অফিসের গুষ্টির তুষ্টি করে আসব...' মাথা জ্বলে যাচ্ছিল। স্নান করলে হয়ত একটু মাথা ঠান্ডা হবে। প্রায় ফুটতে ফুটতেই কাফতানটা ছেড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর উদোম হয়েই টয়লেটের দিকে। এখনো পুরো কাজ শেষ হয়নি। টয়লেটে আরো একটু ঘষাঘষি বাকি। হাত লাগাল। কী করছে না ভেবেই হাতের কাছের বোতলটা টেনে নিয়ে হারপিকের ওপরেই ক্লোরোক্স ঢালল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট একটা গন্ধে তার সারা শরীর ঝনঝন করে উঠল। মনে হল দম আটকে আসছে। খকখক করে কাশতে কাশতে চেষ্টা করল দরজাটা খোলার। পারল না। খুব অসুস্থ লাগছে, মাথা ঝিমঝিম করছে, দুর্বল লাগছে... কখন যেন টয়লেটের মেঝেতেই গড়িয়ে পড়ল।

যতক্ষণ না বাইরে থেকে সাড়া না পেয়ে পুলিসে খবর গেল ততক্ষণ অব্দি কোনো তোলপাড় হল না। পুলিস এসে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে তার মৃতদেহ যখন বার করল তখন প্রথমটায় ঝাঁঝালো দুর্গন্ধে তাদেরও যায় যায় অবস্থা। বডিটা পোস্ট মর্টেমে পাঠাল।

***

তদন্তে এসে বিধাননগর থানার ও সি শুভঙ্কর জানতে পারল মেয়েটি যোগেশ জয়সোয়ালের পারসোনাল সেক্রেটারি। গুজব, অফিস আওয়ারের পর তার সঙ্গিনী। তদন্তের প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে বডিটাকে অটপ্সিতে পাঠিয়ে দিল। ঠিক করল শেকসপিয়র সরণিতে যোগেশের অফিসে ঢুঁ মারবে।

'মিস অর্চনা ভানিয়ার আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়েছেন নিশ্চয়।'

'বিশ্বাসই করতে পারছি না। শক তো বটেই মারাত্মক একটা...'

'উনি তো এখানেই কাজ করতেন?' শুভঙ্করের শ্যেনদৃষ্টি যোগেশকে ছুঁয়ে স্থির।

'আমার পার্সোনাল সেক্রেটারি। কালও ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

‘কোথায়?’ওর রিঅ্যাকশন দেখার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে জিগ্যেস করল শুভঙ্কর। অনেক সময় মুখ দেখেও অনেক কিছু বোঝা যায়।

‘কোথায় আবার, এই অফিসেই।’

‘কেমন ছিলেন ভদ্রমহিলা? মানে, কাজকর্ম...’

‘অভিযোগ করার মতো কিছু দেখিনি। নিজের কাজ খুব ভালো বুঝত।’

‘অটপ্সির আগে কিছু বলা যাবে না, কী হয়েছিল, স্যুইসাইড না খুন। রিসেন্ট কোনো অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়েছিল?’

‘না। সেরকম কিছু দেখিনি!’

‘অফিসের পর বাইরে কখনো আপনাদের দেখা হয়নি?’ গসিপটা যাচাই করতে শুভঙ্কর ইচ্ছে করেই জানতে চাইল।

‘মাঝেমধ্যে নিশ্চয় বাইরে গেছি, ডিনার-টিনারে... যেহেতু আমার সেক্রেটারি ছিল, ফলে...’

‘বাড়িতে ড্রপ করা?’

‘মনে পড়ছে না। ওর তো নিজেরই গাড়ি ছিল। ড্রাইভ করেই ফিরত। থাকতও দূরে। তাই সাধারণত ড্রপ করার প্রশ্ন ছিল না। শহরের একেবারে অন্যদিকে তো...’

‘বাইরে ট্রিপ?’

‘মনে পড়ে না। কখনো কখনো দেশের মধ্যে কোথাও মিটিং-এ সঙ্গে গেছে। বিজনেস ডিটেলসগুলো যেহেতু জানত, ফলে...’

‘কখনো বাইরে এক ঘরে থেকেছেন?’

‘কী জানতে চাইছেন বুঝতে পারছি না। আমি বিবাহিত। রিসেন্টলি আমার স্ত্রী মারা গেছেন। এখনো সেই ধাক্কাই সামলাতে পারিনি। এর মধ্যে এইসব... ফালতু প্রশ্ন করে হ্যারাস করছেন! ওর মৃত্যুতে নিশ্চয় দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু কিছু না জেনে এরকম ফলস অ্যাকিউজেশন অন্যায়।’

‘আপনার স্ত্রীর মৃত্যু হল কীভাবে?’

‘জানলে তো বলব! রহস্যময় ব্যাপার। বালিগঞ্জ থানার ওসি বিকাশ চৌবে কেসটা দেখছেন। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমার থেকে উনিই ভালো বলতে পারবেন।’

এই তো খবর! স্ত্রী-মহিলার রহস্যময় মৃত্যুর খবর শুভঙ্করের জানা ছিল না। অনেক সময় গসিপ ছড়ায় ঘটনার থেকে বেশি। তদন্তে অবিশ্যি এইসব খবরের থেকে তথ্যেরই বেশি প্রয়োজন। চৌবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। সম্ভবত অর্চনার মৃত্যুর সঙ্গে যোগেশের কোনো সম্পর্ক নেই। এই মহিলার কিছু হলে তো যোগেশের দিকেই আগে নজর পড়বে। অবিবাহিত অর্চনা একলাই থাকত সল্টলেকের ফ্ল্যাটে। ওর কাছের যারা যেমন বন্ধু, সহযোগী তাদের নেড়েচেড়ে দেখতে হবে। যদিও অর্চনার আইফোনটা আছে, ওটা বন্ধ বলে ওর কললিস্ট, টেক্সট ডিটেলস কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো সেরকম টেকস্যাভি লোক না পেলে সরাসরি অ্যাপলের সাহায্যেই ওই লক ক্র্যাক করতে হবে।

‘আপনার স্ত্রীর নাম?’

‘প্রিয়াঙ্কা জয়সোয়াল।’

স্যাটেলাইট টাউনশিপে রহস্যময় মৃত্যু। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙ্গালোর। আজকালকার এইসব নিওআর্বান মানুষজনের মধ্যে যাদের একটু বিচিত্র যোগাযোগ আছে সবই প্রধানত নিজেদের সীমার বাইরে। সবাই অতি চতুর। অনেক সময় এদের বুঝে ওঠাই কঠিন। অর্চনার কেসে এই সবকিছুর হদিশ মিলতে পারে ওর মোবাইল থেকে। বাকি যোগাযোগগুলোর হদিশও পেতে হবে।

মহিলার মোবাইল ঘাঁটতে গিয়ে এমন কিছুর হদিশ পেয়ে যাবে যার জন্যে মোটেই তৈরি ছিল না।

***

আবারও অমৃতাকে প্রশ্নে জর্জরিত করে তেমন কোনো লাভ হল না। শহরের যে স্তরের লোকগুলো এই অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে তাদের মহলে ও রীতিমতো বেমানান। বিকাশ বেশ বুঝতে পারছিল এদের মধ্যে সম্পর্কটা নেহাতই অবসর বিনোদনের। প্রথমে ভেবেছিল হিন্দুস্তানি রাগ সঙ্গীতেই আসক্তি। প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে সেদিন বিকেলে এই মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তার পর পরিষ্কার বুঝতে পারছিল এরা কেউ মনেপ্রাণে ক্ল্যাসিকালের ফ্যানও নয়।

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করা হয়নি। গ্রুপের অন্য মহিলাদের সঙ্গে আপনার আলাপ কীভাবে?' থানায় মুখোমুখি বসে অমৃতাকে জিগগেস করল।

'সে অনেক দিনের কথা। তখন আমি এখানে সবে এসেছি। শ্রেষ্ঠাই প্রথম আমার একটা অনুষ্ঠানে আসে। ব্যাকস্টেজে এসে খুব প্রশংসা-ট্রশংসা করল। আড্ডার পর বন্ধু হয়ে গেলাম। পরে ও-ই বাকিদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয়।'

'ওঁদের আড্ডায় নিয়মিত যান?'

'মুড হলে যাই। সবসময় যাই না। সর্বদাই তো আর গান নিয়ে থাকা যায় না। মাঝেমধ্যে অন্যরকম স্বাদ নিতেও ইচ্ছে হয়। তখন...'

'আপনার পরিবারে আর কে আছেন?'

'বাবা মারা গেছেন পাঁচ বছর হল। দেশেই ছিলাম মায়ের সঙ্গে। উনিও চলে গেলেন। উনি ছাড়া ওখানে পড়ে থাকার অর্থ হয় না। তখন...'

'ভাই-বোন?'

'নেই। একাই থাকি।'

'আর কী করেন?'

'উত্তরবাংলার চা বাগান আর এস্টেট থেকে যে টাকাটা আসে তাতেই দিব্যি চলে যায়। গান নিয়েই থাকি। হয়ত প্রফেশনাল নই, কিন্তু একনিষ্ঠ অ্যামেচার যদি কেউ থাকে তাহলে আমি তাদের একজন, এটা বলতে পারি।'

'বয়ফ্রেন্ড?' বিকাশের তীক্ষ্ণ চোখ ওকে মাপছিল।

'এখনো কাউকে পাইনি। পরে কী হবে কে জানে?' মেয়েটি হাসল।

আশ্চর্য, চোখে পড়ার মতো সুন্দরী মেয়ের নাকি ছেলেবন্ধু নেই। এইসব আর্বান আধুনিক-আধুনিকাদের সঙ্গী-সঙ্গিনী থাকবে না এটা বিকাশ ভাবতেই পারে না। এবং এই সমস্ত আর্বান মেয়ের যদি একের বেশি পুরুষ সঙ্গী না থাকে তাহলে এদের জীবনটাই আলুভাতে হয়ে যেতে বাধ্য। বিশেষ করে এযুগে এটা তো ভাবাই যায় না। সোহিনীই সবথেকে বড় প্রমাণ। প্রিয়াঙ্কাকে দেখলেও এটাই মনে হতে বাধ্য।

'গান শিখেছেন কার কাছে?'

'বাবা। শুনেছি আমাদের এস্টেট একসময়ে হেনরি নেসবিট নামে এক ব্রিটিশের ছিল। নীলচাষ করত। ১৮৬৩-তে নীলচাষ বেআইনি হয়ে গেলে আমাদের চায়ের ব্যবসায়ী পূর্বপুরুষরা ১৮৭৫-এ এটা কিনে নেন। বাবা কাঠের ব্যবসা বা চায়ের ব্যবসা যত না পছন্দ করতেন তার থেকে বেশি পছন্দ করতেন গান-বাজনা। কলকাতায় থাকার সময়ে বড়ে গুলাম আলি খানের ছাত্রও ছিলেন।'

বিকাশ বুঝতে পারছিল যে কোনো ক্ষেত্রে উৎসাহের গোড়াটা আসে বাবা-মার কাছ থেকে। অমৃতা রীতিমতো অভিজাত পরিবারের সাংস্কৃতিক ঘরানার সন্তান। উড়ে এসে জুড়ে বসা শহুরে পাবলিকের লোক দেখানোপনা ওর মধ্যে নেই। যখন পেটের ধান্দা থাকে না তখন এইসব সাংস্কৃতিক শখ মেটানো সম্ভব। অমৃতা বাকিদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য জাতের মেয়ে।

‘আপনিও যেহেতু এই দলটায়, আপনাকেও কিছু প্রশ্ন করতে আমি বাধ্য। যদি কিছু অস্বাভাবিক মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানাতে দ্বিধা করবেন না।’ বিকাশ নিজের মোবাইল নম্বরটা দিয়ে বলল।

‘অবশ্যই জানাব।’ থানা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে পড়ল অমৃতা।

সকাল ধীরে ধীরে দুপুরের দিকে গড়াচ্ছিল। গরম এখনো তেমন বাড়েনি। অমৃতা ঢাকুরিয়া লেকের দিকে পা বাড়াল। জলের ধারে এসে মনের মধ্যে আশাবরীর রেশ খেলা করছিল। ধীরে ধীরে সুরের মূর্ছনায় ডুবে যেতে থাকল।

যতদিন না সোহিনী জড়িয়ে গেছে বিকাশ ততদিন মনেপ্রাণে চেয়েছে কেসটা ক্লোজ হোক। এখন যত তাড়াতাড়ি অপরাধীকে ধরতে পারবে তত স্বস্তিতে শ্বাস নিতে পারবে। এই হোয়াটস অ্যাপ মেসেজগুলোর চোটে তার যৌন তাড়নাও মাথায় উঠেছে। তেমন কিছু সন্দেহ করার মতো না পেয়ে শ্যামাশিস অব্দি তার কেস গুটিয়ে নেওয়ায় অ্যামিশের সঙ্গে তার যোগসূত্রটা হারিয়ে গেছে। কারণ শ্যামাশিসের মনে হয়েছে এর পিছনে সময় নষ্ট করা ফালতু শক্তিক্ষয়। রোনাল্ডোর ব্যাপারটা তার এরিয়ায় হওয়া সত্ত্বেও সেই ব্যাপারেও সে কাউকে আলাদা করে বার করে আনতে পারেনি। দরকার মোটিভ সহ একজন হাতেকলমে সন্দেহভাজন। অমৃতা চলে যাবার পরে নিজের অফিসে বসে কেবল ভেবে চলেছিল সম্ভাব্য এরকম কাউকে যদি পাকড়াতে পারে! দরকার কেবল কিছু প্রমাণ, যা তাকে মোটিভের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কী ফাঁদ পাতা যায় বসে বসে তা-ই ভেবে চলেছিল।

এই সময়ে শুভঙ্করের ফোনে তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। ‘প্রিয়াঙ্কা জয়সোয়ালের মৃত্যুর তদন্তকারী ওসি বিকাশ চৌবে বলছেন?’

‘বলছি।’

‘শুভঙ্কর রায়, বিধাননগর ওসি। সল্টলেকে অর্চনা নামে একজন মহিলা মারা গেছেন। প্রিয়াঙ্কার হাসব্যান্ড যোগেশের পি এ। আপনি কিছু সাহায্য...’

লাফিয়ে উঠল বিকাশ। যখন পথ হাতড়াচ্ছে তখন এ যেন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি। আহা! কানে যা এসেছিল তার কিছুও কি তাহলে মিলতে চলেছে! যোগেশ! যখন ও আকাশ পাতাল হাতড়াচ্ছে ঠিক তখনই নামটা মাথার মধ্যে টং করে বেজে উঠল।

‘প্রিয়াঙ্কা যখন মারা যায় তখন ও বাঙ্গালোরে। পরদিনই উড়ে এসছিল। অফিস শেকসপিয়র সরণীতে। যদিও আমি ওখানে যাইনি। গুরুসদয় রোডেই ওকে ধরেছিলাম।’

‘লোকটা কি পরিষ্কার?’ শুভঙ্কর জানতে চাইল।

‘বলা মুশকিল। হতেই পারে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে ওর সম্পর্ক সুবিধের ছিল না।’

‘কেন মনে হল?’

‘প্রিয়াঙ্কার অবৈধ সম্পর্ক ছিল বড়বাজারের একজন গার্মেন্ট ডিলারের সঙ্গে। নাম আমিশ।’

‘সে তো বলতে পারবে।’

‘আর বলবে কী করে ? সে-ও তো মারা গেছে। শুনলাম ফুড পয়জনিং হয়েছিল। ডিসিডিডি কেসটা ক্লোজ করে দিয়েছেন।’

‘যাঃ!!!’

‘হাল না-ও ছাড়তে হতে পারে। অর্চনার মৃত্যুই হয়ত ফের কেসটা রিওপেন করতে বাধ্য করবে। পিএ-র সঙ্গে বসের অ্যাফেয়ার; সেই সূত্রেই হয়ত...’

বিকাশের মাথায় নতুন প্ল্যান ঘুরছিল। শুভঙ্কর যদি টোপটা গেলে তাহলে এগোনো খুব কঠিন না-ও হতে পারে।

'বোধহয় ঠিকই বলছেন। তদন্তের সময় যোগেশ বলেছে ও মেয়েটিকে নিয়ে বাইরে ডিনার-টিনারে যেত। বিজনেস মিটেও অনেক সময় ওকে নিয়ে নানা শহরে গেছে।'

'বিজনেস মিট তো দিনের বেলায়। রাতে? ওর বাঙ্গালোর ট্রিপটাই তো ওর স্ত্রীকে মার্ডার করার পক্ষে অ্যালিবাই হতে পারে। প্রিয়াঙ্কার মৃত্যু হতেই পারে খুন। কেবল ওরই তো ফ্ল্যাটে ঢোকার সুবিধে ছিল। কেশকালাও জোগাড় করাটা কোনো ব্যাপার নয়। তার পক্ষে সবটাই সহজ। নিজে ভ্যানিশ হয়ে গিয়ে ব্যাপারটাকে স্যুইসাইড বা অ্যাক্সিডেন্টের চেহারা দিতে কি-ই বা লাগে আর! আরেকটা ব্যাপারেও খটকা আছে। লোকটার সঙ্গে কোনো এক প্রফেসর সুমিত দাসের সঙ্গে খুব অদ্ভুত যোগাযোগ ছিল। মহিলার মারা যাবার খবরটা কন্ট্রোল রুমে ওই ইনফর্ম করেছিল।'

'অদ্ভুত! এদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র কী হতে পারে?'

'সম্ভবত ন্যাসকম, লালবাজার থেকে সেরকমই বলেছে।'

'সেটা কী?' শুভঙ্কর বুঝে উঠতে পারছিল না।

'চেক করে দেখতে হবে। নেটেই থাকবে।'

শুভঙ্করের অবাক লাগছিল প্রফেসর সুমিত দাসের নামটায়। নামটা আগেই প্রিয়াঙ্কা মারা যাবার সময় উঠে এসেছিল। যোগেশ আর এই লোকটা, দুজনকেই নেড়েচেড়ে দেখতে হবে।

'আপনি কি ইনভেস্টিগেশনের ডিটেলস পাঠাতে পারবেন?' শুভঙ্কর জিগ্যেস করল।

'নিশ্চয়। মেল করছি। মেল আইডিটা দিন। সব ডকুমেন্টই স্ক্যান করা আছে।'

বিকাশ নিজের অবস্থাটা ফিরে ভাবছিল। ব্যাপারটা তাহলে এসে দাঁড়াল দুজনের মধ্যে - যোগেশ আর সুমিত। শুভঙ্কর যেহেতু ভগবানের দয়ায় এর মধ্যে এসে গেছে, ফলে... একটু চেষ্টা করলেই যোগেশ, অবৈধ সম্পর্ক, ষড়যন্ত্র এবং পরে অর্চনার ঘাড়ে ব্যাপারটা চালাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে খুন - ফাটাফাটি! একদম খাপে খাপ হুডানিট! মনে হচ্ছে এটাকে খাওয়ানোও সহজই হবে। কিন্তু রোনাল্ডোর ব্যাপারটা? নাঃ, তাকে এই ছকের মধ্যে ফেলা যাবে না। সেক্ষেত্রে আইরিনই হতে পারে তার ক্ষেত্রে আশীর্বাদ।

***

বাংলা প্রবাদ অনুযায়ী ছাই উড়িয়ে দেখে নেওয়াটা বিশেষ করে খুনের কেসের তদন্তে একেবারে প্রাথমিক ব্যাপার। অর্চনার আইফোনে ঢোকার পর যে তথ্য পাওয়া গেল তাতে চক্ষু চড়কগাছ! শেষ কলারের হদিশও পাওয়া গেল। আর কেউ নয়, প্রফেসর সুমিত দাস। শুভঙ্করের মাথায় ঢুকছিল না, যোগেশের পি এ-র সঙ্গে আইএসআই-এর অধ্যাপকের যোগসূত্রটা ঠিক কী হতে পারে! লোকটাকে প্রশ্ন করলে হয়ত এ-বিষয়ে আলোকপাত কিছু হতে পারে। দেখা হওয়াটা জরুরি।

সুমিতের অপেক্ষায় তার বসার ঘরে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। সল্টলেকে সুমিতের বাড়ি যথেষ্ট সাজানো গোছানো। সেন্টার টেবল ঘিরে গোল চামড়ার আরামদায়ক সোফা। একদিকের দেওয়ালে বিরাট এলসিডি টিভি। স্বামী-স্ত্রীর ছবির সঙ্গে দেওয়ালের নানা রকম ওয়াল হ্যাঙ্গিং আর কিউরিওতে রাজ্যের বিভিন্ন লোকশিল্পের ছোঁয়া।

খানিকক্ষণের মধ্যেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে সুমিত ঢুকল। অল্প আগেই ইনস্টিটিউট থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে।

'চা না কফি?'

'চা-ই ভালো তো! দুধ চলবে, চিনি না।'

কোনো বাহানা ছাড়াই বিষয়ে চলে এল শুভঙ্কর,'অর্চনা ভানিয়াকে কীভাবে চেনেন ?'

'অর্চনা ভানিয়া! নামটাই কখনো শুনিনি।' সুমিত অবাক।

'তাহলে ওকে ফোন করলেন কেন?'

'আমি, ফোন! ইয়ার্কি করছেন?'

'একদম না। অর্চনা ভানিয়া ই ই ব্লকে নিজের ফ্ল্যাটে রহস্যময়ভাবে মারা গেছে। ওর ফোনে শেষ কল গেছিল আপনার মোবাইল থেকে।'

'বললাম না নামটাই কখনো শুনিনি! কখনো ওই রকম নামের কাউকে ফোন করেছি বলেও তো কই মনে পড়ে না।'

শুভঙ্কর বিনাবাক্যে কল লিস্টের কাগজটা এগিয়ে দিল। এয়ারটেল থেকে পাওয়া কললিস্টের প্রিন্ট আউট। 'দেখুন, আপনার নম্বরটা আছে...' সুমিত কাগজটায় চোখ বোলাচ্ছিল। সত্যিই তো তারই নম্বর!

'তাই তো দেখছি। এটা কীভাবে হল বুঝতে পারছি না।'

'সেটাই জানতে চাইছি।'

হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে, সেই অজানা কলারেরই কাজ এটাও। হয়ত মহিলাকে পেড়ে ফেলার আগে জাল করে তার নম্বরটা... কিন্তু কী করে? মনে পড়ল অজানা সেই এসএমএসটা পরের জন তোমার এলাকাতে... তাহলে এই ব্যাপার! এই মহিলাই তার এলাকার সেই মহিলা যার কথা এসএমএসে বলা হয়েছে। এসএমএসটার কথা তার মাথা থেকেই উড়ে গেছিল। এই সুযোগ। লালবাজার যে কথা বিশ্বাসই করেনি, এবার তার পালা সেই কথাগুলো নিয়ে তাদেরই চেপে ধরার। সে অজানা কলারের বিষয়টা খুলে বলল।

'এসব আমায় বিশ্বাস করতে হবে?'

'দাঁড়ান। শেষ মেসেজটা হয়ত এখনও আছে...' সে মোবাইলে টেক্সটগুলো স্ক্রল করতে থাকল। অদ্ভুত, টেক্সটটাও উধাও।

'আমি এসেছি একটা রহস্যময় মৃত্যুর তদন্ত করতে। আপনি, একজন দায়িত্ববান মানুষ হয়ে ফালতু একটা গপ্পো শুনিয়ে বেরিয়ে যাবেন এরকমটা আশা করা যায় না!' শুভঙ্কর কঠিন গলায় বলল।

সুমিত হাল ছেড়ে দিয়েছিল। এরা কেউ প্রমাণ ছাড়া একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। এবং সেরকম দেবার মতো প্রমাণ তার হাতে সত্যিই নেই।

'লালবাজারের সঙ্গে কথা বলুন, দেখবেন এরকম আরেকটা খুনের ঘটনা ঘটেছে বিড়লা সভাঘরে, একটা ক্ল্যাসিক্যাল গিটার ফেস্টে। সেখানে খুনটা হয়েছিল সার্কিট ট্যাম্পার করে।'

'জানলেন কী করে? আপনি তো ইলেক্ট্রিসিয়ান নন। তাহলে?'

'আমার ইলেক্ট্রিসিয়ানের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি।'

'কেন? যদি না কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে?'

'ছকটা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম।'

'যদি ধরেও নিই আপনি যা বলছেন সত্যি তাহলে এবার বলুন আপনাকেই বা কেন এসবের জন্যে বেছে নেওয়া হল?'

'সেটা তো আমিও জানতে চাই।'

'মনে হচ্ছে কেসটা লালবাজারেই পাঠাতে হবে। এতগুলো গোলমেলে ব্যাপার একসঙ্গে...'

'অর্চনা ভানিয়া কে?'

'যোগেশ জয়সোয়াল, মানে যাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা অজন্তা অ্যাপার্টমেন্টে অদ্ভুতভাবে মারা গেছেন, তাঁর পার্সোন্যাল সেক্রেটারি।'

'সেই খুনটা, যেটার কথা ঘটনাটা ঘটার আগেই লালবাজারে জানাই, তাই তো? ওঁরা বিশ্বাসই করেননি। পরে অবিশ্যি ডেকে পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলেন কোত্থেকে আমি খবরটা পেয়েছিলাম। সত্যিটা বুঝে নিন। বিশ্বাস করবেন কি করবেন না আপনার ব্যাপার।'

'কোনো প্রমাণ ছাড়া কথাটা বিশ্বাস করা কি কঠিন নয়? ডিসিডিডি-কে জানাই। উনিই ঠিক করুন কী করা উচিত। আমি সামান্য ওসি। আপনি যা বলছেন ঠিক হলে আমাদের লড়াইটা লড়তে হবে একজন সিরিয়াল কিলারের সঙ্গে। এরকম অনেক পড়েছি, কিন্তু কলকাতায় এরকম ঘটবে কখনো ভাবিনি।'

শুভঙ্কর বেরিয়ে যাবার পর সুমিত ভাবতে বসল অচেনা এই কলার কি তাহলে সত্যিই একজন সিরিয়াল কিলার? পুরুষ ও মহিলার মৃত্যুর ঘটনা যেমন ঘটছে তার সঙ্গে পুরুষ ও মহিলা দুরকম কলারও হাজির। তাহলে জড়িত একের বেশি লোক। আর টিপিক্যাল সাইকো বলতে যা বোঝায় তা-ও মনে হচ্ছে না। তাহলে আরো কোনো মোটিভ থাকতে পারে। শুভঙ্করের কথা থেকে মনে হল প্রত্যেকটা মৃত্যুই একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িত। ঘটনাগুলোর মধ্যেকার সুতোটা পেলেই এই হুডানিটের সমাধান হতে পারে।

***

প্ল্যান ছকে নিয়ে বিকাশ এক মিনিট সময়ও নষ্ট করেনি। যোগেশ জয়সোয়ালকে তুলে নিল শুক্রবার সন্ধ্যেতেই।

'আমার এগেনস্টে কী গ্রাউন্ড আছে?' যোগেশ আপত্তি তোলার চেষ্টা করেছিল।

'ষড়যন্ত্রের। অর্চনার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেই আপনি স্ত্রীকে খুন করেছেন। তারপর তাকে খুন করে প্রমাণ হাপিশ করা হয়েছে।' বিকাশ চার্জ সম্পর্কে অনেকটাই নিশ্চিত।

'প্রমাণ কোথায়? ল ইয়ারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'অবশ্যই। সোমবার আপনাকে কোর্টে তোলা হবে। তার আগে থাকবেন পুলিশ রিম্যান্ডে।'

এখনো স্ত্রী আর অর্চনাকে হারানোর শোক ভুলতে পারছে না। স্বাভাবিক। দুজনেই কাছের মানুষ ছিল। এক্সট্রা-ম্যারিটাল সেক্সের মানে স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারে না তা নিশ্চয়ই নয়। কেবল মাঝেমধ্যে অর্চনার সঙ্গে শুয়েছে। এসব তো এখন এই আর্বান লাইফেরই অঙ্গ। মাথায় ঢুকছিল না, কোনো প্রমাণ ছাড়াই বিকাশ কী করে বলছে দুটো মৃত্যুই খুন।

সে পুলিশের হেপাজতে দেখেতার উকিল প্রাঞ্জল দেশমুখ এসে প্রশ্ন ছুঁড়ল, কী প্রমাণ আছে যে তার মক্কেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে!

'এটা খুনের ঘটনা। মোটিভ বোঝাই যাচ্ছে। যোগেশের প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কোনো যৌন সম্পর্কই ছিল না। অর্চনার সঙ্গে ছিল। তার সাহায্যেই সে প্রিয়াঙ্কার খপ্পর থেকে মুক্তি পেয়েছে। বাঙ্গালোরে থাকা তাকে সম্ভাব্য খুনি বলে সন্দেহ থেকে বাঁচাবার জন্যে বেশ লাগসইও হয়েছিল। অর্চনার মৃত্যু না হলে ওর ওপর কোনোভাবে সন্দেহই পড়ত না।'

প্রাঞ্জল দেশমুখ বলল,'মৃত্যু মানেই নিশ্চয় খুন নয়?'

'প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে বড় বাজারের কাপড়ের ব্যবসায়ী আমিশেরও সম্পর্ক ছিল।'

আকাশ থেকে পড়েছিল। যোগেশের জানাই ছিল না প্রিয়াঙ্কাও এরকম কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। তার ধারণা ছিল তার স্ত্রী এসব করতেই পারে না। তবে এই আর্বান লাইফে এরকম অবৈধ কেস হতেই পারে। অর্চনাও মেয়ে হিসেবে ভালোই ছিল। তাকে এর মধ্যে জড়ানো অসম্ভব। প্রিয়াঙ্কার ঘটনাটার সময় সে যোগেশের সঙ্গে বাঙ্গালোরে। তাছাড়া বন্ধ দরজার ওপারে কেশকালা ব্যবহার করে কি কাউকে খুন করা যায়! বিকাশ আসলে প্রমাণ করতে স্রেফ গপ্পো সাজাচ্ছে।

'আপনার যুক্তি দাঁড়াচ্ছে না।' প্রাঞ্জল বলল।

'দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই আমিশও মারা গেছে বিচিত্রভাবে। এমনো হতে পারে যে, ঘটনায় তারও হাত ছিল। আসলে ব্যাপার হল, যোগেশের আশেপাশে বেশ কয়েকটা অদ্ভুত খুন হয়েছে। আদালত আমার তরফে ওকে পুলিশ রিমান্ডে রাখাই সাব্যস্ত করবে।' বিকাশ অনেকদিন হল এই লাইনে আছে। সে জানে বিচারকদের কীভাবে পাকড়ানো যায়।

বিকাশই সঠিক ছিল। প্রাঞ্জল অবাক হয়ে দেখল জজসাহেব কীভাবে যোগেশকে তিন দিন পুলিশ হেপাজতে রাখার আবেদনই মেনে নিলেন।

পুলিশ হেপাজতে প্রাঞ্জল এসে যোগেশের সঙ্গে দেখা করে তাকে চার্জের গুরুত্ব বোঝাতে চাইল, 'আপনি নিশ্চয় চার্জের মানেটা বুঝতে পারছেন?' যোগেশ পারছিল।

প্রাঞ্জল বলল, 'ব্যাপারটা খুলে বলুন দেখি। সত্যি বলবেন, নইলে আমার কিচ্ছু করার থাকবে না। সত্যিই কি আপনার সেক্রেটারির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল?'

'শারীরিক সম্পর্ক ছিল। বাইরে ও অনেক সময় সঙ্গে যেত। কেবল সহবাস। কোনো আবেগ বা ভালোবাসা ছিল না...'

'আপনি কি আগেই আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন?'

'না। সত্যি বলছি কিছুই জানতাম না।'

'দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারটা কেমন ছিল?'

'কোনো ঝামেলা ছিল না।'

'তাহলে আমিশ এল কোত্থেকে?'

'প্রত্যেকেরই সেক্সের চাহিদা আছে। আমি বা ও। অনেক সময় থাকতাম না, তখন ওর প্যাশন ও মিটিয়ে নিত। এ তো এখন জীবনেরই অঙ্গ। কিন্তু এ থেকে কী প্রমাণ হয়?'

যোগেশ সৎ। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো শরীরের চাহিদাটাও বোঝে! এর মধ্যে অনর্থক ট্যাবু ঢোকানোর মানে হয় না। এ থেকে কখনো সখনো খুনখারাপির ঘটনা ঘটে না তা নয়, কিন্তু সব সময়েই নয়। প্রাঞ্জল ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল যেটা বিকাশ দেখতে চাইছিল না। তিলকে তাল করা পুলিসের ধর্ম। তার যেমন এখন লক্ষ্য যোগেশকে নির্দোষ প্রমাণ করা তেমনি চৌবের লক্ষ্য মৃত্যুগুলোকে খুন বলে চালিয়ে দেওয়া।

'সব মৃত্যুগুলোই অদ্ভুত। এমনিতে খুন বলে মনেই হয় না। অর্চনার সঙ্গে আপনার অ্যাফেয়ার থেকে খুনের মোটিভ দাঁড় করানো কঠিন। বিকাশ একটা দুর্বল জায়গা নিয়ে লড়ে যাচ্ছে। অটপ্সি রিপোর্ট এলেই বোঝাও যাবে সেটা। কিন্তু এই মৃত্যুগুলো সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?'

'উদ্ভট। সেদিন সকালেও প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কথা হয়েছে। সে একদম ঠিকঠাকই ছিল। বলেছিল বন্ধুদের সঙ্গে বেরোবে। অর্চনার ব্যাপারটাও খুন বা স্যুইসাইড বলে ধরতে পারব তা-ও যে পারছি না। হতেই পারে অ্যাক্সিডেন্ট। জাস্ট একটা ঘটনা। চৌবেই তিলকে তালটা করছে।'

'হতে পারে। খুব নড়বড়ে কতকগুলো গ্রাউন্ডে লড়ে যাচ্ছে। কোনো শক্তপোক্ত মোটিভ নেই। নিজের স্ট্যান্ড পরিষ্কার করতে বললেই ঝামেলায় পড়বে।'

প্রাঞ্জল বেরিয়ে যাবার পর যোগেশ ভাবতে থাকল চৌবে কেন তার পেছনে পড়ল! কেসটা নিয়ে এগোবার বদলে সে কেন তাকে সামনে খাড়া করে কেসটা বন্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছে? ও এখন কেবল এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবার প্রার্থনাই করছিল।

***

'আপনি তাহলে বলছেন কোনো কল করেনইনি?' ডিসিডিডি পত্রনবীশ তাঁর ভারী চশমাটার ফাঁক দিয়ে সুমিতকে মাপছিলেন।

'মোটেই করিনি। ওকে চিনিই না। আমার নম্বরটা কি হ্যাকড হয়েছে বলে মনে হয়?'

'বলা কঠিন। প্রি-পেড এসএমএস হতে পারে। কপি নাইনের মতো কোনো অ্যাপ্লিকেশনও ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। আগে এরকম দেখিনি, এরকম মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া মৃত্যুর ঘটনার ক্ষেত্রে তো নয়ই।'

'এগুলো মোটেই সমাপতন নয়। খুন। আগেই জানানো হয়েছে।' সুমিত বলল।

‘কে করল?’

‘সেটাই তো প্রশ্ন। কখনো কলারের গলা মেয়েদের কখনো ছেলেদের। ট্র্যাক করা যায় না । নম্বর থেকে কল বা টেক্সট করা হয়েছে বলে ধরাও কঠিন।’

‘আপনাকেই কেন?’ সুব্রত জানতে চাইলেন।

‘জানলে ভালোই হত। আমার একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট মারা গেল আমারই বাড়িতে। থিসিস শেষ করে বেচারির স্টেটসে চলে যাওয়া যখন একেবারে পাকা, তখন। অটপ্সি বলছে বুটেন পয়জনিং থেকে নাকি... কেউ কখনো শুনেছে?’

‘আপনি সিওর একই লোক?’

‘মনে তো হয়। মিসহ্যাপগুলো হয়ে যাবার পরে সেগুলো অ্যাডমিট অব্দি করা হয়েছে।’

‘করছেটা কারা বা কে?’

‘জানলে তো হয়েই যেত। আপনারা দেখুন।’

‘আপনার কথা বিশ্বাস করা...’

‘সত্যি বললাম, মানা না মানা আপনাদের মামলা। কোনো সন্দেহ নেই যে, এখানেই এগুলোর শেষ নয়। পাইপলাইনে আরো আছে। জানিয়ে দেব। মিলিয়ে নেবেন।’

পত্রনবীশ ভাবছিলেন প্রফেসর দাসকে নির্দোষিতা প্রমাণের জন্যে আরেকটা সুযোগ দেওয়া উচিত। আইএসআইয়ের একজন প্রফেসর ফালতু খুনের মতো ঝামেলায় কেন ফাঁসতে যাবেন? যুক্তি সুমিতের কথাকেই অনুমোদন করছে। যদিও তাঁর পেশাগত কর্তব্যবোধ অন্য কথা বলছে। অবশ্য একে তো যে কোনো সময়েই ধরা যাবে।

‘ফাইন। দেখা যাক। মাথায় ঢুকছে না আপনাকে কেন জড়ানো হল...’

ফেরার পথে সুমিত খুনগুলোর প্যাটার্ন নিয়ে ভাবছিল। প্রথমটা মহিলা খুন হলেন, কলার ছিল পুরুষ। দ্বিতীয়টা ঠিক উলটো। তিন নম্বরটা প্রথমটার মতো। চতুর্থটা দ্বিতীয়টির মতোই। তাহলে হিসেব মতো পঞ্চমজন মহিলা হওয়া উচিত। যদি এই প্যাটার্ন কাজ না করে তাহলে অবিশ্যি খুন হবে পুরুষ। এবং কলার হবে মেয়ে। তাহলে কি এই অদ্ভুত ধাঁধার মূলে কোনো দম্পতি? ঘটনা তো সেইদিকেই আঙুল দেখাচ্ছে। তাহলে সুমিতকে লড়তে হবে দুজনের সঙ্গে, একজন নয়। যদি... যদি সে সত্যিই ছকটা ধরে ফেলতে পারে তাহলে হয়ত আরেকটা দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হলেও হতে পারে! সাইকো সিরিয়াল কিলার কম হলেও দেখা যে একেবারেই যায় না তা নয়, কিন্তু ডবল সাইকোপ্যাথ এর আগে কোথাও দেখা গেছে কি?

সল্টলেকে নিজের বাড়িতে ড্রিঙ্কস নিয়ে বসে সুমিত আজকের সারা দিনে যা যা হয়েছে তার থেকে কিছু বার করা যায় কিনা ভাবতে চেষ্টা করছিল। ভালো হয়েছে পত্রনবীশকে অন্তত বোঝাতে পেরেছে, কেউ না কেউ তাকে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছে।

হঠাত প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ঈশিতা ভট্টাচার্যের কল পেল। বহুদিনের বন্ধু ঈশিতা। সেই প্রথম দিনগুলো, যখন তারা পড়াশোনা করছে, তখন থেকেই অন্তরঙ্গতা।

‘অচিরার মারা যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু জানতে পারলি?’

‘কই আর! অটপ্সি বলছে বুটেন পয়জনিং থেকেই হয়েছে ঘটনাটা!’

‘লাইটার, গ্যাস সিলিন্ডার এসবে যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় তা-ই থেকে বলছে?’

‘একদম তা-ই।’

‘অদ্ভুত! সন্দেহ তো কিছু একটা করা হচ্ছে, নাকি? অ্যাক্সিডেন্ট, স্যুইসাইড, নাকি খুন?’

‘এখনো সেভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না! অচিরার মতো একটা মেয়ে, ওরকম মেরিটোরিয়াস... খুব প্রিয় ছাত্রী ছিল আমার।’

‘এত খারাপ লাগছে যে কী বলব! আজও মনে আছে মেয়েটা যখন বর্ধমান থেকে এসে ঢুকল তখন থেকেই কী চোখে পড়ার মতো ছিল...’

‘আমার বাড়িতেই ঘটনাটা ঘটল, এবং ঘটল কবে, না ঠিক যেদিন বেচারি থিসিসের কাজ কমপ্লিট করল! পুলিস বিষয়টা দেখছেই। যা হবে সব জানাব তোকে।’

ফোনটা যেই রেখেছে ঠিক সেই মুহূর্তেই ফ্যান্সি ফন্টে একটা মেসেজ ঢুকল‘এবার পরের জন। প্রিয়াঙ্কার বন্ধু শ্রেষ্ঠা। একডালিয়া রোডে তার বাড়িতেই। কাল। সন্ধে সাতটায়।’

নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের সুযোগ একেবারে হাতের মুঠোয়। এইবার আততায়ীর অস্তিত্ব প্রমাণিতও হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে পত্রনবীশকে ফোন করল, ‘এখুনি একটা টেক্সট এল। পরের জন শ্রেষ্ঠা। প্রিয়াঙ্কার এক বন্ধু। কাল ঘটবে। সন্ধে সাতটায়।’

‘ঠিকানা?’ পত্রনবীশ জিগ্যেস করল।

‘একডালিয়া রোডের কোথাও। এটাই টেক্সটে বলেছে। প্রিয়াঙ্কার খুনের তদন্ত যিনি করছেন তিনি নিশ্চয় বলতে পারবেন ঠিকানাটা।’

‘দেখে নিচ্ছি। আমাদের টিম থাকবে ওখানে। আপনিও সঙ্গে থাকবেন।’

ফোনটা রেখে সুমিত স্বস্তির শ্বাস ফেলল। শেষ অব্দি তাহলে নিজের কথাকে প্রমাণ করতে পারল। এবার খুনটা আটকানোর চেষ্টা। এখন আর সে একা নয়। কিন্তু অর্চনার পর ফের কেন একজন মহিলা? তার আন্দাজের প্যাটার্নের সঙ্গে তো কই মিলছে না! অর্চনা অব্দি তার হিসেব মিলেছিল। তাহলে কি তার ধারণা ভুল? আরো কোনো প্যাটার্ন কি তাহলে কাজ করছে পেছনে? সেটা কী? কোনো সন্দেহ নেই যে, তাকে বাছাই হয়েছে তার স্ট্যাটিস্টিক্সের ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্যে। পেছনে কি তাহলে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভ্যারিয়েবলসের খেলা? নাকি কেবল অঙ্কের জারগন ব্যবহার করে মাথা গুলিয়ে দেবার চেষ্টা? কোন ফর্মুলায় তাহলে সে পরের জনকে আন্দাজ করতে পারবে?

তার কাজ হল এখন পাজল সলভ করা, তদন্তের কাজ পুলিস করুক। ধাঁধার সমাধান তাদের ক্ষমতার বাইরে...

***

কফির কাপটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠা একটা কল পেল, ‘সুব্রত পত্রনবীশ, ডিসিডিডি লালবাজার বলছি। আপনার সামনে খুব বিপদ। লাইফ রিস্ক। আমাদের লোক চলে গেছে আপনাকে পাহারা দেবার জন্যে। না বললে বাড়ি থেকে বেরোবেন না। গিয়ে সব বুঝিয়ে বলব।’

আচমকা এই ফোনে শ্রেষ্ঠার মাথা গুলিয়ে গেল। থ হয়ে বসে রইল। তার বিপদ! সে-ও খুন হতে পারে! কেউ তাকে খুন করবে? কেন? লালবাজারের ডিসিডিডি-ই বা এটা জানলেন কোত্থেকে? একদম একা বসে বসে এখন তার হাত-পা হিম হয়ে যাচ্ছিল। কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হয়। কে? সবাই তো যে যার বাড়ির লোকের সঙ্গে ব্যস্ত। কেবল অমৃতাই হয়ত ফাঁকা থাকবে!

‘এইমাত্র ডিসিডিডি লালবাজার ফোন করলেন জানিস! বললেন আমার নাকি লাইফ রিস্ক আছে! শুনেই তো বাবা হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেছে…’ কাঁপছিল সে।

‘একটু ঠান্ডা হ দেখি! তোকে আবার কে খুন করতে যাবে!’ অমৃতাও হকচকিয়ে গেল।

‘জানি না বাবা! খুব ভয় করছে!’

‘ভয় পাস না। আমি আসছি...’ অমৃতা হই হই করে উঠল।

ফোন রেখে পত্রনবীশের কথাগুলো নিয়েই ভাবতে লাগল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম নিয়ে বসে থাকতে থাকতে কেবল মনে হচ্ছিল এই বুঝি কিছু হল। টয়লেটে গিয়ে মুখেচোখে জল দিয়ে একটু শান্ত হল।

পুলিস আসার আগেই অমৃতা এসে হাজির। এসেই ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সাহস দিতে লাগল,'এত ভয় পাস না। দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না কোনো খুনি এসে তোকে খুন করে যাবে! এই ঘরে, শহরের এরকম একটা জায়গায়, এত লোকের মধ্যিখানে? অতই সহজ? আর, ধর কেউ চাইছে সত্যিই তোকে খুন করতে, কিন্তু তারও তো একটা কোনো কারণ থাকবে? নইলে কেনই বা করবে বল?'

'সেসব কেবল ওই ডিসিডিডিই জানে। নিশ্চয় আমি কারো কিছু করেছি, তাই জন্যে... আমি কেবল ভাবছি লোকটা কে!'

'দেখবি সম্পূর্ণ উড়ো কল। যত যা-ই বলুক দেখবি কিছুই হবে না।'

'সেদিন চৌবে নামে ওই পুলিস অফিসারের সঙ্গে বিচ্ছিরি ব্যবহার করেছিলাম; সেই লোকটাই আমার পেছনে লাগবার জন্যে এসব করছে না তো!'

'হতেই পারে না। ধরা পড়লে চাকরি চলে যাবে! ভেবে বল দিকি কারো সঙ্গে কিছু ঝামেলায় জড়িয়েছিস?' অমৃতা থ্রেটটা খতিয়ে দেখতে চাইছিল।

'ঝগড়া হবে না কেন? কারই বা হয় না?'

'প্রেমের ত্রিকোণ নয় তো?'

'অগ্নিভর সঙ্গে সেই কবেই তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সবই তুই জানিস। ওর সঙ্গে যে আমার পটবে না এটা তো ও-ও বুঝত।'

'অবিশ্যি ওসব থেকে তো আর খুনের হুমকি আসতে পারে না - এটাও ঠিক। কেবল ব্যক্তিগতভাবে কারোর পেছনে লাগলে আলাদা প্রশ্ন...' অমৃতা জোরের সঙ্গে বলল।

শ্রেষ্ঠা ভাবতে চেষ্টা করছিল কখনো এরকম কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল কিনা। মনে পড়ল না। যদিও খুব মেয়েলি নয়, তবু সব মিলে তার জীবন সব আর্বান মেয়েদের মতোই। সাউথ পয়েন্টের মেয়ে, গ্র্যাজুয়েশন করেছে প্রেসিডেন্সি থেকে, তারপর এমবিএ। টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিতে পার্ট-টাইম এক্সিকিউটিভের কাজ করে। তার ব্যক্তিত্বই পুরুষদের তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মেয়েদের মধ্যেই সময় কাটায়। আজকের কথা কাল মনেও রাখে না। বাকি সময়টা কাটে ছবি আঁকা আর গান-বাজনা নিয়ে। যদিও অমৃতার মতো সংগীতে ডুবে থাকা মানুষ নয়, কিন্তু গান-বাজনায় তার আগ্রহও কম নয়। বেশি পছন্দ ছবি আঁকা। মোটামুটি ধনী পরিবারের মেয়ে শ্রেষ্ঠা একডালিয়ায় তাদের পারিবারিক বাড়িতেই থাকে। খুব একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভোগে না। এই অনীহা তার ব্যক্তিত্বে বেশ একটা বিশেষত্ব যোগ করেছে। তার টমবয় চলাফেরার জন্যেই সম্ভবত তার তেমন শত্রু বলতে যা বোঝায় তা নেই।

'চেষ্টা করছিলাম বুঝলি মনে করতে। খুব কাউকে খেপিয়ে রেখেছি তেমন তো মনে পড়ে না। হতে পারে অগ্নিভ, আমিই বাতিল করেছিলাম বলে। মানুষের মন...কদ্দুর আমরা বুঝি বল!'

হাসছিল অমৃতা,'অত ভাবিস না। এখুনি পুলিস এসে পড়বে। আমিও থাকছি! অত ভাবার কী আছে? আর যদি হোক্স কল হয় তাহলে তো ডিসিডিডি রইলেনই...'

অমৃতার দৃঢ় মনোভাব তাকে অনেকটা শান্ত করে আনল। পুলিসেরই এখন দায় তার নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখা, তা সে কলটা উড়ো কল হোক আর না-ই হোক।

***

প্রফেসর দাস আর অন্য লোকজনকে নিয়ে ডিসিডিডি পৌঁছে গেলেন। এসেই অন্যরা যখন অ্যাপার্টমেন্টটা তোলপাড় করে ফেলতে শুরু করেছে তখন ডিসিডিডি এগিয়ে এলেন,'সুব্রত পত্রনবীশ, ডিসিডিডি, আর প্রফেসর সুমিত দাস, আইএসআই...' পাশের মানুষটিকে দেখালেন। 'শ্রেষ্ঠা, আর...' ঘাড় অব্দি চুল - টপস আর জিনস পরা মেকআপহীন মহিলার দিকে তাকালেন।

‘আমার বন্ধু অমৃতা। ফোন পেয়ে এত ভয় লাগছিল... সত্যি, আমার সামনে বিপদ?’

‘নইলে অযথা এভাবে সময় নষ্ট করে ছুটে আসি? তবে যতক্ষণ না কিছু হচ্ছে ততক্ষণ কিছু হবেই কি বলা যায়! যাই হোক, তবু সাবধান তো হতেই হবে, তাই না? এখানে কে কে থাকেন?’

‘একাই। বাবা মায়ের গড়িয়াহাটের হইচই সহ্য হয় না বলে চলে গেছেন কল্যাণীতে। কখনো-সখনো আসেন। নইলে একাই থাকি।’

‘রান্নাবান্না, বাড়িঘর দেখাশোনা?’

‘কয়েকজন আছে। কাজ করে চলে যায়। বাকি আমি নিজেই দেখি। আমার কাজ খুব বেশি সময়ের নয়, তাই...’শ্রেষ্ঠা বলল।

‘আপনি কী করেন?’

‘একটা টেলিকম কোম্পানিতে কনসালটেন্সি।’

‘কোথায়?’ সুব্রত তাকালেন।

‘এয়ারটেল। ইউ এন ব্রহ্মচারী স্ট্রিটে বসি।’

‘আর কিছু? প্রফেশনের বাইরে?’

‘আর কী? মাঝেমধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে বেরোই। গানের প্রোগ্রাম, এক্সিবিশন... অমৃতার মতোই।’

‘গান করেন?’

‘চেষ্টা করি। অমৃতার মতো তো পারি না। বরং ছবিটাই...’

‘দু-একটা যদি দেখা যেত...’

ছবি আঁকা তাঁর নিজেরও হবি। পুলিসের কাজে দৌড়োদৌড়ির পর ওটাই তাঁর একটু নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা। সবারই এরকম কিছু দরকার হয়। সুব্রতও তার বাইরে নন। আলিপুর রোডে কোয়ার্টারে ফিরে তাঁর কাজই হল ইজেল-ব্রাশ নিয়ে বসা। তাঁর রক্তেই আছে। অনেক সময়ে বাবার কাছে বকুনিও খেতে হয়েছে কেরিয়ার ফেলে এই নেশা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলায়। আইপিএস পরিচয়টা তাঁকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, যেখানে এই নেশা যাতে রাজনৈতিক লোকেদের পরিহাসের বিষয় না হয়ে ওঠে তার দিকে নজর রেখে বাড়ি ফেরার পর স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে ইজেল নিয়ে বসতে হয়। কিছু পাবার আশা না রেখেই এই নেশা তাঁকে বেঁচে থাকার সুখ দেয়। জীবন থেকে কেবল পাওয়াই নয়, কিছু তো দেবারও থাকে।

অবসর বিনোদনের ঘর, যাকে অচেতন মনেই লিভিং রুম বলে থাকে শ্রেষ্ঠা, তাঁকে সেখানে আনল। এ ঘরই তার নিজের জগৎ। এখানেই সে শিল্প সাহিত্য সংগীতে ডুবে থাকে। এখানেই অজানা দেবদূতেরা তার আত্মার খিদের উপশম ঘটান। এখানেই সে হারিয়ে ফেলা নিজেকে খুঁজে পায়।

সুব্রতর মনে হল ওর আঁকা সম্পর্কে একটাই কথা প্রযোজ্য : ইম্প্রেসিভ। বুঝতে পারল এই সব ছবি যার আঁকা সে নিজের জগতে ডুবে হারিয়ে গিয়েছে।

বাইরের ঘরে ফেরত এসে বলল,‘প্রফেসর দাসই অচেনা একটা নম্বর থেকে কল আর টেক্সট পান, যাতে খুনের কথা ঘোষণা করে আততায়ী। অন্তত আগে তা-ই হয়েছে। এবারের থ্রেট আপনার নাম করে। তাই আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাটা জরুরি মনে হয়েছে। আমাদের লোকেরা যতক্ষণ না মনে করবে বিপদ কেটে গেছে ততক্ষণ গার্ড দেবে। আতঙ্কের কিছু নেই। সঙ্গের লেডি অফিসাররা এসব কাজে পোক্ত।’

অমৃতার দিকে ফিরলেন,‘আপনি তাহলে গান করেন? কী ধরনের গান?’

‘হিন্দুস্তানি ক্ল্যাসিকাল।’ কালো মেয়েটি জবাব দিল।

‘থাকেন?’

‘কাছেই। কেয়াতলায়। আমিও থাকছি ওর সঙ্গে। বুঝতেই পারছেন ওর মনের অবস্থা, তাই...’

‘যা ভালো বুঝবেন...’

সুব্রত যখন বেরোতে যাবেন তখন সুমিত বলে ফেলল, ‘আমিও থাকব।’

পত্রনবীশ বুঝতেই পারছিলেন ও নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বললেন, 'যা ভালো বোঝেন...'

গাড়িতে বসে সুব্রত স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। মহিলার নিরাপত্তার জন্যে যা যা করার সবই করেছেন। প্রফেসর যদি ঠিকও বলে থাকে তাহলেও খুনি দেখবে এখানে প্রবেশ অসম্ভব।

এই মহিলাদের সঙ্গে বেশিক্ষণ বকার কিছু নেই জেনেই সুমিত তার ল্যাপটপে ক্লান্ত চোখ রাখল। সাম্প্রতিক পেপারটা নিয়েই বসা যাক। অস্বস্তি হচ্ছিল ভেবে যে অর্ধেক বয়েসের এই মেয়েগুলির সঙ্গে কিছু কথা একদম না বলাও খুব রূঢ় হয়ে যাবে। কাজ থেকে চোখ সরিয়ে টুকটাক কিছু কথাবার্তা সেরে নেবার জন্যে মনে মনে তৈরি হল।

***

যোগেশকে চটপট তুলে নিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলেছিল চৌবে। সোহিনীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টিতে তাহলে আর ঝামেলা থাকছে না। এতদিন যে ঝুটঝামেলা চলছিল তাতে ওদিকে পা বাড়াবার কথাই ভাবতে ভয় পাচ্ছিল। এবার দত্যিকে বোতলে পোরা গেছে। আর চিন্তা কী! আর হোয়াটস অ্যাপ মেসেজও আসছে না দেখে আবার বোসপুকুরের ডেরায় আসর বসাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছিল।

কেউ না, এমনকি তার বৌ-ও জানে না এই ডেরার কথা। পুলিসে কাজ করার সূত্রে উপরি থেকে এই ওয়ান-রুম ফ্ল্যাটটা কিনেছে। এটা সোহিনীর নামে রেজিস্ট্রি। সোহিনী কিছু লিগ্যাল ডকুমেন্টে সই করে এর অধিকার তার হাতে দিয়ে রেখেছে। চৌবের কাজটা যেহেতু সরকারি, ফলে বুদ্ধি করে না চললেই ঝামেলা। যা করবে নিরাপদেই করতে চায়।

'বিকেলে কী করছ?'

'লম্বা মোটামতন একটা জিনিসের স্বপ্ন দেখব ভাবছিলাম...' ওর গলায় ন্যাকামি।

'হুঁ। স্বপ্ন দেখার দরকার নেই। প্রিয়াঙ্কার স্বামী যোগেশকে তোলা হয়েছে, আর ভাবনা নেই।'

বিয়ের আগে থেকেই সোহিনী একটু কামোন্মাদ পুরুষেরই স্বপ্ন দেখত, মেনিমুখো পুতুপুতু ছেলেদের নয়। এতেই তার কাম জাগত। এই জায়গায় রাজ কেবল মাত্র ব্যর্থই নয়, চূড়ান্ত ব্যর্থ। তাদের ছেলেপুলেও হয়নি। ফলে বিকাশের সঙ্গে লটঘট ছাড়া সোহিনীর সামনে আর কোনো পথই খোলা ছিল না। এই বিষয়টাকে রাজের প্রতি অন্যায় নয়, বরং তার নিজের অধিকার বলেই দেখেছে। মেয়েদেরও তো শরীর বলে একটা পদার্থ আছে, সে নিজেই বা তার বাইরে পড়বে কেন?

'আজ কেন? রাজ আজ বাড়ি আছে! কাল ভোরের ফ্লাইটে ও মুম্বই যাবে, তারপর...'

'বেশ, তাহলে কাল বোসপুকুরে, লাঞ্চের পর...'

যোগেশকে যেহেতু শুক্রবার তোলাই হয়েছে ফলে কাল রোববার বাদে সোমবারের আগে কোর্টে তোলা হবে না। রাজ যদি শহরে না-ই থাকে তাহলে রোববার দিনটা সোহিনীর গরম কমানোর পেছনে দিতে অসুবিধে নেই।

হলুদ সালওয়ার কামিজে সোহিনীর শরীরের ঝাঁজ যেন উপচে পড়ছিল। বিকাশ ওর খাঁজগুলোর দিকে তাকিয়েই গরম হয়ে উঠল। সোহিনী বিকাশকে কম চেনে না। তাকে লক্ষ করেই সে পালটা চাউনিতে তাকে আধমরা করে ছাড়ল। এমন মেয়ে কে কবে দেখেছে যে তার শরীরের দিকে লুব্ধ চোখে তাকালে মুখে যা-ই বলুক ভেতরে ভেতরে খুশিই হয় না!

'আর কোনো মেসেজ পেয়েছ?'

'না। পেলে তো বলতাম।'

'যোগেশকে তোলা হয়েছে। এবার সব ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

‘ও-ই কি কালপ্রিট?’

‘তা-ই তো মনে হয়। যাক গে, বাদ দাও। রাজ কদ্দিনের জন্যে গেল?’

‘আগামী শুক্রবার ফিরবে। এ হপ্তায় কতকগুলো মিটিং পড়েছে শুনছিলাম।’

বিকাশ হাঁফ ছাড়ল। সোহিনীর সঙ্গে আগামী কয়েকটা দিন ফাটাফাটি জমিয়ে নেওয়া যাবে। আপন মনে ভাবছিল এই সেক্সটাই যদি তার মোটা ধুমসি বৌয়ের সঙ্গে করতে হত... সে মোটেই ধোয়া তুলসি পাতা নয়। কিন্তু জীবনে আর কোনো মেয়ে তার কাম এইভাবে চাগিয়ে তুলতে পারেনি।

সোহিনীরও কাম উদগ্র হয়ে উঠছিল বিকাশের রোমশ বুকের দিকে তাকিয়ে। তার শরীরের মধ্যে যেন গরম লাভার স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। ভরা পেটে যৌনতা খুব উপাদেয় হয় না। সে চাইছিল বিকাশ যেন এই মুহূর্তে তার সারা শরীর মনের দখল নিয়ে নেয়। বিকাশ আর তার কামঘন নিঃশ্বাসের তুফান সারা ঘরে যেন ঝড় বইয়ে দিতে লাগল।

‘লাঞ্চের আগে চট করে স্নানটা করে নেওয়া দরকার।’ সোহিনী নিজেকে সাফ-সুতরো করার জন্যে টয়লেটে গেল।

বিকাশ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়েছিল। চিন্তা এখন একটাই - যোগেশকে কোর্টে তুললে কী বেরিয়ে আসবে! যদি না তাকে আগেই ভালো করে কব্জা করা যায় তাহলে কেস আরো গড়াতেই পারে। নিশ্চিত জানে না বটে, তবে যোগেশই যদি অনামা টেক্সটগুলো পাঠিয়ে থাকে তাহলে তার তরফ থেকে আর কোনো চাপ আসার আশঙ্কা থাকার কথা নয়।

জমিয়ে লাঞ্চের পর ওরা খানিক গড়িয়ে নিল। ঘুম ভাঙল সূর্য তখন ডোবে ডোবে। উঠে সোহিনী বিকাশের দিকে অলস একটা চাউনি ছুঁড়ে দিল। ও তখনো ঘুমোচ্ছে অঘোরে দেখে ব্যালকনিতে চলে এল। বিকেলের মায়াবী আলোয় জনবহুল মেট্রোপলিস তখন ধুয়ে যাচ্ছে। গোধূলির আলোয় মন ভালো হয়ে যাচ্ছিল। কিছু বাদেই চৌবেও শর্টস পরে উঠে এসে পাশে দাঁড়াল।

‘আজ থেকে যাবে নাকি?’ বিকাশের মনে নতুন করে কামনা চাগাড় দিচ্ছিল।

‘না, বাড়ি ফিরতে হবে, রাজ রাতে ফোন করলে কী হবে?’ ঠিক তাই। রাজ রাতে ফোনে তাকে না পেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। ফালতু ফেঁসে লাভ?

‘ঠিক আছে তা’লে। যাবার আগে ডিনারটা সেরে নেব! লাঞ্চে চাইনিজ হয়েছে, ডিনারে বিরিয়ানি-চাপ হোক কী বলো! কদিন আগে একজন একটা কারধু দিয়ে গেছে। ওই সিঙ্গল মল্ট হুইস্কিটা চেখে অব্দি দেখিনি!’

সোহিনী ঘাড় নাড়ল। দূরের তারাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। অল্প মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা বেরিয়ে আসতেই তার মনে ফের একটা কামভাব চাগিয়ে উঠছিল। বিরিয়ানি আর চিকেন চাপের অর্ডার দিয়ে ওরা ভেতরে এসে বসল। বিকাশ সিঙ্গল মল্টের বোতলটা বার করল। কুরকুরে আছে। কাল আবার সকালে যোগেশকে কোর্টে তোলা আছে, ফলে আজ একটু চেপে খাওয়াই ভালো। টিভি খুলে আজকের হেড লাইনগুলোর দিকে মন দিল। সোহিনী আধশোয়া বসে ফেসবুকে চোখ রাখল। একটা হোয়াটসঅ্যাপ নোটিফিকেশনের দিকে নজর যেতেই আঁতকে উঠল**‘কোলটি তোমার নরম, দুলবে সে বেশ গরম’**। কোনো দিকে নজর না দিয়েই সে বিকাশের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিল। বিকাশ আনমনেই নজর দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হয় আর কী! আবার সেই অজানা লোকের টেক্সট! কেউ কি ইয়ার্কি করছে নাকি? যোগেশই যদি পুলিসের হাতে, তাহলে মেসেজ পাঠাল কে?

ড্রিঙ্কস তার মস্তিষ্কের কোণায় কোণায় ধাক্কা মারছিল। উত্তেজনায় নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। সোহিনীকে টেনে নিয়ে তার বুক দুটো পিষতে শুরু করার আগে ফোনটা চালু করল, ‘যোগেশ ও কে?’

‘একদম।’

‘কাগজপত্র যেন তৈরি থাকে। কাল কোর্টে তুলতে হবে।’

ফোনটা রেখে ভাবতে থাকল। কেস ক্লোজ করার তাড়ায় শেষে কোথাও কোনো গলদ রয়ে গেল কি? হয়ত। কিন্তু এর সঙ্গে ওদের অবৈধ সম্পর্ককে মেলাচ্ছে কে? ধরা পড়ার ভয়ে ব্ল্যাকমেল করে কাজ হাসিল করার ধান্দা নয়ত?

'কে এগুলো পাঠাচ্ছে বলো তো?' সোহিনীকে খুব টেন্স দেখাচ্ছিল।

'জানলে তো হয়েই যেত! আচ্ছা, রাজই আমাদের চমকাবার জন্যে এসব করছে না তো! ও কি জানে নাকি কিছু?'

'কী করে বলব? যদ্দুর জানি, জানে না...' সোহিনীকে বিহ্বল দেখাচ্ছিল।

'যদি আমাদের ওপর কোনো ডিটেকটিভ লাগিয়ে রাখে? বলা যায়?'

সোহিনী কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। রাজ নিজের ব্যবসাতেই ব্যস্ত। সে ভীষণ একা হয়ে পড়েছিল। আজকাল শহরের ঘরে ঘরে এটাই চলছে। চৌবের খেয়েদেয়ে কাজ নেই রাজের সঙ্গে টক্কর দিতে যাবে! তাতে তো ওদেরও পারিবারিক ঝামেলা হবে। ফুর্তিতেও ঘা পড়বে।

'হতেই পারে কিন্তু! তাহলে কি দেখাশোনা বন্ধ করে দেব?'

'পাত্তা দিও না। যদি ওর বউয়ের প্রতি কর্তব্য না থাকে তো অন্যে কেন সেই সুযোগ নেবে না? নিছক সন্দেহের ওপর না থেকে দ্যাখোই না কী হয় শেষমেশ। দেখি নম্বরটা বার করা যায় কিনা। এরকম আর কিছু পেলে সঙ্গে সঙ্গে ফরোয়ার্ড করে দিও।' সোহিনীর ওপর শরীরের ভার তুলে দিতে দিতে বলল,'ভয় পেও না! আমি তো আছি! সব সামলে নেব।'

সোহিনী ওর দুই বাহুর মধ্যে ছটফট করছিল। তার আর দ্বিতীয় ইনিংসের মেজাজ ছিল না। উঠে ওরা রাতের খাওয়া সেরে নিল।

বিকাশ জানত না এই অচেনা নম্বর খুঁজতে গিয়ে কতটা চমকাতে হবে তাকে! পরদিন সকালে সে তড়িঘড়ি কোর্টের পথে পাড়ি দিল।

***

ডিসিডিডি বেরিয়ে যেতেই সুমিত বসার ঘরে আরাম করে বসল,'আপনি তো...'

'শ্রেষ্ঠা বিশ্বাস।'

কেয়াতলার বাসিন্দা শ্যামলা মেয়েটি বলল,'আমি অমৃতা পালচৌধুরী।'

'আপনি তো অধ্যাপনা করেন। এর মধ্যে পড়ছেন কোন সূত্রে...' কফির কাপ এগিয়ে দিল শ্রেষ্ঠা।

'আমায় একটা টেক্সট করা হয়েছে। সেটা কতটা ভ্যালিড সেটাই দেখতে চাইছি।'

'আপনাকে পাঠাল কেন?' শ্রেষ্ঠা অমৃতার পাশে জমিয়ে বসে জিজ্ঞেস করল।

'যদি জানতাম তাহলে তো অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যেত।' কফিতে চুমুক দিল সুমিত,'এখন আসল কথা আপনার নিরাপত্তা।'

শ্রেষ্ঠার কথাটা ভালো লাগল। মাথায় এখনো ঢুকছে না ফালতু কী কারণে খুনি তাকে বেছে নেবে খুন করার জন্যে! হতে পারে তার স্বভাবের জন্যেই কেউ হয়ত তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এতখানি কিছু হয়নি কখনো যার জন্যে... খাপ খায় এমন কিছু, কোনো উদাহরণ হাজার মাথা খুঁড়েও এতক্ষণ খুঁজে পায়নি। হয়ত কেউ অজ্ঞাতেই তার কোনো ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। হতেই পারে। কিন্তু স্রেফ তার জন্যেই? নাঃ। মনে তো হচ্ছে না।

'এই ঝুটঝামেলা না মেটা অব্দি আমি ওর সঙ্গে থাকব।' অমৃতা বলল।

শ্যামলা মেয়েটি সুমিতকে রীতিমতো মাপছিল। ফরসা, হ্যান্ডসাম, চল্লিশের সামান্য ওপরের মানুষটির পেছনে একসময় কম করেও বেশ কিছু মেয়ে নিশ্চয় হাবুডুবু খেয়েছে। স্ট্যাটিস্টিকসে অধ্যাপনাও খুব উড়িয়ে দেবার মতো নয়। বুদ্ধিমান, সুদর্শন এরকম একজন মেয়েদের মাথা ঘোরানোর জন্যে যথেষ্ট। কণ্ঠস্বর থেকে

অমৃতা বেশ টের পাচ্ছিল তার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। সাদা ট্রাউজার্স, হাফ হাতা জামা, চোখের বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি সব মিলে তাকে নজর এড়াতে দেয় না।

'আপনিও বুঝি ক্ল্যাসিক্যাল পছন্দ করেন?'

'ক্ল্যাসিক্যাল আমার প্রাণ, প্রফেশন নয়।'অমৃতা আস্তে করে বলল।

'ও যা গায় আপনি না শুনলে ভাবতেও পারবেন না।'

'তাহলে গানটাকেই প্রফেশন হিসাবে নিলেন না যে?' সুমিত তাকাল।

'ভাবিইনি। প্রফেশন হিসাবে নিলে তো স্বাধীনতাটাই চলে যাবে। যদি কখনো আর গাইতেই ভালো না লাগে তখন?'

সুমিতের অবাক লাগছিল। এরকম কারুর মুখোমুখি হয়নি এতদিন। কতদিন তার ইচ্ছে হয়েছে গেয়ে ওঠার কিন্তু পারেনি। সেই ক্ষমতাই ঈশ্বর তাকে দেননি। সে গায় মনেমনে। নিজের গান। নিজের মনের গান।

নিজের কর্তব্যের তালিকা তার কাছে খুব পরিষ্কার। এখন সেই তালিকার মাথায় শ্রেষ্ঠার প্রাণহানির আশঙ্কা নির্মূল করা। তার ধারণার সঙ্গে এটা মেলেনি। অর্চনা যদি আগের শিকার হয় তাহলে তো এবার দুর্ভাগ্য হওয়া উচিত কোনো পুরুষের, শ্রেষ্ঠার কেন? প্রার্থনা করছিল তার আন্দাজই যেন ঠিক হয়। তার উপস্থিতিতে আরেকটা মৃত্যুর ধাক্কা নিতে চাইছিল না। খুনি কোনো না কোনোভাবে তাকে ফাঁসাতে চাইছে। পুলিসের আরো প্রশ্নের উত্তর হয়ত তাকে দিতে হবে। তা হোক, কিন্তু একটা প্রাণ অন্তত বাঁচুক।

'আপনাদের মানসিকতা মনে হয় একইরকম।'সে আনমনে বলল।

'একদম তা-ই। ও অবিশ্যি একটা কাজ করে, কিন্তু যদি লক্ষ্য বলেন তাহলে জীবনে বিরাট কিছু করার লক্ষ্য আমাদের কারোরই নেই।' অমৃতা বলল।

'সেই জন্যেই আপনারা বন্ধু হতে পেরেছেন! আপনাদের মতো এত মিল খুব আচমকা চোখে পড়ে না।'সুমিত তাকাল শ্রেষ্ঠার দিকে।

'যেমন ভাবছেন ততটা কিন্তু নয়। আপনার মতো অমন বুদ্ধি আমাদের নেই। বাবা বলতেন কখনো ফলস ইগো নিয়ে থাকবে না। সেটাই সব ঝঞ্ঝাটের মূল। এতে অন্যকে ছোট করার পথ খুলে দেওয়া হয়। চেষ্টা করা দরকার মানুষ হবার, সুপার-ম্যান হয়ে কী হবে!' অমৃতার দৃষ্টি জানলার বাইরে হারিয়ে যাচ্ছিল।

'সব সময়ে কি তা-ই! বুদ্ধি মানুষকে বিনয়ীও করে, তাই না?'

'আমার থেকে বেশি কে জানে!' অমৃতার গলায় বিদ্রূপের ছোঁয়া!

'খানিকটা ধরতে পারার ওপরও নির্ভর করে।' শ্রেষ্ঠা ঘরের মধ্যেকার জমাট ভারী ভাবটা কাটাতে চাইছিল। দায়িত্বের প্রতি সুমিতের ভঙ্গীটা ওকে নরম করে এনেছিল।

সুমিত ল্যাপটপ খুলে নিজের কাজে মন দিতে ব্যস্ত হল, 'কিছু ঝামেলা রয়েই যাচ্ছে । আপনারা প্লিজ আমার কথা ভেবে আড়ষ্ট হয়ে থাকবেন না। কেবল এই ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোবেন না, ব্যাস!' বাইরে পাহারায় থাকা পুলিসটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল এখান থেকেই,'চাইলেও ওরাই দেবে না বেরোতে।'

'আপনার লিভিং রুমে নিশ্চয় অসুবিধে হবে খুব।'

'একটুও না।'

'কিছু দরকার হলে প্লিজ ডাকবেন। পাশের ঘরেই রইলাম।'

'দরজা বন্ধ করবেন না!' অচিরার মৃত্যুর দিনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয়বার কোনো চান্স নেবার মানে হয় না।

একা হতেই ওর মাথায় কাজ করতে থাকল কী কী ভাবে শ্রেষ্ঠাকে কব্জা করার চেষ্টা হতে পারে। মোটামুটি নিশ্চিত ছিল তাকে লড়তে হচ্ছে খুব চতুর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। নিশ্চয় প্রতিপক্ষ তাকে বোকা বানাবার সব সুযোগই নেবে। এ হল শুদ্ধুমাত্র বুদ্ধির খেলা। পুলিসের এখানে কোনো ভূমিকাই থাকতে পারে না। মোটিভ যা-ই হোক, খুনের পদ্ধতি তাদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবেই। তার একমাত্র কাজ

যেভাবে হোক ঘাতককে ফাঁদে ফেলা। কিন্তু হাতে একটিও ক্লু না নিয়ে কীভাবে... মাথায় আসছিল না কী করা যায়। এর সঙ্গে টক্কর দিতে হলে বিজ্ঞান, শিল্প, চিকিৎসাশাস্ত্র সব বিষয়েই জ্ঞান থাকতে হবে। আগের খুনগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু যদিও পুরো আততায়ীর হাতের মধ্যে ছিল না তবু সে তাদের বলে-বলে কব্জা করেছে। সেই জন্যেই ব্যাপারটা এত টানটান হয়েছিল। ওইসব খুনে খুনি কিন্তু সরাসরি শিকারের ত্রিসীমানাতেও ছিল না। অথচ অনায়াসেই ঘটনাগুলো ঘটানো হয়েছে।

রাতের খাবারের সময় সে টেক-অ্যাওয়ে থেকে দুজনের খাবার আনাল, কেবল শ্রেষ্ঠাকে বাদ দিল। তাকে কোনো বাইরের খাবার দেওয়া যাবে না। ফ্রিজে যা আছে তা-ই দিয়েই আজকের মতো ওকে চালিয়ে নিতে বলতে হবে। বাইরে আস্তে আস্তে বিকেলটা সন্ধেয় মিশে যাচ্ছিল। সাতটা বেজে যেতেই সুমিত হাঁফ ছাড়ল। যাক, এটা অন্তত বাঁচানো গেল। এবারকার হিসেব অনুযায়ী শিকার পুরুষ না হয়ে শ্রেষ্ঠা হওয়ায় সন্দেহ ছিল। সেটাই জয়ী হল!

'যা-তা কাটল দিনটা।' অমৃতা বলল।

বেরোবার আগে নিজের ল্যাপটপ গোছাচ্ছিল সুমিত। বলল,'পরে হাত কামড়ানোর চেয়ে আগেই সাবধান হতে দোষ কী!'

'ওরকম বিচিত্র ফন্টে টেক্সটটা আসার পরেই পুলিসের ভাবা উচিত ছিল ব্যাপারটাই ধাপ্পা! নিশ্চয় বাচ্চাদের ফালতু ইয়ার্কি।' অমৃতা গজগজ করছিল।

সুমিত বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত ছিল। আয়ুষীর কাছে ফিরতে হবে। পুলিসের কী করা উচিত ছিল কী করা উচিত ছিল না এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছিল না। আসল কথা মেয়েটা নিরাপদে আছে। দেখা যাক এবার কী হয়! জীবন, বেঁচে থাকা এসবের যে মূল্য কী আর কতখানি তা মানুষ পুরোটা কি বোঝে, না বুঝতে চায়!

***

বিকেলটা সন্ধের কোলে ঢলে পড়ছে। প্রফেসর ঈশিতা ভট্টাচার্য বলরাম ঘোষ স্ট্রিট ধরে নিজেদের পুরনো বাড়িটার দিকে হাঁটছিল। পুরনো এলাকায় বাড়ি, ফলে গাড়ি রাখাটা বেজায় ঝামেলা। নেমে যেতেই ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে রাস্তার শেষ প্রান্তে ভাড়া গ্যারেজের দিকে চলে গেছে। এই শেষ চল্লিশে এসে প্রেসিডেন্সিতে সারা দিন খাটা খাটনির পর এই হাঁটাটুকু ওকে স্বস্তি দেয়। মাঝেমধ্যে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় অব্দি হেঁটে চলে যায়। মোড়ের প্রিয় দোকান থেকে বেনারসী পান খেয়ে মনে করলে রিকশা নিয়ে ফেরে। আজও তেমনই একটা দিন।

স্বামী মনোজিৎ বিশ্বভারতীতে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ায়। মাঝেমধ্যে বুধবার, সপ্তাহশেষের ছুটিতে কলকাতায় আসে। বয়স বাড়ছে বলে নিয়মিত যাতায়াত আর করতে পারে না। ছেলে বাপ্পা পড়াশোনা করে বাঙ্গালোরে, ছুটিতে বাবা-মার কাছে বাড়ি আসে। পরিবার যেহেতু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, ঈশিতার হাতে বিকেলের দিকে অনেকটা সময় থাকে। কখনো সখনো এক্সটারনাল এক্সামিনার হিসেবে অন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ডাক পায়। তখন অন্য শহরে পাড়ি দিতে হয়। খুব একঘেয়ে হয়ে গেলে শান্তিনিকেতনের অ্যান্ড্রুজ পল্লিতে তার অমতেই কেনা মনোজিতের বাড়িতে ঘুরে আসা। চেয়েছিল নিউ টাউনে যেসব সাজানো গোছানো বাড়ি উঠছে সেখানেই যেতে। পুরনো বাড়িটা এখানে ওখানে ভেঙেও পড়ছে। সারাতে মাসের টাকার বড় অংশই বেরিয়ে যায়। তবে মধ্যে মধ্যে বাপ্পার কাছে গিয়ে ঘুরে আসাটাই যা একটু রুটিনের বাইরে বেরোনো।

বাড়ি ফিরে আগে স্নানটা সেরে নেয় ঈশিতা। এটাই রোজকার অভ্যাস। ঢোকার সময় করিডর ব্যবহার করতে হয়। এবাড়িতে আরো কিছু বাসিন্দা আছে, যাদের জন্যে খুব একটা স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে না। যোধপুর পার্কে বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের পর এই বাড়িতে এসে সুনামি আছড়ে পড়েছিল। যত দিন গেছে নিঃস্পৃহতার সঙ্গেই অনেকখানি সামলে নিয়েছে। বাড়ি যেমনই হোক মনোজিৎই তো আসল লোক।

মানাতে তো হয়ই। যদি শান্তিনিকেতন ভিলা নিয়ে অমন উঠেপড়ে না লাগত তাহলে এতদিনে ঈশিতা জমানো টাকাতেই নিউ টাউনে একটা আস্তানা ঠিক বাগিয়ে ফেলত। তাহলে অন্যের সঙ্গে বাথরুম শেয়ার করা বা ভাড়া করা গ্যারেজের দ্বারস্থ হতে হত না। যতই ছড়ানো হোক তাদের পরিবারটা যথেষ্টই গোছানো।

স্নানটা সেরে আরাম করে সে এসে বসল টিভির সামনে। খবরটা দেখে নেওয়া যাক। একঘেয়ে সে-ই রাজনৈতিক হট্টগোল বাদে আর নতুন কিছ চোখে পড়ল না।

'এবার উইক এন্ডে যাওয়া হয়ে উঠল না!' মনোজিতের ফোন এল,'এত কাজ জমে আছে...'

'আমিই চলে যাব? যাব নাকি, বলো...'

'আগামী হপ্তার মধ্যিখানেই তো যাব। আই আই এম-এ লেকচারটা আছে! কয়েকটা দিন। আসছি তো !'

'বেশ। বাড়িতে কয়েকটা কাজ করিয়ে নিতে হবে! তুমি থাকলে সহজে...'

'সব হবে! দেখি, যদি সময় বার করতে পারি।'

শ্রেষ্ঠার কিছু না হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল সুমিত। লালবাজারে পত্রনবীশের সঙ্গে আরেক প্রস্থ বকবক করতে হল। সে যাই হোক, আরেকটা প্রাণ যে বলি গেল না এতেই হাঁফ ছেড়ে বাড়ির পথ ধরল।

'হল কী?' আয়ুষী জানতে চাইল।

'কী আবার? যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই। ব্যাটারা ভাবছে আমি গপ্পো বানাচ্ছি।' সুমিত বিরক্ত হচ্ছিল।

'লোকগুলোকে নিয়ে পারা যায় না! মেয়েটা মারা গেলেই বুঝি ওরা খুশি হত?' আয়ুষীর স্বরেও বিরক্তি ধরা যাচ্ছিল।

'কী করবে বলো! পুলিস এভাবেই কাজ করে ---'

সুমিতের মনে পড়ে যাচ্ছিল বিকেলে পত্রনবীশের সঙ্গে কথাবার্তা।

'আপনার কথামতো ফালতু মেয়েটাকে গার্ড করতে গিয়ে হ্যাপা পোয়াতে হল পুলিসকে। নম্বরটা চেকও করা হয়েছে। ওই নম্বরটার কোনো অস্তিত্বই নেই। ফেক।' ডিসিডিডি রীতিমতো বিরক্ত হয়েছিলেন।

'এটা মোটেই সাজানো গপ্পো নয়। যা বলেছি সবটাই সত্যি। বলতে পারব না মেয়েটা বেঁচে গেল কীভাবে। অবশ্য যে প্যাটার্নে খুনগুলো হয়েছে এটা তার সঙ্গে ঠিক যাচ্ছিলও না। কিন্তু...'

'খুনের প্যাটার্ন? মানে?' পত্রনবীশ কৌতূহলী দৃষ্টি ছুঁড়লেন।

'একটা প্যাটার্ন তো আছেই। লক্ষ্য করুন খুনগুলো হয়েছে অল্টারনেটভাবে। মানে মহিলা, পুরুষ, আবার মহিলা তারপর ফের পুরুষ... যেহেতু আগের মৃত্যুটা হয়েছে সল্টলেকের ওই মহিলার, সেই ব্লুপ্রিন্ট অনুযায়ীই এবার মহিলার প্রাণ যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু মেসেজে ওই নামটাই এসেছিল, তাই...'

'যেহেতু প্রফেসরি করেন, আপনার কাছ থেকে আরেকটু বুদ্ধি অন্তত আশা করেছিলাম। এই লাইনে অনেক দিন তো হল, বাপের জন্মে শুনিনি কোনো সিরিয়াল কিলার উড বি ভিক্টিমের নাম আগে থেকে বলে খুন করে! ওরকম কোনো প্যাটার্নেরও ধার ধারে বলে শুনিনি। স্ট্যাটিস্টিক্সের থিওরি এক জিনিস আর পুলিসের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

'আপনি না মানতেই পারেন; না মানলে শহরে কিন্তু এরকম খুন ঘটতেই থাকবে। তখন...'

'ওরকম হাজারটা খুন হপ্তায় শহরে হচ্ছে! যেহেতু আপনি এসে একটা সূত্রের কথা বললেন তাই আমরাও... আপনাকে বেনিফিট অব ডাউটও দেওয়া হয়েছিল। সাফ বলে দিচ্ছি, ওসব থিওরি আপনার কাছেই রাখুন। এরকম হতেও-পারে-খুনখারাপির পেছনে ভবিষ্যতে পুলিসকে হ্যারাস করবেন না। আমাদের হাতে যে সব কেস আছে তা-ই বলে সলভ করে উঠতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি, তার ওপর আবার... যত্তোসব...'

'ব্যাপারটাকে যদি এভাবে দ্যাখেন তাহলে অবিশ্যি বলার কিছু থাকে না...'

'আমরা ঠিক তখনই মাথা ঘামাব যখন ঘটনাটা ঘটে গেছে। আগে নয়, বুঝলেন?' পত্রনবীশ বিরক্তি লুকোচ্ছিলেন না। ঢের কাজ জমে আছে। পাগলা প্রফেসরকে নিয়ে পড়ে থাকলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি, 'নেহাত আপনার সামাজিক পজিশনের জন্যে কিছু বলা যাচ্ছে না। এইসব মনগড়া গপ্পো নিয়ে আর আমাদের সময় নষ্ট করবেন না প্লিজ!'

এই তাহলে আইনের লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গি! সুমিতের হাল ছেড়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করছিল। খুনের আগে থেকে সাবধান করা হলেও আইনের চোখে তা নিয়ে কিচ্ছু করার নেই। সে এমন কাউকে খুঁজছিল যার কাছ থেকে কোনো বুদ্ধি পাওয়া যেতে পারে।

'ওরা হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এবার যদি এরকম কিছু হুমকি-টুমকি আসেও নিজেকেই যা করার করতে হবে...' আয়ুষীর দিকে তাকাল,'চা-টা একটু দ্যাখো না...'

আয়ুষী রান্নাঘরে উধাও হয়ে গেল। সুমিত ফোনটার দিকে তাকিয়ে বসে ভাবছিল সিম বদলে ফেললে কিছু সুবিধে হতে পারে কিনা। কিন্তু কতদিন ধরে এটা ব্যবহার করছে ! সবাই তো এই নম্বরটাই জানে। এখন নম্বর বদলালে কাজের লোকেরাও অসুবিধেয় পড়বে।

দোনামোনা করতে করতে ও ঈশিতাকে ফোন করল,'ফ্রি আছো? আসতে পারি?'

'হ্যাঁ, চলে এসো। ভালোই হয়।'

'একটু দেরি হতে পারে কিন্তু!'

'কী সমস্যা? ইন্সুলিন নিতে হয় তো, তাই ডিনারটা খেয়ে নিতে হয় তাড়াতাড়ি। চলে এসো না, এখানেই না হয়...'

'না, তুমি সেরে নাও। বেরোবার আগে আমিও বরং ডিনার সেরে নিচ্ছি।'

রাত নটা নাগাদ সুমিত ঈশিতাদের বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ির কাছে এসে গাড়ি পার্ক করল। ঈশিতার ঘরে ঢুকেই দেখল ঈশিতা অসুস্থ। ঘুমঘুম চোখে তাকিয়ে শুয়ে। বমি করেছে। হাঁপাচ্ছিল। সুমিত ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার দুটো চোখ ঘুরে গেল। মনে হল চোখের সামনে কিছু বুঝি পরিষ্কার দেখতেও পাচ্ছে না বেচারি। সুমিতকে চিনতে না পারলেও সামনে একটা অবয়ব এগিয়ে আসছে দেখে অদ্ভুত গলায় সে জিজ্ঞেস করল,'কে... কে ওখানে...'

'সুমিত, সুমিত দাস।'

'কে?' চিনতেই পারল না ঈশিতা, চেনার চেষ্টা করতে করতেই বলে উঠল,'তোমায় চিনি না... কে তুমি ? কে ?'

সুমিত কী করবে ভেবে না পেয়ে পিছিয়ে এল। এক্ষুনি ডাক্তার চাই একজন। নইলে... অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে যাবে এমন সময়ে একটা টেক্সট ঢুকল,'দেরি হয়ে গেছে। ও বাঁচবে না। সৎকারের ব্যবস্থা করো।' কে পাঠাল সেটা ভাবার সময় নিল না। অ্যাম্বুলেন্স ডাকল। ফোনটা যখন করছে ঈশিতা ততক্ষণে মাটিতে পড়ে গেছে। সুমিত তাকে তুলে বহুকষ্টে ফের বিছানায় শোয়াল। শোয়াবার সময়েই ওর মুখ থেকে পুদিনার মিষ্টি গন্ধ পেল। ঝট করে মনে হল বেনারসি পানের গন্ধের মতো। ঈশিতা কি রোজ পান খায়? দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক নয়!

অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে অপেক্ষা করার ফাঁকে মনোজিৎকে ফোন করল,'ঈশিতা খুব অসুস্থ। অ্যাপোলো থেকে অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছি। আসছে। এখুনি এলে ভালো হয়...'

'কে?' ঈশিতার ফোন থেকে পুরুষের গলা পেয়ে মনোজিৎ অবাক।

'সুমিত, প্রফেসর সুমিত দাস। এখুনি আসতে হবে...'

'কেন? কী হয়েছে?'

'কী করে বলব! এসেই দেখি এই অবস্থা। খুবই অসুস্থ। কোল্যাপ্স করছে। তাড়াতাড়ি এলে ভালো হয়।' কথা না বাড়িয়ে ফোনটা কাটল।

মনোজিতের সঙ্গে ফালতু সময় নষ্ট না করে ঈশিতাকে সুস্থ করা দরকার। অ্যাপোলো থেকে যখন অ্যাম্বুলেন্স এল ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ঈশিতার চোখের তারা স্থির। এমারজেন্সিতে এনে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা হল, ' ব্রট-ইন ডেড।'

টের পাচ্ছিল ফের ফাঁসল। এখন মনোজিৎ আর পুলিসের হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। ঝামেলা যেন তাকে পেছুপেছু তাড়া করেছে। ভাবছিল আয়ুষীকে নিয়ে কীভাবে যে সিকিমে কেটে পড়া যায়! মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে মনোজিতের মুখোমুখি হবার জন্যে তৈরি হল।

***

অর্চনার মৃত্যুর ঘটনাটাকে বাকি ঘটনাগুলোর সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না। মহিলার অটপ্সি রিপোর্টটা নিয়ে বসেছিল শুভঙ্কর। রিপোর্ট বলছে অর্চনার মৃত্যু হয়েছে হাইড্রাজাইনে শ্বাসরোধের জন্যে। চৌবে যোগেশকে ধরেছে। যোগেশের মতো লোকের পক্ষে অর্চনাকে সরাবার জন্যে হাইড্রাজাইন ব্যবহার করা কি সত্যিই সম্ভব? প্রমাণ করা যাবে? এই কর্মের জন্যে যে কেমিস্ট্রির জ্ঞান দরকার তা কি যোগেশের আছে? বিকাশ উঠে পড়ে লেগেছে কেসটা ধামাচাপা দিতে। করা যাবে কি?

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক এখনকার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এটা ঠিক, এবং অনেক সময় এ থেকে খুন-খারাপির দিকেও গড়িয়ে যেতে পারে। যায়ও। সে অবিশ্যি নিজে নিশ্চিত নয় যে অর্চনা খুনই হয়েছে। হতেই পারে ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট। তাই যদি হয় সে কোত্থেকে হাইড্রাজাইন পেতে পারে?

ভেবেচিন্তে প্রতিবেশী সায়েন্স কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ডাঃ ভাস্কর বোসের শরণাপন্ন হল।

'ঘটনাস্থলের চেহারাটা কী?' প্রফেসর বোস চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন।

'বডিটা পাওয়া গেছিল টয়লেটের মধ্যে। চারদিকে অ্যামোনিয়ার গন্ধ...'

'কোথাও অ্যামোনিয়ার বোতল ছিল?'

'না! বাথরুমে যা যা থাকার কথা তা-ই... সাবান, হারপিক, ক্লোরোক্স এইসবই ছিল।'

'নিশ্চয় ভুল করে হারপিকের সঙ্গে ক্লোরোক্স মিশিয়ে ফেলা হয়েছিল। হারপিকে হেক্সাডেসিট্রাইমিথাইল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থাকে, যাতে অ্যামোনিয়া আছে, যা এক ধরনের টক্সিক ক্লোরামাইন ভেপার জেনারেট করে। যথেষ্ট পরিমাণে হাইড্রাজাইন তৈরি হয়ে শ্বাসরোধ ঘটতেই পারে।'

'মৃত্যুটা কি তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে?'

'হতেই পারে। হয়ত উনি আচমকাই দুটো জিনিস ভুল করে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। বাড়িতে ব্যবহারের জিনিসগুলো এরকম মিশে গেলে কিন্তু খুবই টক্সিক হতে পারে...'

অর্চনার মৃত্যুর ঘটনাটা আকস্মিক হতেই পারে জেনে, শুভঙ্করের যোগেশের জন্যে খারাপই লাগছিল। তার ওপরই এখন ভার যোগেশকে নির্দোষ প্রমাণ করার। ঠিক করে ফেলল চৌবে যখন কোর্টে যোগেশকে তুলে পুলিস কাস্টডিতে রাখার আবেদন করবে সে নিজেও সেখানে হাজির থাকবে।

প্রফেসর বোসের কাছ থেকে যা জেনেছে জানাল। যোগেশের মুক্তিতে বিকাশের রাগ হলেও কিছু করার ছিল না। এর মানে হল আরো তথ্য খুঁজতে হবে, সোহিনীর সঙ্গে হেসেখেলে সময় কাটানোও সম্ভব হবে না।

পোস্টিংটা ওর কাছে দেবতার আশীর্বাদই ছিল। এখানে বড়লোক চারপাশে গিজগিজ করছে। এদের কাছ থেকে গণ্ডগোলের কাজের জন্যে মাশুল তোলো, কেবল তুলেই যাও। এর মধ্যে কোত্থেকে যে এই ঝুটঝামেলা হাজির হল! কেনই বা শুভঙ্কর এসে হাজির হল বিদঘুটে এক তথ্য নিয়ে! সে যদি না বাগড়া দিত তাহলে অ্যাদ্দিনে বিকাশ কেসটা চাপা দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতেই পারত। সোহিনীর সঙ্গে তার মাখামাখিটাও বাইরে বেরিয়ে যাবে এমন আশঙ্কা থাকত না। সোহিনীকে কোন শালা ওইসব টেক্সট পাঠাচ্ছে

তার নাম আর পরিচয় জানতে তার আগ্রহ প্রবল। ওটা বার না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। মনে পড়ল সুমিতের ফোনে এমন কিছু ছিল যা এরকম আকস্মিকতার থিওরির সঙ্গে যায় না।

ডাবল চেক করার জন্যেই সে সুমিতকে ফোন করল 'কেন করতে যাব! যাকে চিনিই না তাকে ফালতু কেনই বা ফোন করতে যাব? আপনারা তো আমার কথায় পাত্তাই দেননি। দেন না। ফালতু ফোন করে ডিস্টার্ব করবেন না প্লিজ...' সে রেগেই গেল।

ঘটনাটাকে অ্যাক্সিডেন্ট ধরে নিয়ে শুভঙ্কর অর্চনার কেসটা গুটিয়ে ফেলল। একগাদা কেস পেন্ডিং পড়ে আছে, ফলে ফালতু সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কখনো কখনো তুচ্ছ কিছুর দিকে নজর না দিয়ে মানুষ বিপদ ডেকে আনে।

***

ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে বিরিয়েই যোগেশ আইরিনের ফোন পেল, 'দেখা করা যায়?'

'নিশ্চয়। ব্যাঙ্কশাল থেকে এইমাত্র বেরোলাম।'

'তাহলে ক্যালক্যাটা ক্লাবে, না কি?' আইরিন বলল।

'আধঘন্টা বাদে। ক্রিস্টাল রুম।'

আইরিন যোগেশের আগেই পৌছে যাবে। যোগেশ দাঁড়িয়ে থাকল উবেরের জন্যে।

সোফায় শরীর ঢেলে দিয়ে হাঁফ ছাড়ল যোগেশ,'ডাবল হুইস্কি অন দ্য রকস। জঘন্য একটা উইকএন্ড গেল। অবশেষে ফ্...'

আইরিন ভদকা উইথ লাইমে চুমুক দিল'তোমায় যে ছাড়ল এটাই অনেক!'

'উপায় ছিল না। কোনো কংক্রিট প্রমাণ তো নেই। বিধাননগর ও সি-ই দেখলাম খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে এসব হাবিজাবির জবাব দিলেন। আমার কপাল, এখন বলো কীভাবে তোমায় সাহায্য করতে পারি?'

'জানি না কাকে বলব। খুব চিন্তায় আছি! পুলিসে গেলে হয়ত হয়, যেতে মন চাইছে না। ঝামেলাটা তো রয়েছেই।'

'কী হয়েছে বলোই না।' যোগেশ তাকাল।

'রোনাল্ডোকে নিয়েই। এখানকার প্রোমোটারদের মাথা এক ড্রাগ টাইকুনের সঙ্গে ওর কিছু একটা চলছিল। বিবেক সিঙ্ঘানিয়া। যখনই কোনো কনসার্টে যেত ও বোধহয় মিউজিক্যাল ট্রুপের আড়ালে ড্রাগ-ট্রাগ কিছু একটা স্মাগল করত। খুব সন্দেহ হচ্ছে ওর মৃত্যুটা মনে হয় অ্যাক্সিডেন্ট নয়। বিবেকই দায়ী।'

'কেন?'

'ওর বেশ কিছু ফিশি ব্যাপার ইদানিং আমার নজরে পড়ছিল।'

'রোনাল্ডোর উল্টোদিকে কে কে ছিল?'

'ঠিক বলতে পারছি না। কখনো কার সঙ্গে কী ডিলে যাচ্ছে বলত না! প্রাণ দিয়ে মিউজিক ভালোবাসত। বিবেকই ওর বাইরে যাওয়া বা দেশের মধ্যে প্রোগ্রাম স্পনসর করত। কেউ তো আর শুধুমুধু করবে না! নিশ্চয় নেক্সাসটায় ঢুকে গেছিল।'

'পুলিসকে বলছ না কেন?'

'আমায় কে বিশ্বাস করবে? বিবেক বিগ শট। ওর হাতে অনেক টাকা, ঢের মাসল পাওয়ারও। এসব নিয়ে নাড়াচাড়া হলেই ও আমাকেও খুন করবে। করবেই। মনে হয় ও বোধহয় বেশি লোভ করে ফেলেছিল বা ওইরকম কিছু...'

'শেষ অব্দি পুলিস কী বলল?'

'কী আবার বলবে! অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথই। ওদের থিওরি ইলেক্ট্রোকিউশনের জন্যেই ঘটেছে। যদি ওরা ওর সঙ্গে ড্রাগ স্মাগলের সম্পর্কটা জানতে পারে তাহলে ওর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হতে পারে।'

'তাহলে নাড়াচাড়া না করাই ভালো। এসব কজন জানে?'

'দলের হাতে গোনা দু-একজন বাদে কেউ না।'

'যেমন চলছে চলতে দাও। খুব নাড়াচাড়া না হলে ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গোটা ব্যাপারটায় ইতি পড়ে যাবে।' যোগেশ মশালা চিপস চিবোতে চিবোতে হুইস্কিতে চুমুক দিল।

'হয়ত। কিন্তু রোনাল্ডো ওদের হাতে এইভাবে মারা যাবে এটাও তো মানতে পারছি না। আচ্ছা, ওদের নেক্সট টার্গেট কি আমিও হতে পারি?'

'পারো, যদি মুখ বন্ধ না রাখো। এক্সপোজ হয়ে যাবার ভয় আছে না? তবে যদি ওর গায়ে না হাত পড়ে তাহলে ও অত কিছু কেয়ার করবে বলে মনে হয় না। রোনাল্ডো নেই, ফিরবেও না। ফলে, তোমার নিরাপত্তাই এখন আসল। ফালতু বিষয়টাকে না টানাই ভালো। আর টেনে তো কিছু হবেও না। যদি সেরকম কিছু থেকেও থাকে, দেখবে সোর্স খাটিয়ে ও এনকোয়ারিটাই বন্ধ করিয়ে দেবে।'

'তুমি যা বলছ সেটাই ঘটনা।'আইরিনকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

'আমি নিজেও কম ঝামেলায় নেই। প্রিয়াঙ্কার মৃত্যুটা আমার কাছে রীতিমতো শক। অর্চনাও নেই। ওরা ভাবছে এর পেছনে আমার হাত আছে। ওদের যে বিশ্বাস করাব বিষয়টা অমন নয় তার জন্যে কোনো কিছুই আমার হাতে নেই। এই দুটো মৃত্যুর পেছনে সত্যিই আমার কোনো হাত নেই।' যোগেশকে হতচকিত দেখাল।

'পরিচিতদের মধ্যে গুচ্ছের লোক কীভাবে মরে যাচ্ছে বলো তো!' আইরিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তার অতীতও যে খুব সুবিধের তা নয়। প্লেন ক্র্যাশে বাপ-মাকে হারানোর পর বড় হয়েছে ঠাকুমা ডরোথি ডি'ক্রুজের কাছে। ডরোথিও শেষ দিকটায় বয়েস আর অ্যালঝেইমারসের জন্যে তার ওপর খুব নজর রাখতে পারতেন না। কিড স্ট্রিটের বাড়িটার রক্ষণাবেক্ষণও মুশকিল হয়ে পড়ছিল। তার মধ্যেই রোনাল্ডোর সঙ্গে ডেটিং-এ গেছে। অসুস্থ ঠাকুমাকে দেখার দরকার বোধ করেনি। রেকলেস জীবনযাত্রার স্টাইল বজায় রেখেছে। একমাত্র আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে ঠাকুমা নাতনিকে উইলে প্রবেট করে গেছে সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসেবে।

অনলাইন শপ থেকে কুঁচ ফলের বীজ কিনে এনেছে, যা বাজারে মেলে ন্যাচার‍্যাল রক্তগুঞ্জা নামে - এটা জেনেই যে, ওতে আবরাস প্রেকাটোরিয়াস টক্সিন রয়েছে। ঠাকুমার খাবারে মেশাতে শুরু করেছে। একদিন পরিমাণ মাত্রা ছাড়ানোয় যা হবার তা-ই হয়। শেষে রক্ত আমাশা আর নার্ভের ওপর টক্সিসিটির চাপে বুড়ির কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যায়।

ঠাকুমা মরার পর আইরিনের ভাগ্য খুলে যায়। হাতে তখন অনেক টাকা। চটপট কিড স্ট্রিটের বাড়িটা বেচে ফ্ল্যাট কিনে উঠে আসে সানি পার্কে। রোনাল্ডোকে বিয়ে করতে উঠে পড়ে লাগে। ডাক্তাররা ঠাকুমার মৃত্যুটাকে স্বাভাবিকই বলেছিল। ঠাকুমার প্রিয় ঝি অবশ্য পেছনের ঘটনাটা নিয়ে কানাঘুষো ছড়িয়েছিল। প্রমাদ গণল আইরিন। তারপর অবিশ্যি কোনো ক্রমে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া যায়। আইরিনের আতঙ্ক - খোঁচাখুঁচি করতে গেলে শেষে বিবেক যদি খেপে গিয়ে তার পুরনো ইতিহাস টেনে বার করে!

'তুমি কি সত্যিই মনে করছ যে, কোনো ড্রাগ ব্যারনের হাত আছে রোনাল্ডোর ঘটনাটার পেছনে?' যোগেশ জিগ্যেস করল।

'মনে তো হচ্ছে।'

'মনে হলেই তুমি তো কাউকে খুনের কেসে জড়াতে পারো না।'

'ভালোই জানি।'

যদিও নিশ্চিত নয় যে রোনাল্ডোর কেসটা খুন কিনা, তাই বলল 'ছেড়ে দাও। ঘাঁটিও না।'

ফেরার পথে আইরিনের ধান্দাটা কী তা-ই নিয়ে ভাবছিল! ও কি বিবেক সিংঘানিয়ার গপ্পো বলে ভুলে থাকতে চাইছে? যা পারে করুক, তার নিজের ঘাড়ে এখন চিন্তা কম নয়। একে প্রিয়াঙ্কার অবৈধ সম্পর্ক,

তার ওপর অর্চনার মৃত্যু, নিজের আটক হওয়া - ভাবনার কারণ কি কম নাকি? এর মধ্যে এটাকে টেনে আর বাড়তি বোঝা চায় না। যদিও মনে হচ্ছে আইরিন সত্যি কথা বলছে না। অনেক সময়েই আসল সত্যিটাকে মানুষ চায় মিথ্যে দিয়ে চাপা দিতে। আইরিনের ব্যাপারটাকেও তার মধ্যেই ধরছিল এখন।

***

আরেকখানা ব্যস্ত দিন কাটল। সারাদিন নানানরকম অ্যাকাডেমিক বিষয়ে জড়িয়ে থাকায় আজ স্ট্যাটিস্টিক্স বাদে আর অন্য কোনো দিকে মাথা দেবারই ফুরসৎ পায়নি সুমিত। আয়ুষী নিজের বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে। একা বসে ঘটনাগুলো ভাবতে চেষ্টা করছিল। মাথা যাতে কাজ করে তার জন্যে একটা ডাবল জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল সামনেই গ্লাসে টলটল করছে।

নিজের বিষয়ে টপার বলতে যা বোঝায় সুমিত তাই। গোটা অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারেই সে থেকেছে উপরে। জে বি এন এস এস স্কলার, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট থেকে এম স্ট্যাট করে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে পিএইচডি করতে চলে যায় ক্যান্টারবেরি, কেন্ট ইউনিভার্সিটিতে। ফিরে এসে নিজের শিক্ষালয়েই যোগ দিয়েছে।

লালবাজারে পুলিসের কাছে ব্যাপারটা নিয়ে কোনো সাহায্য না পেয়ে এখন সে নিজেই ভেবে চলেছে ব্যাপারটা নিয়ে। মনোজিতের কাছ থেকে জানা গেছে ঈশিতার অটপ্সি রিপোর্ট অনুযায়ী তার মৃত্যু হয়েছে স্যালিসাইলিজিমের জন্যে মিথাইল স্যালিসাইলেটের ওভারডোজেই। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ওকে একবার ফোন করলে কিছু সামাল দেওয়া যেত। গুগলে গিয়ে দেখেছে এই মাত্রার বিষের জন্যে অ্যাসপিরিনের ৬৪ খানা ৩২৫ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দরকার হয়। কী এমন হল যে, ওইটুকু সময়ের মধ্যে ৬৪টা ট্যাবলেট খেয়ে ফেলল? আর এক হয় যদি কোনো খাবারে ওই ডোজের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে! সম্ভবত তার সঙ্গে কথা হবার পরেই যা হবার হয়েছে।

চেষ্টা করছিল গোটা ছবিটাকে মাথার মধ্যে পরিষ্কার করে নিতে। যে খুনগুলো হয়েছে, তাদের প্যাটার্ন যাই হোক না কেন, এমন সব মানুষ এর ভেতর আছে যাদের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে কালপ্রিটও নিশ্চয় এদের সঙ্গেই কোনোভাবে জড়িত। তার হাতে যদি এই সারকিটের সকলের ডিটেল থাকে তাহলে হয়ত কিছু সূত্র মিলতেও পারে। সে বিকাশ বা শুভঙ্করের কাছ থেকে তাদের তদন্তের হদিশ চাইতেই পারে। সহজে দেবে না। দেবার কথাও নয়। কিন্তু চাওয়া যেতেই পারে। যদি পত্রনবীশ জানতে পারেন তাহলে ঝামেলায় পড়বে। শ্রেষ্ঠাই বা কেন বেঁচে গেল! ও কি এমন কিছু জানে যাতে ওকে মারাটা সমস্যা? তাহলে তো শ্রেষ্ঠাই সাসপেক্টদের তালিকায় একদম ওপরে।

'আপনার সাহায্য দরকার...'

চৌবে তখন সবে সোহিনীর সঙ্গে সঙ্গম সেরে বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে,'কে?' সুমিতের গলা চিনতে পারেনি।

'সুমিত, প্রফেসর সুমিত দাস।'

'কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'একবার দেখা করা যায়?'

'থানায় চলে আসুন। পাঁচটার পর।'

বোসপুকুরের ফ্ল্যাটে বৈকালিক বিনোদনের পর চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল। পরণে সুতির ব্রা আর প্যান্টি, সোহিনী কখন কিচেনে হাওয়া, শঙ্কিত... আবার না একটা মেসেজ আসে!

পাঁচটার পরে গাড়ি নিয়ে বালিগঞ্জ থানায় সুমিত হাজির হল।

'বলুন, কী জানতে চান...' চৌবে সিধে আসল কথায় এসে গেল।

'প্রিয়াঙ্কা আর রোনাল্ডোর কেসের তদন্ত রিপোর্ট।'

'কেন?' চৌবে সাবধান হচ্ছিল।

'ডিসিডিডি অলরেডি এসব কেস নিয়ে চিন্তিত। খুনিকে সনাক্ত করা...'

'ভাবছেন আপনি পারবেন?' বিকাশের যত মনে পড়ে যাচ্ছিল হোয়াটস অ্যাপের মেসেজগুলো তত আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

'আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। লোকগুলো কিন্তু আমায় হয় কল করেছে নয় টেক্সট করেছে। কখনো মহিলা কখনো পুরুষ। গোটা ছবিটা পরিষ্কার করতে হবে। এর পেছনে কে বা কারা...'

'কিন্তু আপনাকে কেন?' চৌবে কৌতূহলী।

'কী করে বলব? প্রোব্যাবলি ধাঁধার খেলা। মোটিভ জানলে ধরে ফেলতেও পারি। যারা মারা গেছে সবাই একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। গিঁটটা বোধহয় এর মধ্যেই কোথাও। যেহেতু পুরুষ মহিলা দু-ই মারা পড়ছে, বিষয়টা আরো বেশি জটিল হয়ে গেছে...'

বিকাশ বুঝতে পারছিল পত্রনবীশের সমস্যাটা কোথায়। স্রেফ অহঙ্কারই তাঁকে বাস্তবটাকে বুঝতে দ্যায়নি। আর যেহেতু সে আইপিএস নয়, মাটিতে পা দিয়ে চলতে পারে। ওর যদি সুমিতের মতো বুদ্ধি থাকত তাহলে কোনো ভালো চাকরি করত। এসব গুন্ডা বদমাশদের নিয়ে নয়। যে ঝঞ্ঝাটে পড়েছে সে যদি কোনোক্রমে তা থেকে বেরোতে না পারে তাহলে তাকেও...

'এখন ডিউটিতে। আজ নয়, কাল বরং আপনার বাড়িতে যাব। কখন সুবিধে?'

'সন্ধে সাতটা নাগাদ। ড্রিঙ্কস নিয়ে বসে কথা হবে।' গ্লেন এডোয়ার্ডস নিয়ে না বসলে মাথা খোলে?

বিকাশ এল সাড়ে সাতটা নাগাদ। টুকটাক দু-একটা কথার পর সুমিত সরাসরি কাজের কথায় এল'আপনার তদন্তে পাওয়া তথ্যগুলো পেলে সুবিধে হয়...'

চৌবে নিজের কথা বলতে শুরু করায় সুমিত নাম আর কন্ট্যাক্ট ডিটেলসগুলো লিখে নিতে লাগল। এদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া গেলে কিছু সূত্র বার হলেও হতে পারে। গ্লেন এডোয়ার্ডস কাজ করতে শুরু করেছিল।

বিকাশ তাকাল,'যথেষ্ট হয়েছে! আপনি এই জট খুলতে পারবেন?'

'জানি না। আমার যুক্তিতে কোথাও পৌঁছনো গেলেও যেতে পারে। যদি একসঙ্গে কাজ করা যায় তাহলে হয়ত কিছু হতেও পারে...'

বিকাশেরও মনে হচ্ছিল সুমিতের সাহায্য নিলে বাঁধাধরা তদন্তের বাইরে কিছু হলেও হতে পারে। কোনো আইপিএস-এর সাহায্য ছাড়াই যদি কেসটার সমাধান করে ফেলা সম্ভব হয় তাহলে তো এসি-র পোস্টে প্রোমোশন বাঁধা। বিকাশ খুশি হয়ে উঠল। সেই ছোট থেকে এরকম একটা পোস্টের স্বপ্নই দেখে এসেছে। নেহাত তেমন ভাইটাল কোয়ালিফিকেশন নেই, ফলে এই পদেই পড়ে থেকে মার খেয়ে যেতে হচ্ছে। অন্তত যদি বাবা বাড়িতে অতগুলো খাবার মুখ রেখে কম বয়েসেই পেনশন, গ্র্যাচুইটি বা অ্যালাউন্স না রেখে মারা না যেতেন তাহলে জীবনটাই আজ অন্য রকম হতে পারত। হয়ত... হয়ত সোহিনীকেই বিয়ে করতে পারত। জীবনে চলতে চলতেই শিখেছে শিক্ষার সঙ্গে পেছনে যদি টাকার জোর থাকে তবেই মানুষ ওপরে উঠতে পারে।

মোটামুটি সাধারণ মাপের একটি পরিবার থেকে এলেও বিকাশের নজর সব সময় ছিল ওপরের দিকে। সেরাটা দিতে বদ্ধপরিকর থেকেছে। কষ্ট করে সিঁড়িটা ধরেও ফেলত। স্রেফ যদি বাবা ওই সময়ে মারা না যেতেন! এমন একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করতেন যেখানে পেনশন নেই, গ্র্যাচুইটি নেই, আচমকা মরে গেলে একটা পয়সা বাড়ির লোকগুলো পাবে না। কলেজ থেকে বেরিয়েই তাই বিকাশকে কলকাতা পুলিসে

যে কাজ জুটেছে তাতেই ঘাড় পাততে হয়েছিল। বাকিটা ইতিহাস। সমস্ত স্বপ্ন শিকেয় তুলে তাকে গিয়ে ঢুকতে হল ধ্যাদ্ধেড়ে একটা মফসসলের থানায়, চোর বদমাইসদের নিয়ে সে আরেক জগৎ। অন্য দুনিয়া।

সোহিনী আসার আগেই সন্ধান পেয়েছিল দূর দিগন্তে খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকুক আর না-ই থাকুক জীবনের আরেক লক্ষ্যের - টাকা। মেয়েছেলে, টাকায় ভাসছিল যদ্দিন না সোহিনী এসে লাগাম ধরল। জীবনটা অন্যদিকে বইত যদি ওর রক্ষণশীল পরিবার ওদের বিয়েতে বাধ না সাধত। ভাগ্যে জুটল বউ তো নয় - মোটা, আকর্ষণহীণ, বাচ্চা পয়দা করা যন্তর। দৃষ্টিটা জৌলুসহীন ঘর থেকে উদ্দাম ধন, যৌবন সম্ভারে বাঁক নিল। জ্বালিয়ে দিল কলকাতায় মধ্য রাতে অভিসারের দেওয়ালির রংমশাল। সোহিনী শিবরঞ্জনির সুর বাঁধল একাকী বিকাশের বোসপুকুরের ফ্ল্যাটে। বাঁচার নতুন মহামন্ত্র।

'কেন নয়?' বিকাশ থামল। সুমিত আরেকটা ডাবল ঢালছিল,'পুলিসের প্রোটোকলের বাইরে। আমরা বাইরে তদন্তের তথ্য এভাবে দিতে পারি না…'

'আপনি কাকে সন্দেহ করেন?'

'যোগেশের ওপর সন্দেহ আছেই। ছেড়ে দিতে হল শুধুমাত্র শুভঙ্করের কথায়। রোনাল্ডোর মারা যাওয়াটাও স্বাভাবিক কিনা তা-ও এখনো জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না...'

'খুনই তো।' সুমিত আচমকাই বলে উঠল।

'জানলেন কী করে?' বিকাশ গম্ভীর হল।

'আমি তো ওখানেই ছিলাম। ওর সাউন্ড সিস্টেমের প্লাগ ট্যাম্পার করা হয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস। লাইভের সঙ্গে আর্থিং জুড়ে দেওয়া ছিল…'

বিকাশ চমকে সোজা হয়ে বসল। সে ধরেই নিয়েছিল সুমিত বলবে ওটা অ্যাক্সিডেন্ট, কিন্তু ঘটছে উলটো, 'আপনি নিশ্চিত?'

'একদম। টেক্সট করে বলা হয়েছিল ঘটনাটা ঘটবে। যেন ওখানে যাই বা পারলে আটকাই। পরে ইলেক্ট্রিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলে চেক করিয়ে নিই। সে-ই আমায় বলে প্লাগটা দেখার কথা। তখন বাকিরা ছুটোছুটি করতে ব্যস্ত ছিল।'

'তাহলে তো আইরিনকে জিগ্যেস করলেই হত…'

'দেখতে পারেন। তবে সন্দেহ আছে সে-ও মুখ খুলবে কিনা। এতদিন বাদে যদি আপনি গিয়ে বলেন ওটা খুন তাহলে… জানেনই তো মানুষ খুন শব্দটা উচ্চারণ করলেই কী রকম আড়ষ্ট হয়ে যায়।'

'কিন্তু ব্যাপারটা তো চেক করা দরকার, তাই না?'

'নিশ্চয়। যেহেতু খুনি উপস্থিত ছিল না ফলে ধরে নিতেই পারেন প্রমাণও মজুত থাকবে। সম্ভবত কিটটা এখনও ওর ফ্ল্যাটেই আছে।'

'টিপসটার জন্যে ধন্যবাদ। কী জন্যে করা হচ্ছে না বলেও তদন্তের স্বার্থে অনেক কিছুই করা যায়।'

ফেরার সময় বিকাশ ভাবছিল তাদের যুগ্ম প্রচেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা নিয়ে। কে বলে বুদ্ধি আর শক্তি কখনো হাত মেলায় না!

***

সরসিজকে যখন অ্যাপোলোর ক্যাজুয়াল্টি বিভাগের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সুমিত তখন এক মহিলার কাছ থেকে ফোন পেলঃ'অ্যাপোলোর ক্যাজুয়াল্টি বিভাগে সরসিজের কেসটা দেখুন...'

'কে বলছেন?' সুমিত জিজ্ঞেস করল।

'তাতে আপনার কী? হিসেবটা বুঝে নিন গিয়ে...' ওপারে মহিলাটির গলায় হাসির ছোঁয়া।

'এইভাবে আপনারা কেন লোক মারছেন?'

'সেটাই তো আপনাকে বার করতে হবে। যান যান, দৌড় লাগান।' মহিলা ফোন কাটল।

স্পষ্ট যে, তাকেই দেওয়া হয়েছে ধাঁধা সমাধানের ভার। পুলিসের পক্ষে সমাধান করা অসম্ভব এমন একটা বুদ্ধির ধাঁধা তার দিকে ছুড়ে হত্যাকারীরা স্রেফ মজা দেখে চলেছে। তারা কী ভাবছে তাতে কিচ্ছু যায় আসে না, তারই এখন দায়িত্ব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ধাঁধার সমাধান করা। চটপট গাড়ি নিয়ে অ্যাপোলোয় পৌঁছে সরসিজকে পাওয়া গেল আইটিইউ-তে। সেখানে তখন সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেসার, ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড মাপার কাজ চলছে পুরোদমে।

'ও কি ঠিক আছে?' যে ডাক্তারটি অ্যাটেন্ড করছেন তাঁকে জিগ্যেস করল।

'আপনি?'

'ওর বন্ধু। খবর পেয়েই এসেছি...'

'সিওর কিছু বলা যাবে না। আমরা নরম্যাল স্যালাইন, সোডিবাইকারব ইন্ট্রাভেনাস চালাচ্ছি, হাইড্রোকরটিসন মানে স্টেরয়েডও দেওয়া হয়েছে। স্লো ডোপামিন ইনফিউশন পাম্প চলছে। হল কী করে?'

'বলতে পারব না।' সুমিত গলা নিচু করল।

'কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়ার চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যেই ম্যাগসালফও দেয়া হয়েছে। আবারও দিতে হতে পারে...'

'বাঁচবে তো!'

'বলা কঠিন। পয়জনিং-এর কেস। এখনো নেচারটা ধরা যাচ্ছে না...'

ডাক্তারদের সন্দেহ থাকলেও তার নেই। কোনো সন্দেহ নেই ওরা কোনো ঝুঁকি নেয় না। ভিক্টিমকে একেবারে সোজা যমের দোরগোড়ায় পৌঁছে না দিয়ে ওদের স্বস্তি নেই। অন্তত ফোনে যা শুনেছে তার মানে তা-ই। এক্ষেত্রে খুনের অস্ত্রটা কী? মনে হচ্ছে ধরতেও পারবে।

পনের মিনিট বাদে ডাক্তার ফিরল,'ওকে গ্যাস্ট্রিক ল্যাভাজ দেওয়া হচ্ছে...'

সব চেষ্টাই বৃথা হল। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ভেন্ট্রিকুলার এরিথমিয়া, রক্ত পরিবহনের সমস্যা, লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক, ভেন্ট্রিকুলার ফ্রিব্রিলেশন, অ্যাবার‍্যান্ট কন্ডাকশন, অ্যাডাল্ট রেস্পিরেটরি ডিসট্রেস সিন্ড্রোম সহ ইডিওভেন্ট্রিকুলার রিদম থেকে অ্যাসিস্টোলের জন্যে মারা গেল। অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে রেকর্ড হওয়ায় বডি গেল অটপ্সিতে।

অটপ্সি রিপোর্টে কী আসে জানার আগ্রহ নিয়েই বাড়ি ফিরে এল সুমিত। সে যদি বডির দায়িত্ব না নেয় তাহলে হাসপাতাল তাকে রিপোর্ট দেবে না। সেটা করতে গেলেই চতুর ক্রাইমের সঙ্গে জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। অনেক ভেবে তার মনে হল একমাত্র বিধাননগর থানার ও সি শুভঙ্কর রায়ই চাইলে তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

'প্রফেসর সুমিত দাস বলছি,' সে ফোন করল, 'একবার দেখা করতে পারি?'

'নিশ্চয়। থানায় আছি, চলে আসুন...'

থানায় উল্টো দিকে বসে সে শুরু করল,'এক মহিলা ফোন করে সরসিজ নামে কারো আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা বলেছিল। খবরটা পেয়ে অ্যাপোলোয় যাই। ঘন্টাখানেকের মধ্যে সে মারা যায়। যদিও ওদের মতে কেসটা বিষের কিন্তু আমি সন্দেহ করছি পেছনে কারো হাত আছে। কেবল ফোনকলের কথা বলে তো আর তদন্তে নামতে বলা যায় না। আপনি কি অটপ্সি রিপোর্টটা দেখাতে পারেন?'

'কেসটা আমার হাতে তো নয়। তবে চেষ্টা করতে পারি। কথা দিতে পারছি না। অর্চনা ভানিয়ার অটপ্সি রিপোর্ট এসে গেছে। কেমিস্ট্রির একজন অধ্যাপকের সঙ্গেও কথা বলেছি। মহিলা মারা গেছেন বিষাক্ত গ্যাসের জন্যে। হারপিক আর ক্লোরোক্স মিশেই যা হবার হয়েছে...'

'স্ট্রেঞ্জ! আপনি সিওর ওটা অ্যাক্সিডেন্ট?'

'অন্য কিছু যে ভাবব তার জন্যে তো প্রমাণ চাই।'

সুমিত জানে প্রমাণ নেই। থাকতে পারে না। কিন্তু এরা কেউ ওকে বিশ্বাস করবে না। বরং ওকেই ঝামেলায় ফেলে দেবে।

'অ্যাক্সিডেন্ট হলেও সেটা ঘটল কী ভাবে?'

'হতেই পারে। হয়ত দুটো জিনিস কোনোভাবে মিশে গেছিল, যার থেকেই বিষটা তৈরি হয়ে যায়।'

সুমিত চুপ করে থাকল। বুঝতে পারছিল প্রতিদ্বন্দ্বী চাবুকের মতো ক্ষিপ্র আর চালাক। কিন্তু এরা বুঝছে না। বুঝলে জীবন আরো সহজ হয়ে যেত। কিন্তু সে ভাবে তো আর দুনিয়া চলে না। আইন যারা রক্ষা করে তারা চলেফেরে কঠিন নিয়মের মধ্যে। এরা যদি এদের নিয়মের নিগড়ের বাইরে বেরোতে পারত তাহলে অনেক খুনই হয় ঘটতই না, নয়ত খুনি নিঃসন্দেহে ধরা পড়ত। তাকে নিজেকেই বদলে নিতে হবে, চলতি ব্যবস্থা বদলাবে না। সত্যিই কিছু করতে পারে রাজনৈতিক নেতারা।

'সেলফোস।' এক সপ্তাহ বাদে শুভঙ্কর এসে হাজির হল সরসিজের অটপ্সির কপি নিয়ে।

'সেটা আবার কী?' সুমিত জিগ্যেস করল।

'অটপ্সি রিপোর্ট বলছে। জানি না।' শুভঙ্কর রিপোর্টের কপি এগিয়ে দিল।

সুমিত তুলে বলল, 'নেট ঘাঁটা যাক।'

নেটে খানিক ঘেঁটে মিললঃ এক ধরনের কীটনাশক। ফিউমিগ্যান্ট অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড। 'কতটা খেয়েছিল?'

'ছটা...' শুভঙ্কর হাতের কাগজের দিকে তাকাল।

'নেট বলছে অনলাইনে নাকি এমনিই মেলে। খুবই টক্সিক। তিনটে ট্যাবলেটেই যা হবার হয়ে যেতে পারে।'

'সে খেয়েছিল বলছেন!'

'কোন গামবাট নিজে যেচে খেতে যাবে! নিশ্চয় ওকে খাওয়ানো হয়েছিল। যদিও প্রমাণ নেই। এবার আপনারা পাগলের মতো সত্যিটাকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রমাণ খুঁজে মরুন! আমার মাথাব্যথা নেই। কী করত ও?'

'খোঁজ করে দেখতে হবে। দেখি, ওসির সঙ্গে কথা বলি। আমার ভালো বন্ধু।'

'সেই লিঙ্ক থেকেই তদন্তে লিড পাওয়া যেতে পারে।'

শুভঙ্কর বুঝতে পারছিল সুমিত অন্য স্তরে গিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছে। ডিসিডিডির কাছে ধাতানি খাবার পর আর লালবাজারের ধারেকাছে ঘেঁষতে চায় না। পুলিসকে নানান চাপ আর প্রোটকলের মধ্যে কাজ করতে হয়। লোকের কথায় কান দেবার উপায় কই? তবে শুভঙ্করকে লাগবে রেকর্ডের কাছে পৌঁছতে। অন্য কোনো ভাবে ওতে হাজার হ্যাপা। যেখানে এসব চোখের পলকে হয়ে যায় সেইসব খুনি আর গোয়েন্দার গপ্পো এই জন্যেই সাহিত্যের বাজারে পড়তে পায় না। যাই হোক, শুভঙ্কর যেটা সহজেই করতে পারবে আর কেউ করতে গেলে হয় পারবেই না, নইলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

'চেষ্টা করছি। প্লিজ এসব নিয়ে আমাদের বড়কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। তেমন কিছু হয়ে গেলে কিন্তু ফালতু ট্রান্সফারের ঝক্কি পোয়াতে হবে। বোঝেনই তো ব্যাপার-স্যাপার...'

'ভাববেন না। আমি কেবল ধাঁধাটা সলভ করতে চাইছি, যেটা পুলিসেরই করার কথা ছিল। কিন্তু পুলিস তো প্রমাণের পেছনে দৌড়নো ছাড়া কিচ্ছু পারে না। এখানে দরকার মাথা খাটানো।'

থানা থেকে বেরোনোর সময়েই সে ভেবেছিল রিপোর্টটা নিয়ে কোনো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে বিষ খাওয়ানোর বিষয়টা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যায় কিনা দেখবে। সরসিজের ব্যাকগ্রাউন্ডই এই কেসে এগোনোর রাস্তা দেখাতে পারে!

***

সুমিত কম্পিউটর স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েছিল। এমন কিছুর হদিশ খুঁজছিল যাতে অ্যাসেটাইলস্যালিসাইক্লিক অ্যাসিডের থাকার সম্ভাবনা আছে, যা অ্যাস্পিরিনের প্রাথমিক উপাদান। নীলগিরি টাচ উইন্টারগ্রিন অয়েল বা গলথেরিয়া অয়েলে মিথাইল স্যালিসাইলেট আছে দেখাচ্ছে। এটা পেশি আর জয়েন্টের ব্যথার ওষুধ হিসাবে দোকানে পাওয়া যায়। এটা লাগালে নাকি ঈষদুষ্ণ একটা অনুভূতি হয়।

মনে করার চেষ্টা করল ঈশিতার মৃত্যুর দৃশ্যটা। মনে পড়ল ঢুকেই চারপাশে ভাসতে থাকা তীব্র পুদিনার গন্ধের কথা যেটাকে বেনারসী পানের গন্ধ বলে মনে হয়েছিল। ভুল করেছিল। বড় ভুল। কড়া গন্ধটা মোটেই পানের ছিল না। পানেই নিশ্চয় গলথেরিয়া অয়েল ব্যবহার করা হয়েছিল। ওই অয়েলের তিন চামচ ব্যবহার করলেই সেটা ৩২৫ মিলিগ্রাম অ্যাস্পিরিনের ৬৪টা ট্যাবলেটের কাজ করবে। তার ফলে সেই পরিমাণ টক্সিসিটি ফর্ম করতে পারে যাতে মৃত্যুও অবাক কিছু নয়।

ঈশিতার কেসে নিশ্চয় ওই গন্ধের বোতলটা পরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা বেনারসি পানওয়ালাও না-ও জানতে পারে। তবু কথা বলে আসা জরুরি। যে একাজ করেছে সে তো আর রাম-শ্যামের দলে পড়ে না। বরং খুবই বুদ্ধিমান কেউ। সুমিত হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছিল যে এইভাবে পরপর এরকম ঘটনার পর ঘটনা ঘটাতে পারে তাকে ধরাও চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু একজন স্ট্যাটিস্টিক্সের অধ্যাপককে কেন এর মধ্যে জড়ানো হচ্ছে? এটা কি তার বুদ্ধির চরমতম পরীক্ষা?

সঙ্গে সঙ্গে মনোজিৎকে ফোন করল,'পিএম রিপোর্ট এসেছে? দিয়েছে নাকি তোমাকে?'

'না। কেবল বলেছে।'

'একটা কপি চাওয়াই যায় তো?'

'দেবে কি? বাইরে ওসব...' মনোজিতের গলায় সন্দেহের সুর।

'দিতে বাধ্য, তুমি ওর হাসব্যান্ড। যদি না দ্যায় তোমার লইয়ারের সঙ্গে কথা বলো।'

'পয়েন্টটা কি? যে যাবার সে তো গেছে, এখন ওইসব আর...' মনোজিৎকে অরাজি বলেই মনে হচ্ছিল।

'আমি বলছি, কারণ ও কিন্তু...' ঈশিতার মৃত্যুটা যে খুন আগেই এটা না বলে ও বিষয়টা বাজিয়ে দেখে নিতে চাইছিল। নাড়াঘাঁটা করলেই হয়ত আরো ক্লু পাওয়া যাবে।

রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে মিথাইল স্যালিসাইলেটের ওভারডোজের কথা, যদিও তা কোথা থেকে আর কীভাবে এল তার হদিশ কিছু ছিল না। পানওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদের আগে ঠিক করল ঈশিতার ব্যক্তিগত মহলে একটু ঘোরাফেরা করে নেবে - যদি সেখান থেকে কিছু হদিশ মেলে! মনের অবস্থা আন্দাজ করে মনোজিৎকে বেশি না ঘাঁটিয়ে প্রেসিডেন্সিতে ঈশিতার অন্য কোলিগদের কাছে গেল।

ঈশিতার বেশি ঘনিষ্ঠ বর্ষা অবাকই হল সুমিতকে দেখে, 'অগ্নিভর সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'সে কে?' অবাক হল সুমিত।

'ওর বয়ফ্রেন্ড।' হাসিমুখেই বলল।

এসব তো আজকের জীবনযাত্রারই অঙ্গ। কেউ মাথাই ঘামায় না এসব নিয়ে। ঈশিতাও সুমিতের মতোই চল্লিশের কোঠার শেষদিকে। সুমিত এদিকে তেমন মন না দিলেও ঈশিতার আসক্তি থাকতেই পারে। অন্তত পেরি-মেনোপজাল তাড়না যদি বেচারিকে তাড়িত করে। ছেলে বাঙ্গালোরে, স্বামী শান্তিনিকেতনে, তারও তো একটা নিজের জীবন আছে।

'বেশি লোক অবিশ্যি জানে না, যদিও ও আমার কাছে কিছুই লুকোয়নি। আর এই বয়েসে এসে নিজেদের মধ্যে এত লুকোছাপারই বা কি আছে?'

'মানুষটা কে?'

'ওদেরই পোস্ট-ডক লেভেলের একজন...'

'স্ট্যাটিস্টিক্সেরই?'

'হ্যাঁ। আগে আইএসআই-তেই ছিল। চেনেন না ?'

সুমিত মনে করার চেষ্টা করল, 'নামটা শোনা মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক মেলাতে পারছি না। কনট্যাক্ট নাম্বার-টাম্বার কিছু...'

'মোবাইল নম্বরটা কেবল জানি।' বর্ষা নম্বরটা দিল।

ফেরার পথে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে পানওয়ালার সঙ্গে মোলাকাত সেরে নিল।

'সে তো স্যার এক হপ্তা আগের কথা। আমার এখানে খুব তাড়াতাড়ি মাল শেষ হয়। এতদিন বাদে সেই বোতল পাব কোত্থেকে! খালি শিশি-বোতল আমাদের একজন বাঁধা লোক দুদিন বাদে বাদে নিয়ে চলে যায়। এখানে জড়ো করে রাখব কোথায়! দেখছেনই তো কতটুকু জায়গা!'

'আপনার কাছে পুদিনার গন্ধওয়ালা কোনো ক্যান্ডি আছে?'

'এই তো সামনেই আছে, ডার্লিং সিক্রেট পান মিন্ট...' বলতে বলতে সে একটা বোতল এগিয়ে দিল। সুমিত ওটার দিকে দেখল। একদম নতুন জার। ভেতরে ছোট ছোট স্যাচেটে মশলা রাখা। এতগুলোর মধ্যে কয়েকটায় গলথেরিয়া অয়েল ঢুকিয়ে দেওয়া কী আর কঠিন! প্রমাণ হিসেবেও দাঁড়াবে না, যদি না সেই বিশেষ স্যাচেটটা পাওয়া যায়। আবারও সে ব্যর্থ হল। অপরাধী এত সচেতন প্রমাণ ফেলে যাওয়ার ব্যাপারে!

তার সামনে এখন একটাই রাস্তা খোলা - অগ্নিভ চ্যাটার্জি!

***

'রাতে কি দেখা হচ্ছে?' রাবেয়া ফোনে ছিল।

'সামিয়ানাতে আটটায়।' সুধা বলল।

'আশা করি ওরা তার মধ্যেই প্যাক আপ করে ফেলবে। যদি দেরি হয় জানাচ্ছি।'

টলি ক্লাব টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে খুব দূরে নয়। রাবেয়া ভেবে রেখেছিল দেরি হলে শ্যুটের পরেই যাবে। শ্যুটের মধ্যে সেট ছেড়ে যাবার কোনো বাসনা নেই। যদি প্রোডিউসার একবার রটিয়ে দেয় তার জন্যে ক্ষতি হয়েছে, তাহলে পরের ছবিতে কাস্টিং পেতে সমস্যা হতেই পারে। পঞ্জি স্কিমগুলো ধ্বসে যাবার পর থেকে ছবি করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এখন ফালতু প্রোডিউসারকে খচালে টলি কেরিয়ারে কালো দাগ পড়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। একটা সময় ছিল যখন প্রোডিউসাররা হিরোইনের বাহানা সহ্য করত। এখন সে দিন আর নেই। হয়ত বলিউডের মতো অতটা নয়, কিন্তু এখনো এখানে ইনভেস্টাররাই শেষ কথা।

তার একটা বলিউডে ব্রেক চাই-ই। তার মনের মণিকোঠায় স্বপ্ন একটাই - বলিউড। আর সুধা সেই স্বপ্নের দরজা খুলে দিতেই পারে, কিন্তু কথাটা হল যদি চায়!

সে এল আটটার সামান্য পরেই। সুধা স্যান্ডুইচ আর কফি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল যখন রাবেয়া ব্ল্যাক ডেনিম আর সাদা টপ পরে জয়েন করল।

'কী ভাগ্যি ওরা ঠিক টাইমেই প্যাক আপ করেছে। এই সময় ট্রাফিক খুব ভোগায়।'

সুধা তার জন্যে কফি দিতে বলল,'মেক আপ রুমে সব কমপ্লিট করে বসে বসে কখন শটে ডাকবে তার জন্যে ওয়েট করতে বোর লাগে না?'

'কী করব! এটাই আমাদের দুনিয়ার রীতিনীতি। দেরি তো হয়ই, আর হবেও - কলকাতার ওয়ার্ক কালচার বলতে পারো! মুম্বইতে গতি আছে। টাইম ওখানে টাকার চেয়েও দামি।'

'এখানে কিছু করা রিস্ক হয়ে যাবে! পলিসি বলে এত লোক নিতে বাধ্য করে। বিশেষ করে আউটডোরে। লাগবে তিন-চারজন আর নিয়ে যেতে হবে একদলকে। অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।'

'খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রোডিউসাররা বাংলা থেকে মুখ ফেরাচ্ছে। বাংলা আজ যা ভাবছে দুনিয়া গতকালই তা ভুলে গেছে।'

'স্টোরি রেডি?'

'পাইপলাইনে। স্টোরিলাইন মারাত্মক। এক মহিলার চরিত্রের সাত দিক নিয়েই গল্প। রামধনুর মতো। হিরোইনকে সাতটা রোলে কাজ করতে হবে - নিষ্পাপ কলেজের মেয়ে, শিল্পী, গাইকা, বৌ, মা এরকম। প্লটটা আনইউজুয়াল বলেই অভিনয়ের বিরাট সুযোগ আছে।'

'তুমি কি আমার কথা ভেবেছ?' রাবেয়া বলে ফেলল।

'হ্যাঁ' হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা বই বার করে সুধা ওর দিকে বাড়িয়ে দেয়, 'বইটা পড়ে ফ্যালো। তুমি নন্দিনীর রোলটা ট্যাকল করতে পারবে কি না দ্যাখো।'

রাবেয়া বইটা নিয়ে কয়েকটা পাতা উল্টে ব্যাগে চালান করে দিল।

'আসল কথা বাজেট। আউটডোর হবে ধরো খাজুরাহো, বেঙ্গালুরু, কম্বোডিয়া আর হাওয়াইতে। স্ক্রিপ্ট যদি ঠিক মতো হয় আর ভালো এডিটিং থাকে তাহলে কোনো চিন্তা নেই।'

'ডিরেক্টর কাকে ভেবেছ?'

'প্রাথমিক কিছু কথা হয়ে আছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়া একজনের সঙ্গে। অথরের ইনপুট নিয়ে উনি স্ক্রিপ্টের গোড়ার কাজটুকু করছেন।'

রাবেয়ার বলিউড নিয়ে মাথা খারাপের জোগাড়। একটা হিট কেবল চাই, ব্যাস তাহলেই তাকে আর পায় কে! নইলে হয় সিরিয়ালের দিকে ঝাঁপাতে হবে নয়ত পেটের দায়ে এবার অ্যাড, পলিটিক্স এসবের কথাই ভাবতে হবে।

'খুব চেষ্টা করব। বাকিটা লাক।'

টলি ক্লাব থেকে বেরিয়ে বিবেকের ইউনিটেক পেন্টহাউসে এল। এটাই তার দ্বিতীয় আস্তানা। বিবেক এটা কিনেইছিল অবৈধ সঙ্গীসাথীদের কথা মাথায় রেখে। সবার অলক্ষ্যে রাবেয়া তার মিস্ট্রেস।

বিবেক সিংহানিয়া। প্রোমোটিং জগতে বিশাল নাম। তার জন্যে মেয়েরা নিজেদের খুলে দিতে পারলে বর্তে যায়। রাবেয়ার শারীরিক সম্পদের বড় সমঝদার। টলিউডের সম্রাজ্ঞি হয়েও বিবেকের মাসোহারার কাছে রুপোলি পর্দার রোজগার নগণ্য। যখন কারমেল কনভেন্টে পড়ে, সেই বয়স থেকেই রাবেয়ার মা মেয়েকে নিয়ে চিন্তায় ছিল। তার রূপমুগ্ধেরা তখন থেকেই ভিড় করতে শুরু করেছিল। এখন সে এন্টারটেইনার। পাবলিক না প্রাইভেট, কী আসে যায়? এন্টারটেনমেন্টই তো।

'আজ তাড়াতাড়ি শ্যুটিং শেষ হল?' লিভিং রুমে আর্ডবেগ আইলে সিংগল মল্টের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বিবেক জানতে চায়।

'তোমার জন্যে আজ তাড়াতাড়ি... স্নানটা সেরে নিই' হাসল।

স্নান সেরে যখন ঘরে এল তখন পুরো নগ্ন। অন দ্য রকস হুইস্কির মজা তখন মধ্য গগনে রাবেয়ার প্রতীক্ষায়। বিবেকের ভেরসেস অ্যানিমালিয়ার আন্ডারওয়ারের মধ্যে থেকে তার পৌরুষ কথা বলে উঠেছে। ওর খোলা পুরুষালি বুকের লোমগুলো রাবেয়ার মধ্যে শিহরণ জাগাল।

'চিয়ার্স।' দুটো গ্লাসে ঠোকাঠুকি হল।

বিবেকের হাতের ছোঁয়ায় দুটি গোলাপী স্তনাগ্রচূড়ায় তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। বিবেক তাড়াতাড়ি তার পরের ডাবলে চুমুক দিল।

'আজ এত তাড়াতাড়ি?'রাবেয়া হিসহিসিয়ে উঠল।

'তাড়াতাড়ি শুতে যেতে হবে। কাল সকালে একটা বড় ডিলের মিটিং...' বিবেকের গলা কাঁপল?

রাবেয়ারও ঘুমের প্রয়োজন। সকালে তারও শ্যুটিং আছে।

***

'অনেক দিন বাদে...'

'কথা বলা খুব জরুরি।'

'পুরনো লাফড়া ছাড়ো।' শ্রেষ্ঠা পুরনো কথা মনে রাখতে চায় না।

প্রথম প্রেম অগ্নিভর সঙ্গে সেইসব দিনগুলো থেকে সত্যিই বেরিয়ে এসেছে। কলেজ জীবনে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে ঢুকেই কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি অগ্নিভর প্রেমে পড়েছিল।

'গান গাইতে পারো?' অগ্নিভ জানতে চেয়েছিল।

'ওই...তেমন কিছু নয়।'

'বলিউডি না ক্ল্যাসিক্যাল?'

'ক্ল্যাসিক্যাল ঘেঁষা বলতে পারো... রবীন্দ্রসংগীত আর টুকটাক বাংলা আধুনিকও।'

'চলবে।'

'ছবিও আঁকতে পারি অল্পস্বল্প।' সে বলেছিল।

'দারুণ!' অগ্নিভ ফিরে তাকায়,'স্টেজে ধরো সামনে গান হবে আর পেছনে তুমি ছবি আঁকবে... এরকমই কিছু চাইছিলাম, দারুণ হবে!'

এরকম আইডিয়ায় চমক খেয়েছিল। হোমওয়ার্কও শুরু করে দিয়েছিল। জীবনে লোক তার কম আসেনি। কিন্তু এরকম... যত মিশতে থাকে তত চমকটা স্থায়ী হতে থাকে। এতদিন যাদের দেখেছে তারা শুধু হুল্লোড়ই করতে পারে, করেও, ফলে একদিন তারা আশেপাশে আর না থাকলেও খুব কিছু আসে যায়নি। কিন্তু এবার আর পারেনি। ব্রিলিয়ান্ট বললে যার সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না সেই অগ্নিভ তখন স্ট্যাটিস্টিক্সের ফাইন্যাল ইয়ারে।

স্টুডেন্ট পলিটিক্সে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ার পর শ্রেষ্ঠা অগ্নিভকে আরো বেশি করে চিনল। সেখানে সে কেবল একজন স্ট্যাটিস্টিক্সে তুখোড় পণ্ডিতই নয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাজনীতিতেও স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তিত্ব। জিনস আর স্ল্যাক্সে অভ্যস্ত শ্রেষ্ঠাও তখন অন্য মানুষ। দুজনে মিলে দিন বদলের কত স্বপ্ন দেখা! কীভাবে তারা যে সেদিন পাস করেছিল কেবল তারাই জানে। সবাই জানত তাদের প্রেম বিবাহে রূপ পাবেই। শরীরে মনে পাগলের মতো ভালোবেসেছিল শ্রেষ্ঠা।

'ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস' অগ্নিভর গলা বাজল।

'দ্যাখো যা হবার তা তো হয়েই গেছে...'

'একটা ঝামেলা হয়েছে। মহা ফাঁসা ফেঁসে বসে আছি। তোমার সাহায্য চাই। প্লিজ।'

সেইসব দিনের পরেও অগ্নিভ কী করে আবার কোনো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে জোর করে বুঝতে পারছিল না। বল এখন তার কোর্টে।

'ফাইন। শনিবার হতে পারে। সন্ধেবেলায়।'

'খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেই যাব।'

'চাইনিজ।' হাসল, 'ঠিক সাতটায়।'

স্নানে যাবার সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। টাবের জলে এক ড্রপ পিওর সেন্স বডি ক্লিঞ্জিং জেল দিয়ে নিল। এতে স্নানের মজাটা বাড়ে। টবের জলে গা ভাসাতে ভাসাতে অগ্নিভর কথা মাথা থেকে বেরিয়ে গেল।

বেল বাজতে দরজা খুলেই অগ্নিভর মুখোমুখি হল। অগ্নিভ ভেতরে এসে হাতের জিনিসপত্র টেবলে রেখে সোফায় ছড়িয়ে বসল।

'এখনো স্কচ চলে?'

‘অকেশনালি।’ বলতে বলতে শ্রেষ্ঠা কিচেনের দিকে গেল। অগ্নিভর আচমকাই মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই কবেকার ইডেন গার্ডেনের কথা। শ্রেষ্ঠা অস্তগামী সূর্যের ছায়া মেখে হাঁটছিল। সূর্যের আলো ওর মুখে চোখে চুলে খেলা করছিল। ঠোঁটে অস্ত আভায় চিকচিক করছিল কামনার আভাস।

অতীত। তারপর কত কত দিন গড়িয়ে গেছে। আইএসআই থেকে ডক্টরেটের পর সেখানেই পোস্ট-ডক।

‘মাঝেসাঝে খাই।’ মোড়ক খুলছিল শ্রেষ্ঠা, ‘বাঃ, ব্ল্যাক ডগ। তা, কোন ব্ল্যাক ডগ তাড়া করেছে তোমায়?’ হাতে দুটি গ্লাস, অ্যাকোয়া গার্ডের জল।

‘এখনো করেনি। শীগগিরই করবে।’

শ্রেষ্ঠা ধরতে পারেনি,‘কুরকুরে আনোনি?’ প্যাকেটটা হাতে নিয়ে এবার জিগগেস করল,‘কোন কুকুর? কালো নাকি? তাহলে অবিশ্যি ভয়েরই ব্যাপার...’

‘তোমার পরামর্শ নেব ভাবছিলাম।’

‘বলেই ফ্যালো।’ শ্রেষ্ঠা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখল।

‘প্রেসিডেন্সির প্রফেসর ঈশিতার সঙ্গে আমার অনেকদিনের সেক্সুয়াল সম্পর্ক। স্বামী থাকে শান্তিনিকেতনে। ছেলে বাঙ্গালোরে। একা মহিলা, মিষ্টি কথায় আমায় ফিজিক্যাল রিলেশনশিপে বাধ্য করে। স্বামীর অবর্তমানে খুব দোষেরও নয়’

‘বিয়ে হয়েছে?’ শ্রেষ্ঠা মল্টে চুমুক দিল।

‘আমার? না! তুমি চলে যাবার পর তোমার মতো আর কাউকে পেলাম না যে! পুরুষাঙ্গের আবেগ দমানো কী ঠিক? বিশেষ করে যদি মহিলাটি চায়, রিফিউজ করার কোনো কারণ তো দেখি না।’

শ্রেষ্ঠার মধ্যে থেকে কেউ একজন ঝাঁঝিয়ে উঠতে চাইছিল --- এতই যদি আঠা তাহলে আমায় ছেড়ে গেছিলে কেন! কিন্তু চেপে গেল। এককালের অন্তরঙ্গতা আজ লৌকিকতা! যা শেষ হয়ে গেছে তাকে হিঁচড়ে টেনে লাভ?

‘তুমি নিশ্চয় তোমার কেচ্ছাকাহিনি শোনাতে আসোনি!’ ব্যাপারটাকে ফালতু টানতে চাইল না।

‘তা নয়। আসলে এই কদিন আগে ও অদ্ভুতভাবে মারা গেছে।’

‘কীভাবে?’ শ্রেষ্ঠা তাকাল।

‘আচমকাই। ওদের শ্যামবাজারের বাড়িতেই ঘটনাটা ঘটেছে। সেখানে আমাদের একজন পুরনো অধ্যাপকও ছিলেন। সুমিত দাস...’

সুমিত দাস নামটা শ্রেষ্ঠার কানে টং করে বাজল। এই লোকটাই কি গতদিন তার কাছে এসেছিল? ফালতু লাইফ রিস্কের গপ্পো নিয়ে? নড়েচড়ে বসল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে জিগগেস করল, ‘সুমিত দাস না নাম?’

‘হ্যাঁ। কেন বলো তো?’

‘বাদ দাও। তারপর...’শ্রেষ্ঠা অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করল,‘অ্যাক্সিডেন্ট না খুন?’

‘যদ্দুর শুনলাম বেশি অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধে...’

‘তাহলে তো স্যুইসাইড।’ শ্রেষ্ঠা তাকাল।

‘খামোকা কথা নেই বার্তা নেই কোলিগের সামনে অ্যাসপিরিন খেয়ে স্যুইসাইড করতে যাবে কেন? একেবারে যে হতে পারে না তা বলছি না, কিন্তু ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক কি? তুমি কী বলো?’ অগ্নিভর কথাতেও একেবারে পয়েন্ট কি নেই?

‘এর মধ্যে তুমি কী করে?’

‘আজ নয় কাল পুলিস খোঁজ নিতে গিয়ে আমার নাম পাবেই। কেউ না কেউ বলবেই। সেটা তেমন প্রবলেম নয়, কিন্তু...’

‘তোমাদের ব্যাপারটা কজন জানে?’

'অনেকেই আন্দাজ করত নিশ্চয়। সেভাবে জানা বলতে, হ্যাঁ, বর্ষা জানত। ঈশিতা সহবাসের পর ওর নামটা একবার বলেছিল। যাই হোক, স্যুইসাইড হোক আর খুনই হোক আমার নামটা এসে যাবেই। বিশেষ করে ওর স্বামী মনোজিৎ আর ছেলে, ওরা টানা- হ্যাঁচড়া করবেই সব জেনে গেলে।'

ছবিটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল। অগ্নিভ এইজন্যেই তাহলে ভয় পাচ্ছে। শ্রেষ্ঠা সিগারেট ধরাল। গ্লাসে আরেকটা ডাবল ঢালল, 'এত তাড়াহুড়ো কোরো না। ভাবতে দেবে তো?'

পলে পলে সময় গড়াল। সেরিব্রামে ইথানল কাজ করছিল। একবার উঠে ব্যালকনিতে ঘুরে এল। সিগারেটটা শেষ করে অ্যাশ ট্রেতে গুজে দিল,'আচ্ছা, পুলিসি জিজ্ঞাসাবাদের আগে তুমিই ওকে অ্যাকিউজ করছ না কেন? তুমিই তো বললে ঘটনার সময় ও ওখানে ছিল। লজিক কি বলে না যে ও-ও আসলে কালপ্রিট হতে পারে?'

হতে পারে অগ্নিভ ছিল তার ইয়ারের টপার, কিন্তু শ্রেষ্ঠাও তো পল সায়েন্স নিয়ে কম লড়েনি। তার বোধবুদ্ধি কম কেউ বলবে না। বিশেষ করে এরকম ব্যাপারে। হতে পারে এতে ইনভলভ নয়, কিন্তু যেটা বলছে সেটাও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভাবছিল বন্ধু অনির্বাণের আত্মহত্যার কথা।

'হুঁ, সুমিত ঈশিতাকে খুন করতেও পারে। এর কদিন আগেই ঈশিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন একদম ফিট ছিল। আচমকা... হ্যাঁ, ডিপ্রেশন হতেই পারে। কিন্তু কথা নেই বার্তা নেই, ডিপ্রেশনে একটা সুস্থ মানুষ একেবারে আত্মহত্যা করে বসবে? সুমিত দাস নিজেও ধোয়া তুলসি পাতা নিশ্চয় নয়। ঠিকই তো! একদম ঠিক বলেছ!' হুইস্কিতে চুমুক দিল,'আমার এক বন্ধু অনির্বাণ, ওর জন্যেই আত্মহত্যা করেছিল। আইএসআই-তে অচিরাও তো ওরই কাছে রিসার্চ করছিল। কদিন আগেই ওর বাড়িতেই অচিরা মারা গেছে। হতেই পারে, ঈশিতাই ছিল পরের লক্ষ্য। পারে তো বটেই।'

অনিশ্চিত হলেও শ্রেষ্ঠাও বিষয়টা নিয়ে ভাবছিল। জিগস পাজলের ধাঁধাটা যুক্তি দিয়ে মেটাতে চেষ্টা করছিল। ধরা যাক অপরাধীই, হতেই পারে, খামোকা শ্রেষ্ঠাকে খুন করা হবে বলে প্যানিক করল কেন? তাহলে কি পরের ভিক্টিমকে খতম করার আগে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে সাজানো নাটক? নিজের গপ্পোটা চেপে গেল। অনেকদিন অগ্নিভর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। এখন তার কাছে কার্যত অচেনাই। ফলে...

'কিন্তু মোটিভ?' অগ্নিভর দিকে তাকাল।

'ঠিক পরিষ্কার নয়, কিন্তু...'

'আরে, সমস্যাটাও তো ঠিক এখানেই। তুমি ওর ঘাড়ে বন্দুকটা রাখতেই পারো, কিন্তু সেটাকে তো জাস্টিফাইও করতে হবে, তাই না? পুলিস কিন্তু গপ্পো ফাঁদলেই খেয়ে নেবার জন্যে বসে নেই। তাদেরও বিভিন্ন চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। সুমিতও খুব কম বুদ্ধিমান নয়। না খেলেই সে বলটা ছেড়ে দেবে এরকম না ভাবাই ভালো...'

সেটা যে দেবে না তা অগ্নিভর থেকে ভালো আর কে জানে? নিঃসন্দেহে সুমিত বোকা নয়। বরং তার চেনাশোনাদের মধ্যে সবথেকে বুদ্ধিমান বললেও কম বলা হয়। যাক গে, এর কাছে আর কিছু না ভাঙাই ভালো।

'বুঝতেই পারছ প্রমাণ করা কঠিন। আর কোনো সাস্পেক্ট?'

'যথেষ্ট মান্যিগণ্যি লোকেদের মধ্যেই পড়ে ওরা। হেঁজিপেঁজি মোটেই নয়। অবিশ্যি শান্তিনিকেতনে মনোজিৎ নিজেও আরেকজন কাউকে জুটিয়ে রেখেছে কিনা বলতে পারব না। বেগম শাহিনা না কে, তাকে নিয়ে তো এরকম একটা গুজবও ছড়িয়েছিল। প্রমাণ অবিশ্যি কিছু নেই। কিন্তু এরকম ব্যাপারস্যাপার লোকে জনে জনে গাবিয়ে বেড়ায়ও না। আবার গুজবকে চাপাও দেওয়া যায় না। ক্লোজ ডোর অবস্থায় কে কী করে বেড়ায় কে বলবে?'

ঠিক। যে যাই বলুক বাস্তব জিনিসটার চলন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা।

'ওর স্বামীর শান্তিনিকেতন ভুলে যাও। মাথা ঘামিয়ে ফল হবে বলে মনে হয় না। বরং সুমিত দাসের ওপর নজর দাও। মনে রেখো নিজেকে বাঁচাতে হলে যেভাবে হোক ওর ঘাড়ে কেসটা চালান করতে হবে; একমাত্র এটা পারলেই তুমি বাঁচতে পারো।'শ্রেষ্ঠা উঠে যাচ্ছিল। মাইক্রো ওয়েভে খাবারদাবারগুলো গরম করে আনা দরকার। এরপর দেরি হয়ে যাবে।

অগ্নিভ বসে বসে ভাবতে লাগল প্রথমে সুমিতের নাম করাতেই শ্রেষ্ঠা কেন চমকে উঠেছিল। দৃশ্যটা মাথায় তখন থেকেই ঘুরছে।

***

রাবেয়া সাউথ সিটি কার পার্কে গাড়ি থেকে নামতে যাবে এমন সময় কোত্থেকে আইরিন উড়ে এসে ঘাড়ে পড়ল।

'রোনাল্ডোকে মারার জন্যে তুমি আর বিবেক ষড়যন্ত্র করেছ কেন?'

আচমকা ঝাড় খেয়ে আকাশ থেকে পড়ল রাবেয়া,'তুমি কে আগে বলো...'

'আইরিন। আইরিন ডিসুজা।'

'বাপের জন্মে তোমায় দেখিনি। রোনাল্ডো আবার কে?'

'আমার স্বামী। কদিন আগে জিডি বিড়লা সভাঘরে মারা গেছে। খবরটা দ্যাখোনি?'

রাবেয়া দেখেছিল। যা দিনকাল পড়েছে তাতে এরকম মৃত্যু আকচারই হচ্ছে। মিডিয়াও নিজেদের কাজ বজায় রাখতে নিয়ম করে এগুলোকে হাইলাইটও করে যায়। খুব কাছের কেউ না হলে লোকে এসব দ্যাখে নিশ্চয়, তারপর ভুলেও যায়। সে আইরিনের এই ফেটে পড়ায় অবাকই হচ্ছিল। রোনাল্ডো না কে, সে মারা যাওয়ার সঙ্গে তার বা বিবেকের যোগ কোথায় ওর মাথায় ঢুকছিল না। পাগল না কি? আর, তাদের চিনলই বা কী করে? ব্যাপারটা কী?

'কী বলছ বুঝতে পারছি না।'

'তুমি বিবেক সিংহানিয়াকে চেনো না?'

'হ্যাঁ চিনি। কদিন আগে একটা পার্টিতে দেখেছিলাম। তোমার স্বামীর কথা শুনে সত্যিই খারাপ লাগছে , কিন্তু এর মধ্যে আমি আসছি কী করে?'

'পার্টিতে দেখেছ? চালাকি? ত্-তুমি তার সঙ্গে শোও না? আবার বাজে কথা? পার্টি দেখাচ্ছ আবার?'

'হেল। আমি যা-ই করি তাতে তোমার এত মাথাব্যথাই বা কেন?'রাবেয়া এইবার ওকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল।

'রোনাল্ডোর কিছু না হলে আমিও তোমার মতো একটা পাতি হোরের সঙ্গে কথা বলতে আসতাম না। কতদিন বারণ করেছি। কে শোনে কার কথা! ক্রিয়েটিভ মানুষ... ফলে, আমিও খুব বদার করিনি। সৃষ্টির সঙ্গে সেন্সুয়াল খেলনারও হয়ত একটা সম্পর্ক আছে...'

আইরিন ফালতু বকছে না। এটা ঘটনা যে, রাবেয়া রোনাল্ডোর সঙ্গে শুয়েছে। বিদেশের যোগাযোগের ব্যাপারটা বাদেও বলিউডের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। টালিগঞ্জে কাজ কতটা হয় বা হবে সবাই জানে। খাওয়াপরাই এখানে একটা ব্যাপার। সিরিয়ালে জয়েন করে দৌড়ে মরতে কে চায়? পলিটিক্সও তার এক্তিয়ার নয়। বাকি রইল আর কী - বলিউড ছাড়া! রোনাল্ডো ইচ্ছে করলে সেই রাস্তায় ওঠার উপায় করে দিতে পারত। এই দুনিয়ায় এসবের জন্যে কী লাগে রাবেয়ার থেকে ভালো কে জানে? কাস্টিং কাউচ নিয়ে ফালতু গসিপ করে লাভ? পথ যখন চাই তখন বিবেকই বা কে রোনাল্ডোই বা কে? ছোট থেকে তাকে বুঝতে হয়েছে পথটা আসল কথা নয়, লক্ষ্যটাই প্রধান।

'ওটা অন্য কথা। কিন্তু ওর মারা যাওয়া নিয়ে কী বলছ?'

‘বিবেক নিশ্চয় তেমন কিছু করেছে, নইলে---. হয়ত চাইছিল না যে তুমি ওর চেনা কারো সঙ্গে শোও। তাই হয়ত...’

‘চেনা? মানে? ওদের যোগাযোগ ছিল বলছ?’

‘তুমি জানো না নাকি যে, ও ছিল বিবেকের বেআইনি ড্রাগ পাচারের সহকারী?’

‘বিবেক যে আইনসংগত এন্টারপ্রাইজার সবাই জানে। তাছাড়া ওর কাজকর্মের সঙ্গে আমাদের কার কী? তোমার খামোকা মনে হচ্ছে কেন ও আমার জন্যে রোনাল্ডোকে... ওর মারা যাওয়ার ঘটনাটা যে অ্যাক্সিডেন্ট সেটাও সকলেই জানে!’

‘তোমাদের সবাই মানে তো ওই পুলিসগুলো! ওরা যদি ভেতরের গল্পটা জানতে পারে তাহলে...’ আইরিন তিক্তভাবে বলল,‘নিশ্চয় তুমি চাইছ না যে তোমার আর বিবেকের লটঘটের ব্যাপারটা নিয়ে জল ঘোলা হোক!’

নিশ্চয় চাইবে না রাবেয়া। কিন্তু তার মাথায় ঢুকছিল না আইরিন খামোকা কেন তাকে মধ্যিখানে শিখণ্ডী খাড়া করে এসব করতে চাইছে! সে রোনাল্ডোর সঙ্গে শুতেই পারে। তার মানেই কি এতে প্রেমের ত্রিভুজ খাড়া হয়ে গেল! যত সব বোকা বোকা...

আইরিন কিন্তু অন্য জিনিস ভাবছিল। রোনাল্ডোর বেআইনি কাজকর্ম বেরিয়ে পড়ছে দেখলে ওর প্ল্যান রাবেয়াকে ব্যবহার করে নজর ওইদিকে ঘোরানোর। সেটা খুবই বুদ্ধিমানের মতো চাল হবে।

রাবেয়ার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল ভেবে এই মেয়েটা কেন খামোকা বিষয়টাকে খুন-টুন বলে হইচই করতে চাইছে। ওর মাথায় কি অন্য কিছু আছে? সুধার ব্যাপারটা ম্যাচিওর করে গেলে তার আর এইসব রোনাল্ডো বা আইরিন কাউকেই লাগবে না। তার আগে কোনোভাবেই এইসব ফালতু কারণে হেডলাইন হতে চায় না।

‘রোনাল্ডোর মারা যাওয়ার সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। নিঃসন্দেহে ওরকম একটা ঘটনা হলে কারো মাথার ঠিক থাকে না।’সে ঠান্ডা গলায় বলল,‘ অবশ্যই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি, কিন্তু...’ আইরিনকে শান্ত করতে চাইছিল।

আইরিন ভাবছিল। ঠিক কথা যে, সরাসরি ঝামেলায় গিয়ে লাভই বা কী? বরং যদি রাবেয়ার সঙ্গে কথা বলা যায় তাহলে হয়ত রোনাল্ডোর মৃত্যুর ব্যাপারটা খানিকটা পরিষ্কার হলেও হতে পারে। আর সত্যি বলতে কি রাবেয়া তার লক্ষ্যও নয়। লক্ষ্য বরং এমন কেউ যাকে এমনিতে দেখা সম্ভব নয়।

***

‘সরসিজের ডিটেলটা এসেছে, সময় করে যদি থানায় আসেন...’ শুভঙ্কর বলল ফোনে।

‘ইন্সটিটিউট থেকে ফেরার সময় যাই?’ সুমিত বলে দিল।

‘পুরো নাম সরসিজ চক্রবর্তী। এ রাজ্যের অধিকাংশ নার্সারিতেই পেস্টিসাইড সাপ্লাই করত। থাকত সল্টলেক বিজি ব্লকে। বিবাহিত। দুটো বাচ্চা আছে। একমাত্র বোন মণিদীপা বিশ্বাস বালিগঞ্জের বালি হাইটসে থাকে। আপাতত এটুকুই জানা গেছে। মাথায় ঢুকছে না এরকম একজন লোক খামোকা সেলফোস খেতে গেল কেন...’ শুভঙ্করকে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া লোকের মতো শোনাচ্ছিল।

‘ডিটেলসগুলো?’ বিকেলে সুমিত শুভঙ্করের সামনে বসে হাত বাড়িয়ে দিল।

‘এই যে...’ শুভঙ্কর কাগজগুলো এগিয়ে দিল।

বালিগঞ্জ! চৌবেকে ধাক্কা মারলে কিছু ফল হতে পারে বলেই মনে হচ্ছে। মণিদীপা বিশ্বাসের সম্পর্কে কিছু জানাটা জরুরি।

‘কী নাম বললেন... বালি হাইটসের মণিদীপা বিশ্বাস!’ চৌবে জিগগেস করল।

‘হ্যাঁ।’ সুমিত বলল।

‘হুঁ, প্রিয়াঙ্কাদের কিটি পার্টিতে ছিল। ওকে জিজ্ঞাসাবাদও হয়েছিল। একদম বাঙালি মহিলা বলতে যা বোঝায়...’

‘ওর ভাই সরসিজ সেলফোস খেয়ে বিষক্রিয়ায় মারা গেছে। এই ক্ষেত্রেও আগে থেকে জানানো হয়েছিল।’

খেয়েছে, আবার একটা মৃত্যু যা অন্যগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে! প্রিয়াঙ্কার মারা যাওয়াটাই যথেষ্ট জঘন্য ঘটনা। আমিশ শাহের ঘটনা তার মারা পড়ার সঙ্গে জড়িত। আইরিনের স্বামী রোনাল্ডো গেল তার পরেই। এবার মণিদীপার ভাই! একের পর এক এরকম মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পুলিসের কি এইভাবে এগুলো গুণে যাওয়া ছাড়া কাজ নেই? প্রশ্ন উঠবেই। উঠতে বাধ্য। স্বাভাবিকও। বিকাশ তিতিবিরক্ত। কোনো দিকে মাথা দিতে পারছে না। সোহিনীর সঙ্গেও একটু স্বস্তি করে সময় কাটাবে তারও উপায় নেই। বিকাশ আর ভাবতে পারছিল না। এখন কেউ যদি কিছু করতে পারে তাহলে সে একমাত্র সুমিত। যত শিগগির সে এই ধাঁধার খপ্পর থেকে বেরোতে পারে ততই মঙ্গল। দরকারে নিজেও ওকে যতটা পারে সাহায্য করবে।

‘একই লোকের কাজ, কী মনে হচ্ছে?’

‘মনে তো হয়। মণিদীপাকে প্রশ্ন করলে কিছু বেরোলেও হয়ত বেরোতে পারে বলে মনে হয়’

‘কী করে করব বুঝতে পারছি না। ওর এলাকাটা আমার জুরিসডিক্সনেই পড়ছে না।’ বিকাশকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল,‘আমি প্রিয়াঙ্কার ব্যাপারে ফের প্রশ্ন করতেই পারি। তবে খুব নতুন কিছু বেরোবে বলে মনে হচ্ছে না।’

‘ওই সময়েই তো ওর ভাইয়ের কেসটা নিয়েও কথা তুলতে পারেন।’

‘দেখি...’ বিকাশ চিন্তান্বিত।

মণিদীপাকে হালকা সবুজ তাঁতের শাড়িতে অসামান্য লাগছিল, ‘যা জানি সবটুকুই তো বলেছি আপনাকে। তারপর...’

‘আপনাকে ডিস্টার্ব করতে চাইছিলাম না। আপনার মনের অবস্থাও এখন ভালো নয় জানি। আপনার ভাই সরসিজ চক্রবর্তীর ব্যাপারটা শুনলাম।’

মণিদীপা অবাকই হল। ও আবার এসব জানল কী করে? পুলিস মনে হয় না চাইলেও সব জেনে যায়। এখানে বিরক্তি না দেখানোই ভালো। কে জানে কখন এরা কাকে সন্দেহের তালিকায় ফেলে দেবে!

‘সেরকম কিছু তো... আসলে তেমন কোনো সম্পর্কও ছিল না। তাই...’

‘সে কী, শুনলাম যে আপনার নিজের ভাই!’ বিকাশ অবাকই হল।

‘আমার কর্তার সঙ্গে বনিবনা ছিল না।’

‘আপনার মা-র সঙ্গে?’

‘মা তো আগেই চলে গেছেন। গত বছরের আগের বছর।’

অকপটেই কথাগুলো বলছিল মণিদীপা। কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না বিকাশ। মনে হচ্ছে ফালতু গেঁজিয়ে লাভ হবে না। বরং ইনফরমেরশনটা সুমিতকে দিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের হবে।

সুমিতের রাতের খাওয়া হয়ে গেছিল। রিপাবলিক টিভিতে অর্ণব গোস্বামীর প্রোগ্রামে চনমনে ডিবেট শুনছিল। মোবাইলটা ভাইব্রেট করে উঠতেই চমকে উঠল, **এবার টলি অ্যাকট্রেস। কাল হেডলাইন দেখো।** বাড়তি কথা নেই। অর্ণবের বকবকানি কানে ঢুকছিল না। ডিসিডিডির ওই ব্যবহারের পর লালবাজারের দিকে পা বাড়াবার কোনো বাসনাই নেই। যদিও এটা অন্য থানার আওতায় পড়ছে কিন্তু খুনের মোডাস অপারেন্ডি সম্পর্কে কিছু বলতে না পারলে সেখানেও পাত্তা পাওয়া কঠিন। এইভাবে একের পর এক খুন বলেই দিচ্ছে কাজগুলো

কোনো সিরিয়াল সাইকো কিলারের। এতদিন পর্যন্ত যে খুনগুলো হয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসছে এগুলো এমন কারো কাজ নয় যে মানসিকভাবে অসুস্থ, বরং এসবের পিছনে আছে এক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলা।

টের পাচ্ছিল তার পক্ষে কোনোভাবেই এই খুনটাকেও ঠেকানো সম্ভব হবে না, কারণ সে কাজের সূত্রপাত হয়ে গিয়েছে। অথচ এর মানসিকতার গতিপথ যদি এখনই আন্দাজ করা না যায় তাহলে একে রোখা অসম্ভব। পুলিসও একে ধরতে পারবে না। এখন তার সামনে খোলা একটাই পথ - একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলা।

'বিরক্ত করবার জন্যে দুঃখিত। কাল সকালে কি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্ভব?' ডাঃ অনঙ্গ দত্তকে ফোন করল।

'হল কী? বউ পাগল হয়ে গেছে?' অনঙ্গ হাসছিল।

'আরে না, আয়ুষী ঠিকই আছে। কাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট না হলে আমিই পাগল হয়ে তোর রুগি হয়ে যাব...'

'কী ব্যাপার? কখনো তোকে এত উত্তেজিত হতে দেখিনি...' সুমিতের ছেলেবেলার বন্ধু অনঙ্গ অবাকই হল।

'একটা সিরিয়াল কিলার... বিশ্রি জড়িয়ে গেছি। এখন তুমিই ভরসা...'

'আইএসআই-এর কাজটা ছেড়ে দিয়েছিস?'

'এখনো না। অযৌক্তিকভাবে একের পর এক খুনের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখা হলে সব বলব।'

'এখানেই তাহলে ব্রেকফাস্ট কর। তনুকাও খুশি হবে ...'

'ফাইন। তাহলে আটটায়।'

'বেকন, ডিম, হ্যাম – ওকে! সাহেবদের দেশের দিনগুলো নিয়ে একচোট আড্ডা হবে!!!'

ও ছাড়তেই মাথায় একটা প্ল্যান আসতে নড়ে বসল সুমিত। সেন্ডারের নাম্বারেই ফিরতি টেক্সট তো করা যায়! নিজেকে চাপা গাল দিয়ে ও টেক্সট করলঃ

'কোথায়?'

'টলি স্টুডিওতে।' সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলির মতো জবাব এল।

'কোনটায়?'

'সব ক্লু তো দেওয়া যাবে না।'

বোকার মতো টিভির দিকেই তাকিয়ে থাকল। অর্ণব প্রচণ্ড মন দিয়ে দেশের সংস্কার নিয়ে তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। তর্ক-ফিরতি তর্ক উঠছে, সংঘাত বাধছে, কিন্তু সত্যি রিয়েলিটি বলতে কী বোঝায় সে কি জানে? সে শুধু জানে টিআরপি তুলতে হবে! লোকগুলো আদর্শ দেশের স্বপ্নে বিভোর।

নিজের মধ্যে অদ্ভুত একটা জেদ টের পাচ্ছিল। নিয়তি মুচকি হেসে তাকে যে দৌড়ের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে তার অন্ত দেখতে কোনো উপায়ই ছেড়ে কথা বলবে না; তা সে কারো সাহায্য পাক আর না-ই পাক।

***

'অগ্নিভ, অগ্নিভ চ্যাটার্জি। আমায় মনে আছে? তুমি যখন জয়েন করলে তখনি আমি আইএসআই ছেড়েছিলাম।' রোববার বিকেলে নীলকে হোয়াটস অ্যাপে ভিডিও কল করল অগ্নিভ।

'হুঁ, আবছা মনে পড়ছে...' মনে করার চেষ্টা করছিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। অনির্বাণের বন্ধু তো! অনির্বাণকে ভুলবে কে শুনি? বেচারার মারা যাওয়ার খবরটা... তার পরেই আমাদের গ্রুপটা শেষ হয়ে গেল!'

'কী যে বলি! আসলে তারপর থেকেই তো...'

'আমার ইউএসের নম্বর পেলে কী করে?'

'ইন্সটিটিউট থেকেই পেয়েছি।'

'তুমি কি এখনো ওখানেই?' নীল জানতে চাইল।

'না, প্রেসিডেন্সিতে। পোস্ট ডক করছি...'

'গ্রেট! পুরনোদের গলা শুনলে এখনো কীরকম এক্সাইটিং লাগে।'

'কিছু ইনফরমেশনের জন্যে ফোন করছিলাম। এখন কথা বলা যাবে?'

'বলো। এই ঘুম থেকে উঠলাম...'

অগ্নিভ চট করে দেখতে পেল একটি ফরসা নগ্ন ছায়ামূর্তি পেছন দিয়ে সম্ভবত টয়লেটের দিকে চলে গেল। যেন কিছুই খেয়াল করেনি এভাবেই বলে চলল,'অচিরার মারা যাওয়ার খবরটা পেয়েছি। বেচারি।'

'ভুলে যাও। যা হবার হয়েছে। নিয়তিকে কে কী করবে!'

অগ্নিভ বুঝল নীল বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চায় না। সে কথা ঘোরাতে চাইল, 'সে তো জানিই। প্রফেসর সুমিত দাসের কথা বলছিলাম। অচিরা ওর বাড়িতেই মারা গেছে। এই সেদিন আমাদের প্রেসিডেন্সিরই ঈশিতার মারা যাওয়ার সময়েও ওই কাছে ছিল। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য!'

'সে-ও মারা গেছে? বলো কী? সেই প্রেসিডেন্সির দিনগুলো থেকে ওকে চিনতাম! কত আড্ডা হয়েছে...'

'সেই জন্যেই তো... আর দুটো ঘটনাতেই ওই সুমিত দাস লোকটা... আচ্ছা, কিছু জানো নাকি ওর সম্পর্কে? শুনলাম তুমিও ওর আন্ডারেই কাজ করেছিলে? আমাদের অনির্বাণও ওর সঙ্গেই ছিল। সবাই বলছে স্যুইসাইড, কিন্তু... তিন-তিনটে মানুষ... স্যুইসাইড... কেমন অবাক লাগছে না?'

নীলও যুক্তিটা দেখতে পাচ্ছিল। অচিরার মারা যাওয়াটা মন থেকে মানতে না পারলেও ধীরে সময়ের প্রলেপ পড়তে শুরু করেছে। এই লাইনে ভাবেনি। অচিরা মাঝেমধ্যে সিগারেট খেত ঠিকই, কিন্তু হ্যাবিচুয়াল স্মোকার বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। পোস্টমর্টেমে বুটেন গ্যাসের কথা বলা হলেও গ্যাস লাইটার থেকে এরকম হতে পারে কিনা তলিয়ে ভেবে দ্যাখেনি। যদি বা প্রফেসর দাসকে সন্দেহ... না না, উনি কেন খামোকা মানুষ মারতে যাবেন? অথচ এ-ও তো ঠিক, অদ্ভুতভাবে তিনটে মৃত্যুর সঙ্গেই ওই একজনকেই যদি...নাঃ, সে আর ভাবতে পারছিল না।

অনির্বাণের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা ছিল। নীল যখন জয়েন করেছে তখন ইন্সটিটিউটে ব্যাপারটা নিয়ে জোর কানাঘুষো চলছে। স্যুইসাইড করেছিল কোনো স্যুইসাইড নোট না রেখেই। কেউ কেউ বলত সুমিতই নাকি এর জন্যে দায়ী। কেউ জানত না সেই গসিপের শিকড় কোথায়। এটা থামানোর জন্যে যে প্রমাণ লাগে তা কারও হাতেই ছিল না। সুমিত শেষ পর্যন্ত স্রেফ বেনিফিট অফ ডাউটেই বেঁচে যায়।

সমস্ত মৃত্যুই শেষমেশ চাপা পড়ে যেতে বাধ্য যদি না তা নিয়ে লেগে থাকার মতো কাছের কেউ থাকে। নীলের তোলাপাড়াই অচিরার মৃত্যুর ওপর নজর ফেরাতে পারে, অগ্নিভ সেখানে কেউ না। ঈশিতা মারা না গেলে অগ্নিভও এসব নিয়ে মাথা ঘামাত না।

'এটা নিয়ে এতটা ভেবেছ সেই জন্যে ধন্যবাদ। অচিরা সুমিত দাসের ওখানে যাবার আগে আমার সঙ্গে হোয়াটস অ্যাপে কথা বলেছিল ওর ইউ এস ভিসা নিয়ে...' বারবারা কাছেই আছে তাই নীল কায়দা করে বিয়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। অকারণে অতীতকে বড় করতে গিয়ে বর্তমানকে হারানোর কোনো মানে হয় না। জীবনের ধর্মই হল এগিয়ে চলা, পিছিয়ে পড়া নয়,'তখন কোনো সমস্যা লক্ষ করিনি। কবে এখানে আসবে তা-ই নিয়েই উত্তেজিত ছিল।'

'ঈশিতার ঘটনায় ওখানে গিয়েছিল রাত নটার পরে। আড্ডার জন্যে ওই সময়টা কি খুব স্বাভাবিক?' অগ্নিভ ইঙ্গিতটা ভাসিয়ে দিল।

'এতদিন এসব লক্ষ করিনি। এখানে একজন কেমিস্ট্রির অধ্যাপকের সঙ্গে ওই বিউটেনের ব্যাপারটা নিয়ে কথাও বলেছি। তার মতে অ্যাক্স বডি স্প্রেতেও নাকি ভালো পরিমাণে বিউটেন থাকে। অনেক দিন ধরে এটা ব্যবহার করলে নাকি ঝামেলা হতে পারে। মারা গেলেও অবাক হবার কিছু নেই। যদ্দুর জানি অচিরা রেগুলার ওটা ব্যবহার করত না। পারফ্যুম মাঝেসাঝে ব্যবহার করত।'

'তাতেও কি কিছু ভরে দেওয়া যায়?'

'যায়। কিন্তু কে ভরবে?'

'জরুরি প্রশ্ন। কে এবং কেন। মানুষের মন জিনিসটা... আমাদের কার করটিক্যাল গ্রে সেলে কখন কী হচ্ছে কে বলতে পারে। আরো কিছু পেলে জানিও প্লিজ।'

ফোন ছাড়ার আগে অগ্নিভ দেখতে পেল বারবারা নগ্ন অবস্থাতেই টয়লেট থেকে বেরোল। আচমকাই ঈশিতার নগ্ন শরীরটা মনে পড়ে গেল। কতদিন কতবার ওকে ওভাবে টয়লেট থেকে বেরোতে দেখেছে। শ্রেষ্ঠা যদি তার আত্মার খোরাক হয়ে থাকে ঈশিতা ছিল শরীরের চাহিদা। দুজনেই আজ তার জীবনের থেকে বাইরে। কেবল তার সামনে আছে পুলিসের থাবা।

ভাবতেই পারেনি ছবিটা বদলে গেলেও যেতে পারে।

***

'ভাবতেই পারছি না ও আর নেই। বিশ্বাসও করতে পারছি না। তা-ও ওরকম কনসার্টের মধ্যিখানে...'রাবেয়া টলি ক্লাবের সামিয়ানায় কফিতে চুমুক দিচ্ছিল,'আমার সঙ্গে রোনাল্ডোর অ্যাফেয়ার ছিল তুমি জানলে কী করে?'

'আমি ওর স্ত্রী! আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়।' আইরিন চিকেন স্যান্ডুইচে কামড় দিল।

'না না, আমি তা বলছি না। আমায় বলিউডে ব্রেক দিতে পারে বলেছিল। আমাদের মতো ছবিই যাদের ধ্যানজ্ঞান তাদের কাছে এইসব শোয়াটোয়া কোনো ফ্যাক্টরই নয়। এটাই আমাদের বাস্তব। ভালো রোল, তেমন তেমন শট যাতে সেন্সরড না হয়, হায়েস্ট পাবলিসিটি, সব কিছুর জন্যেই এটা আমাদের জীবনে এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কম্প্রোমাইজ কম্প্রোমাইজ কম্প্রোমাইজ। তুমি হয়ত নিতে পারছ না। আমাদের কথা ভাবো... আমাদের স্টারডমের জন্যে এটাই প্রথম আর শেষ কথা। কতটা খুলছ সেটাই প্রশ্ন। একে আনন্দ ভেবো না, অবসর বিনোদনও না। শুধু ওপরে ওঠার সিঁড়ি...'

'বিয়েটা করেছিলাম ঠাকুমা মারা যেতেই, কম বয়সে। বাবা-মা নেই, কেউ নেই। ও-ই আমার একমাত্র কাছের ছিল। হয়ত আমার সঙ্গে সেক্সে বোর হয়ে গেছিল। ক্রিয়েটিভ মানুষ... ওদের চাওয়া পাওয়ার হিসেবটাই অন্য রকম। ওকে দোষও দিচ্ছি না। কিন্তু ও এইভাবে চলে যাবে ! এর পিছনে কোনো কারণ নিশ্চয় আছে। থাকতে বাধ্য।'

'কী বলছ?'

'আমি নিশ্চিত ওদিন ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না। স্যুইসাইড তো নয়ই। এক্কেবারে খুন। কিন্তু মোটিভটা কী?'

'কোনো ক্লু তো নেই।'

'সিওর, বিবেকের এর পেছনে নিশ্চয় হাত আছে। যে-সে লোকের ওইরকম একটা কনসার্টের মধ্যে ঢুকে কিছু করে ফেলা সম্ভব নয়। নিশ্চয় কোনো ইলেক্ট্রিসিয়ানকে এর মধ্যে জড়ানো হয়েছিল। তাকে নিশ্চয় এর জন্যে ভালো পেমেন্টও করা হয়েছিল।'

'ওর মতো কেউ এটা করতে যাবে তার তো একটা কারণ থাকবে।'

'নিশ্চয়। আর সেইখানেই তুমি এসে যাচ্ছ। তুমি ওর মিস্ট্রেস। ও চাইবে কেন তুমি আর কারো সঙ্গে লটঘট করো! রোনাল্ডো ছিল ওর গোপন সঙ্গী। বিবেকের হয়ে ড্রাগ স্মাগল করত। কারো সঙ্গে তো ওর

কোনো হিচ ছিল না। তাহলে?'

আইরিন যা বলছে তার মধ্যে একদম কোনো যুক্তি কি নেই? আছে তো! রাবেয়া এতক্ষণে হাড়েহাড়ে বুঝতে পারছিল কেন সে ওর পেছনে পড়েছে। সে জানে বিবেক বিছানায় যথেষ্ট ভালো খেলোয়াড় আর যথেষ্ট পজেসিভও বটে। আইরিন যেমন বলছে রোনাল্ডো যদি সত্যিই তার কর্মচারী হয় তাহলে তো আরোই চাইবে না রাবেয়া তার শয্যাসঙ্গী হয়। আইরিন যথেষ্ট বুদ্ধির সঙ্গে রোনাল্ডোর অপকর্মের ব্যাখ্যা খাড়া করেছে।

'হতেই পারে। কিন্তু আমার কিসের দোষ?' রাবেয়া চোখ তুলে তাকাল।

'কিচ্ছু না। যদি তদন্ত শুরু হয় তাহলে কিন্তু সেটা হবে ওসি বিকাশ চৌবের তত্ত্বাবধানে। সে যদি একবার তোমার আর রোনাল্ডোর লটঘটের গন্ধ পায় তোমার বিরুদ্ধেই খুনের চার্জ আনবে, ঠিক যেভাবে যোগেশের বিরদ্ধে এনেছিল।'

'যোগেশ কে?'

'আমার বন্ধু প্রিয়াঙ্কার স্বামী। প্রিয়াঙ্কাও কদিন আগেই অদ্ভুতভাবে মারা গেছে। ওকে তো পুলিস তুলে কোর্টেও প্রোডিউস করেছিল।'

রাবেয়া প্রিয়াঙ্কার মারা যাবার কথা জানত না। এতক্ষণে বুঝতে পারছিল সে একটা ঝামেলার মধ্যে ফাঁসতে চলেছে।

'চৌবে নেহাৎ যোগেশকে পুরো কব্জা করতে পারেনি, তাই ও কোর্ট থেকে ক্লিনচিট পেয়ে গেল। হতেই পারে এবার তোমার টার্ন। এইসব পুলিসগুলোকে তো জানো। এরা কেস সালটাতে যে কারুর এগেন্সটে অভিযোগ আনতে পারে এবং জয়ের মালা নিয়ে বেরিয়ে যেতেই পারে।' আইরিন বলে চলেছিল।

ভালোই হল আইরিন সাবধান করে দিল। নইলে একদম আচমকাই ঝামেলায় ফেঁসে বসে থাকত। সুধা তাকে যে অফারটা দিয়েছে সেটাতে কেবল ট্যালেন্ট দেখাবার সুযোগই থাকবে না, চাইলে অনেক উঁচুতেও নিয়ে যেতে পারে। পুলিসের জালে জড়িয়ে আসন্ন ভবিষ্যৎকে গুবলেট করে দেওয়ার মানেই হয় না। বক্স অফিস সাকসেসের জন্যে ইমেজটাকেও বাচিয়ে চলতে হয়। বলিউডের ব্রেক তার সামনে আঙুরের থোকার মতো দুলছে, ফালতু খবরের হেডিং বনে গিয়ে সব কাঁচিয়ে দেওয়ার অর্থ হয় না। তার থেকে সেফ খেলাই ভালো। এই ব্রেকটাই তাকে আরব সাগরের তীরে স্বপ্নের দুনিয়ায় পৌঁছে দিতে পারে। এখন বোকামি করা ভুল।

'থ্যাঙ্কস ফর ওয়ার্নিং মি। তোমায় ভুল বুঝেছিলাম বলে খারাপ লাগছে। এবার উঠতে হবে। এনটি ওয়ানে কাজ আছে। বিকেলের শিফট শেষ হবে দেরিতে...'

'ওকে। তোমার কীর্তিকাহিনি সকলের সামনে খুল্লমখুল্লা হয়ে যাবার আগেই তোমাকে সাবধান করতে পেরেছি এটাই যথেষ্ট।'

নিজের মেকআপ রুমে মেকআপ ম্যান বড়ুয়াকে ডাকতে যাবে রাবেয়া, এমন সময়ে মোবাইল বেজে উঠল।

সিংহানিয়া!

'এনটি ওয়ানের বাইরে আছি। কথা বলার দরকার ছিল।'

'শটের জন্যে তৈরি হচ্ছি!' রাবেয়া ইতস্তত করছিল।

'সময় নেব না।' সিংহানিয়া তাগাদা মারল।

রাবেয়া জানে সিংহানিয়া খেপে আছে। টালবাহানা করলে হিতে বিপরীতের সম্ভাবনা প্রবল। তার থেকে দেখা করে নিলে ঝামেলা কম হবার সম্ভাবনা।

'আসছি।'

মেকআপ রুমেই হ্যান্ড ব্যাগ রেখে সোজা বাইরে বেরিয়ে এল। চায় না একসঙ্গে যারা কাজ করে তারা ওকে সিংহানিয়ার সঙ্গে দেখুক।

ফিরেই ডাকল বড়ুয়াকে। তাড়াতাড়ি হাত চলে তার। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওকে গ্ল্যাম আইকনে বদলে দিল। কে বলবে এ খানিক আগের রাবেয়া। বড়ুয়া যখন শেষ টানগুলো দিচ্ছিল মনে মনে স্ক্রিপ্টটা ঝালিয়ে নিল। আইরিনের ব্যাপারটা বারবার মাথার মধ্যে ফিরে ফিরে আসছিল।

'শটে যাব?' অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মুকেশ উঁকি মারল।

রাবেয়াও নিজের ফাইন্যাল টাচ দিচ্ছিল।

লাইটস! ক্যামেরা!! অ্যাকশন!!!

'কাট, কাট...' ডিরেক্টর নবীন ভোরা চেঁচিয়ে উঠল,'কী হল রাবেয়া, শরীর খারাপ? অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ!'

'সরি স্যার, আরেকবার প্লিজ...' বুঝতে পারছিল অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই সে টলি ক্লাবের ঘটনাটার বাইরে বেরোতে পারছে না।

চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই চরিত্রের মধ্যে ঢুকতে পারছে না। অথচ কোনোদিন তো এমন হয় না। আজ হল কী ?

'তুমি কী ঠিক আছ? মনে হচ্ছে মুড ঠিক নেই। ঠিকমতো রিহার্সাল করোনি?'

'সময় পাইনি, তাই...' অপরাধীর মতো মুখ করল রাবেয়া।

'মেকআপ রুমে যাও। একঘন্টা বাদে শট নেব। রিটেকে আর সময় দেব না। সময়ের দাম আছে। বাজেট বেড়ে যাবে। প্রোডিউসারকে জবাবদিহি করতে হবে'

রাবেয়াও জানে সে ভালোটা দিতে পারছে না। ফালতু এইসব চরিত্রের পেছনে সময় নষ্ট করা তার পোষায় না। টলি ক্লাব থেকে এসেই ডায়ালগে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিল। ছবি আর সিরিয়াল তো এক নয়। সিরিয়ালে এসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে কিন্তু ছবিতে অত গা ছাড়া দিলে চলবে না।

মেকআপ রুমে ঢুকে বসল। একঘন্টা বাদেও যখন সে বেরোচ্ছে না তখন মুকেশ ডাকতে এল। এসে দ্যাখে ড্রেসিং টেবলে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে।

'রাবেয়া, তৈরি তো!'সাড়া নেই। ভেতরে ঢুকল, 'নীতিন অপেক্ষা করছে।'

সাড়া নেই।

ঘুমোচ্ছে নাকি! এগিয়ে এসে গায়ে আলতো ঠেলা দিতেই রাবেয়া চেয়ারের হাতলের ওপর ঢলে পড়ে। মুকেশ চট করে ওর পালসটা দেখল। পালস নেই। নাড়া দিল। রাবেয়া নিথর। ভয়ে আতঙ্কে দৌড় দিল,'নীতিন, রাবেয়ার কিছু একটা হয়েছে, শিগগির... সাড়া দিচ্ছে না। মনে হচ্ছে বেঁচে নেই আর...'

বিকেল হতে না হতেই এনটি ওয়ানে রাবেয়ার মৃত্যু নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গেল। সেলেবদের মৃত্যু খুব সহজ কথা নয়। মিডিয়াগুলো তাদের টিআরপি তুলতে নানা রকম মুখরোচক খবর ছড়াতে লাগল। সবাই যে যার মালপত্তর নিয়ে এনটি ওয়ানের দরজায় ভেঙে পড়ল। রাবেয়ার এই বয়েসে মারা যাওয়া চুলোয় যাক, আসল কথা টিআরপি। খবরটা নিয়ে জলঘোলা করেই যাচ্ছে। রাবেয়ার মারা যাওয়াটা সকলের কাছেই রগরগে ঘটনা। কেউ কেউ নীতিন আর তার ক্রু-মেম্বারদেরও দোষারোপ করছে। আসল কথা রাবেয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু। আরেকটা। অস্বাভাবিক। কেবল সুমিতই খবরটা দেখে আন্দাজ করল। আরেকটা আগের থেকে জানান দেওয়া মৃত্যু তাহলে তালিকায় যোগ হল।

***

'সরসিজের লইয়ার স্টে অর্ডার চেয়েছে।' অভিজিৎ দে বললেন।

মণিদীপা আর তার স্বামী তমাল তার কেয়াতলার অফিসে বসে কথা বলছিল। তাদের অ্যাডভোকেট হিসেবে অভিজিৎ তাদের কোর্টে হাজির করেছিল। সরসিজের সঙ্গে তাদের সল্ট লেকের পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা ছিল। সে চেয়েছিল একচ্ছত্র অধিকার। মিউটেশন আইন অনুযায়ী সমস্ত আইনি উত্তরাধিকারীরাই সম্পত্তির আধিকার পাবে। একমাত্র বোন মণিদীপারও বাড়ির ওপর সমান অধিকার আছে। সরসিজ তা মানতে চায়নি। মিউটেশন আইন একদম পরিষ্কার। সম্পত্তি ভাগ করা যাবে না। দুজনেরই বাড়ি আর সম্পত্তির ওপর সমান অধিকার আছে।

'কেন?' মণিদীপা জিগগেস করে।

'স্মৃতিকণা পুলিসে গেছে। তার ধারণা এই মারা যাওয়াটা স্বাভাবিক নয়।'

'অস্বাভাবিক আবার কী থাকবে? ও তো নার্সারিতে পেস্টিসাইড সাপ্লাই করত...'

'তাদের বক্তব্য একজন মানুষ সব জেনে খামোকা বিষাক্ত জিনিস খাবে কেন?'

'সেটা তারা বলছে। প্রমাণ থাকলে দোষীকে ধরুক। তাতে আমার প্রাপ্য উত্তরাধিকার পেতে আটকায় কিসে?' মণিদীপা খেপে যাচ্ছিল।

'মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ নিরসন না হওয়া পর্যন্ত কোনো উত্তরাধিকার সংক্রান্ত লেনদেন চলতে পারে না। এরকম অবস্থায় জজ সাহেব কিন্তু ওর ফেভারেই রায় দেবেন।'

'ডিসগাস্টিং। ও আমার ক্লেমকে পাত্তাই দ্যায়নি। এখন ও না থাকাকালীন ওর বৌ-ও তো ওর রাস্তাই নেবে। স্ট্রেঞ্জ! যেন আমিই ওকে মেরেছি। হাঃ...'

'জানি না পুলিসকে ঠিক কী বলেছে। যদি আপনার ক্লেমকে ওর মারা যাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে দেয়! আইনগতভাবে ও-ই তো এখন ওর সমস্ত কিছুর অধিকারী।'

তমাল এতক্ষণ কিছু বলেনি। এখন বলল,'ও ওর প্রপার্টি এনজয় করুক না, আপত্তি করছে কে! কেবল আমাদের ভাগটা এখনকার বাজার দরে বুঝিয়ে দিক, ব্যস ল্যাঠা চুকে গেল! আমরাও ওকে সবকিছু ছেড়ে দেব।'

'ওর কথাটা অবিশ্যি আমি জানি না।'

'ও তো এইভাবে আটকে রাখতে পারবে না। বিশেষ করে, মণিদীপা যেখানে আরেকজন আইনি উত্তরাধিকারী। ওরও তো অধিকার আছে।'

'কদ্দিন এই তদন্ত চলবে?'

'কী করে বলি! কয়েক দিনও হতে পারে আবার বছর ঘুরেও যেতে পারে। যদ্দিন না পুলিস কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছে। যে অফিসার তদন্ত করছেন তিনি হয়ত বলতে পারবেন...'

'আমরা কি পুলিসের সঙ্গে কথা বলতে পারি?' মণিদীপা জানতে চায়।

'পারো। কিন্তু তাতে পুলিসের সন্দেহ হতেই পারে। ছাড়ো, অভিজিৎই ট্যাকল করুন...' তমাল বলল।

মায়ের মারা যাবার পর থেকেই দুটো পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে দূরত্ব বেড়েছে। তমাল নিজে যথেষ্ট ভালো পোজিশনে আছে চাকরিতে, সরসিজের নিজের রোজগারও কম ছিল না। দুজনেরই অবস্থা যথেষ্ট ভালো। তবু সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা চলতেই থাকে। সরসিজের কথা হল, বাবার বাড়ি করার মতো টাকা ছিল না। তার রোজগার থেকেই বিজি ব্লকের এই বাড়ি করা হয়। সে কথা অংশত যে ঠিক এটা মণিদীপাও মানে। মায়ের নামে এই বিরাট বাড়ি করার পয়সা বাবার ছিল না। মায়ের চলে যাবার পর তো সব সম্পত্তির সমান মালিক ওরা দুজনেই। কিন্তু... আসলে টাকা এমন জিনিস যা মানবিক সব সম্পর্কই শেষ করে দিতে পারে।

'শেষ যখন দেখা হয়েছিল তখন তোমার দাদা কি একটু নরম হয়েছিল?' তমাল স্ত্রীর দিকে তাকায়।

'একদমই না। সেদিনেই যেদিন ও মারা যায়...'

'পুলিসে তোমার না যাওয়াই ভালো।'

মণিদীপা এতক্ষণে বুঝতে পারছিল যুক্তির সারবত্তাটা। পুলিস যেহেতু যেভাবে হোক কেস ক্লোজ করতে চাইবে, তারা যাকে পাবে তাকেই তুলবে, বিশেষ করে যখন জানবে তাদের দেখা হয়েছিল। মণিদীপা ঠিক করে ফেলল ব্যাপারটা নিয়ে এখুনি আর জল ঘোলা করবে না। কিছু কিছু জিনিস চেপে যাওয়াই ভালো, এমনকি স্বামীর কাছেও।

'সরসিজ বিষয়ে একটা দারুণ ইনফরমেশন এসেছে।' ফোনে শুভঙ্করকে খুবই উত্তেজিত লাগছিল।

'কী?' সুমিত আগ্রহী হল।

'মণিদীপা সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়েছিল। সেটা হাই কোর্ট অব্দি গড়িয়েছে। ও বা ওর স্বামী...'

সুমিত মোটিভ নিয়ে ভাবছিল। যদি ওরাই এর পেছনে থাকতও তাহলেও বাকি খুনগুলোর সঙ্গে... নাঃ... 'মনে তো হয় না।'

'কেন নয়? একদম পরিষ্কার মোটিভটা। সরসিজকে সরানোও হল। মামলার ঝামেলাও রইল না। এবার একাই ছড়ি ঘোরাতে পারবে।'

'ওর স্ত্রী?'

'সেকেন্ডারি রাইটস। তাই না?'

'সমান সমান।'

'নিশ্চিত নই। তা-ও যদি হয় তাহলেও স্মৃতিকণার পক্ষে মণিদীপাকে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে।'

'হয়ত। কিন্তু মোটিভ তা-ও খুব জোরালো বলা যাবে না। অন্তত আমার ভাবনার সঙ্গে যাচ্ছে না।'

'পুলিস ট্রেনিংয়ের সময়ে বলা হয়েছিল মোটিভ দিয়েই অপরাধী ধরা সম্ভব।'

'অন্য কেসগুলোর সঙ্গে একে জুড়ছেন কী করে?'

'পয়েন্ট বটে। তবু ভেবে দেখুন, কোনো মৃত্যুতেই কিন্তু পরিষ্কার মোটিভ বলতে যা বোঝায়, নেই। এই একটার ক্ষেত্রেই এরকম শক্তপোক্ত মোটিভ দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। মণিদীপাকে প্রশ্ন করলে কিছু বেরোলেও বেরোতে পারে। অন্তত চেষ্টা করতে পারি। সরসিজ যেহেতু সল্টলেকের বাসিন্দা ছিল, কেসটা আমার থানাতেই এসে গেছে।'

শুভঙ্করকে ব্যাপারটা নেড়েঘেঁটে দেখতেই হবে। যদি সে মণিদীপার মুখ থেকে কিছু হলেও বার করতে পারে তাহলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা। এ মহিলা সেদিন বিকেলে প্রিয়াঙ্কা আর বাকিদের মধ্যেও ছিল। যদি কিছু হুক বেরিয়ে যায়... কে বলতে পারে! সুমিত তেমন কিছু এগোতেও পারেনি। এবার শুভঙ্কর যদি কিছু বার করতে পারে তাহলে ভালোই।

'ফাইন। আপনি তাহলে এগোন। যদি মনে হয় আমি কিছু কাজে আসব একবার কেবল ফোন করে নেবেন।'

***

'ঈশিতা মারা গেছে স্রেফ তোমার জন্যে। ওর মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী।' মনোজিৎ ফোনেই গজরাচ্ছিল।

'আমার জন্যে?' অগ্নিভ অবাক।

তার মাথায় ঢুকছিল না মনোজিৎ কীভাবে ওকে দোষারোপ করতে পারে! যারা তার আর ঈশিতার সম্পর্কের কথাটা জানত তার মধ্যে তো একমাত্র ঈশিতার সহকর্মী বর্ষা। আর এখন একমাত্র শ্রেষ্ঠা। মনোজিতের তাকে দোষারোপ করার মানেটা কী?

'বুঝতে পারছি না ঠিক কী বলতে চাইছ!' অগ্নিভ ন্যাকা সাজতে চাইল।

'সাধু সেজো না। তুমি ওকে বাধ্য করেছিলে তোমার সঙ্গে শুতে। ঘেন্নায় ও আত্মহত্যা করেছে।'

'মাথা ঠান্ডা করো। এই সময়ে মাথা ঠান্ডা রাখা যায় না ঠিকই, কিন্তু তা-ই বলে যাকে যা নয় তাকে তুমি তা-ই বলতে পারো না।' ফোন কেটে দিল।

কথায় কথা বাড়ে। ঝামেলা বাড়ানোর বদলে আপাতত চুপ করে গেল। ভাবতে থাকল কোনোভাবে কিছু ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে কিনা। মনে হচ্ছে বর্ষাই ঝামেলাটা পাকিয়েছে।

বর্ষা তার ইউনিভার্সিটি অফিসে রিসার্চের রাইট-আপ বানাচ্ছিল। কাজটা শেষ হয়ে এসেছে 'তুমি কি আমাদের ব্যাপারটা মনোজিৎকে বলেছ?'

আকাশ থেকে পড়ে,'মানে? আমি কি পাগল? ঈশিতা আমায় বিশ্বাস করে বলেছিল, আর আমি বলে দেব? কেন হঠাৎ এই বিশ্রি কাজটা করতে যাব?'

'ও আমায় ফোন করে বলছিল, তাই ভাবলাম তুমি হয়ত বলে ফেলেছ...'

'ও কেন বলছে আমি কী করে বলব?' বর্ষাকে রীতিমতো আহত শোনাল।

'একবার অবিশ্যি ঈশিতা বলেছিল ওর সঙ্গে নাকি কে এক বেগম শাহিনার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। সম্ভবত ওখানকার ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের অধ্যাপিকা।'

'তাতে কী হল?'

'আজকালকার দিনে ওইসব সতীত্ব-টতীত্ব রিলেটিভ ব্যাপার।'

অগ্নিভর পয়েন্টটাও উড়িয়ে দেবার নয়। মেয়েদেরও তো শরীর আছে। ঈশিতা আর মনোজিৎ থাকত আলাদা আলাদা জায়গায়। সমাজে, ধর্মে সব ক্ষেত্রেই এটা ঘটনা। আমি পুরুষ। আমি যেখানে যা খুশি করে বেড়াতেই পারি কিন্তু তুমি আমার বউ, তুমি তা পারো না। এই অদ্ভুত হিপোক্রেসিটা গভীরভাবে বাঙালির শিরদাঁড়ার মধ্যে চেপে বসে গেছে।

বর্ষা বা অগ্নিভ হয়ত লিবারাল কিন্তু মনোজিৎ তো নয়। এটাকে কোনো যুক্তিতে মানতে পারবে না। এই না মানতে পারার একটা ফল থাকতে বাধ্য। ঈশিতা আজ নেই, সঙ্গে সঙ্গে তার সবকিছুই ইতিহাস হয়ে গেছে। কিন্তু বর্ষা বুঝতেই পারছিল না মনোজিৎ কেন শেষে অগ্নিভর ওপরেই ঝালটা ঝাড়ছে।

'বুঝতে পারছি না ও কেন এরকম করছে...' জানতে চাইল।

'ক্ষোভে দুঃখে হয়ত।'

বর্ষা যদি না বলে থাকে তাহলে কি শ্রেষ্ঠা? তার মাথায় আসছিল না। সে কি বিশ্বাস করে ভুল করেছে? যদি তা-ই হয় তাহলে... অগ্নিভ বিদ্যুৎগতিতে ভাবছিল। সুমিতও মনোজিৎকে বলে থাকতে পারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তিন-তিনটে মৃত্যুর পরে সুমিতেরও তো একটা অ্যালিবাই চাই। সে ক্ষেত্রে অগ্নিভর মতো মুরগি আর কে হতে পারে! ঈশিতার মৃত্যুর পর অগ্নিভকে খাড়া করে মনোজিতের সামনে রাখতে পারলে সে যে পরিষ্কার অগ্নিভকেই দোষী ঠাওড়াবে এতে কোনো সন্দেহই নেই।

বিষয়টা নিয়ে শ্রেষ্ঠার সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে!

'মনোজিৎ ফোন করেছিল। বুঝলাম আমাদের ব্যাপারটা জানে। আমায় ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী করল।' অগ্নিভ গড়গড় করে বলে ফেলল।

'তোমায় কেন?'শ্রেষ্ঠা তার দিকে তাকাল।

সন্ধে হয়ে আসছে। শেষ বিকেলের আলোয় ওরা দুজন মিলেনিয়াম পার্কের অ্যাস্ফল্ট বাঁধানো রাস্তায় পায়চারি করছিল। হুগলি নদীর জলে খানিক আগেই সূর্য ডুবে গেছে। শ্রেষ্ঠার মনে পড়ছিল কলেজের ফেলে আসা দিনগুলোয় এরকম কত বিকেলে ওরা এখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই বদলে যাওয়া অবস্থায় এরকম ভাবে হাঁটাহাঁটি করতে যথেষ্ট অদ্ভুতই লাগছিল। মনে পড়ে গেল অগ্নিভর উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ, তার বুকে মুখ ডুবিয়ে উদ্দামতার প্রকাশ। সেই স্পর্শের মাদকতার রেশ আজও হৃদয় জুড়ে। তারপর কত দিন কেটে গেছে।

অবস্থা, মানসিকতা সবই বদলে গেছে। এখন যা তার সবই বিজনেস। মনের জায়গা নিয়েছে লেনদেনের অঙ্ক। টাকা। শ্রেষ্ঠা আকাশের দিকে তাকাল। অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে একরাশ তারা জ্বলজ্বল করছে। নদীর জল অন্ধকারের ছোঁয়ায় রং বদলাচ্ছে। দূরে রামকেষ্টপুরের ঘাট থেকে একটা ডিঙি নৌকো ভেসে আসছে। চাঁদের আলোয় সবকিছুই কেমন যেন মোহময়।

'ঈশ্বর জানে কেন! হয়ত মনের যন্ত্রণা থেকেই...'

'মারা যাওয়া নিয়ে কেউই বেশি মাথা ঘামায় না। উচিতও নয়। রুটিন বলেই মেনে নেওয়া ভালো। নেয়ও তা-ই। নেহাত কোনো বিশ্রি জট বা সন্দেহের কিছু না থাকলে কেউ অন্যকে দোষারোপ করে না। এটা তো মোটেই কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নয়, রীতিমতো খুন...'

'এত নিশ্চিত হয়ে কী করে বলছ?' অগ্নিভ বলল।

'কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ খামোকা আত্মহত্যা করে না। হঠাৎ কেউ স্যালিসাইলেটের মতো বিষ খেয়ে মারা যাবে কেন?'

অগ্নিভ অবাক হয়েছিল। বিস্ফারিত চোখে তাকাল,'ত-তুমি জানো? কী করে জানলে?

'কে যেন বলছিল শুনেছিলাম...' শ্রেষ্ঠা ব্যাপারটা গড়াতে দিল না।

'ভগবান জানে ও-ই বা এসব জানল কী করে?'

'হতেই পারে ঈশিতাই হয়ত বলে ফেলেছিল কাউকে।' শ্রেষ্ঠা যুক্তি সাজাতে চাইল।

'বর্ষা বাদে কাউকে বলেনি। জিগ্যেস করেছিলাম। কেউ জানত না।'

'হতেই পারে কেউ তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে ফেলেছিল। তোমরা কোথায় ওসব করতে?'

'আমার পূর্বা আবাসনের ফ্ল্যাটে। যদিও থাকি সেই ভবানীপুরের বাপ-ঠাকুদ্দার রেখে যাওয়া বাড়িতেই, কিন্তু সরকারি লটারিতে পাওয়া ফ্ল্যাটটাও ছাড়িনি! ঈশিতাকে ওখানে কে চিনবে!'

শ্রেষ্ঠার আচমকা মনে পড়ে গেল সেই মুহূর্তটাকে যখন অগ্নিভ ছ হপ্তার প্রেগন্যান্ট অবস্থায় ওকে ফেলে হাওয়া হয়ে যায়। ভোলা কি যায় সেই সব দিন যখন তাকে একা গিয়ে অ্যাবর্শান ক্লিনিকে খালাস করাতে হয়। পরে অবিশ্যি রিজেক্ট করে একেবারে মুখের মতো না হলেও হালকা একটা জবাব দেওয়া গেছিল। কিন্তু বাচ্চাটাকে নষ্ট করার বিপরীতে তা কি যথেষ্ট ছিল? না। বরং এটাই মুখের মতো হয়েছে। সে নিজেই আগ বাড়িয়ে মনোজিৎকে জানিয়ে দিয়েছে। এবার ও নেচে বেড়াক পুলিসের এই দপ্তর থেকে ওই দপ্তরে। ধর্না দিক। প্রমাণ করুক সে নির্দোষ। ঈশ্বর সবাইকেই সুযোগ দেন। এবার তার সুযোগ এসেছে। সে-ই বা কেন সদ্ব্যবহার করবে না!

'হতেই পারে প্রফেসর দাসই...' অগ্নিভকে ভড়কি দেবার চেষ্টা করল।

'ঈশিতা না বললে সে-ই বা জানবে কী করে? এটা নিশ্চিত ও কিন্তু বলেনি। বিশেষ করে একজন পুরুষ সহকর্মীকে... হতেই পারে না...'

'দ্যাখোগে দুজনের সঙ্গেই একসঙ্গে চালাচ্ছিল কিনা! হয়ত দুজনের সঙ্গেই শুত... কেন, পারে না নাকি?'

এদিকটা অগ্নিভ আগে ভেবে দ্যাখেনি। ঈশিতা মারা গেছে। সে বেঁচে আছে। ঠিক কী হয়েছে কে বলতে পারে! অন্তত সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয় কী করে? কী বোকা বনেছে ভাবা যায়! এই মেয়েটা একই সঙ্গে দুজনের সঙ্গে শুয়েছে, না তিনজনের সঙ্গে, কেবল ফুর্তি লোটার জন্যে। পুলিস যদি জানতে পারে তাহলে তাদের সন্দেহ সকলের ওপরেই পড়বে। অ্যাক্সিডেন্টের থিওরি খুনের সঙ্গে মিশে গিয়ে তখন নজর পড়বে তিনজনেরই দিকে। বিপদের তীব্র গন্ধ পাচ্ছিল।

'কী করে এই ঝামেলা থেকে বেরোই বলো তো!'

'ক্যাচ দ্য স্লাই, দ্যাট'স দ্য অনলি ওয়ে উ ক্যান ফ্লাই...' শ্রেষ্ঠা আকাশের দিকে তাকিয়েছিল।

'কী করে বলছ?'

'যখন বাইরের কোনো মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছ বোঝা উচিত উ হ্যাভ টু ফেস দ্য জিঙ্গল। সব সময় কি পিছলে বাঁচা যায়?' শ্রেষ্ঠার গলা অন্ধকারে ভারী শোনায়। ওকেও তো হিসেবটা বুঝতে হবে!

***

কেবল কি হাওয়ার ওপর চললে হয়, এবার যে কিছু রক্তমাংসও চাই? সুমিত লোকটা এতদিন কোনো ক্লু ছাড়াই এখানে ওখানে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। এবার তার মস্তিষ্ককেও কিছু খাদ্যবস্তু দেওয়ার দরকার আছে। পুলিসের পক্ষে তো আর তাদের প্রমাণ প্রমাণ করে দৌড়ে বেড়ানোর ধক নিয়ে খুব বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়, ফলে...

জম্পেশ করে ওকে একটা টেক্সট করা যাক 'এত বুদ্ধিশুদ্ধি নিয়ে ঘোড়ার ঘাস কাটছ! অন্তত প্রোফেসর ঈশিতা ভট্টাচার্যের ব্যাক গ্রাউন্ড আর অ্যাফেয়ারের হিসেবগুলো নিলেও তো পারো!'

সুমিত আয়ুষীকে নিয়ে আইনক্সে নতুন একটা ছবি দেখতে বেরোবে এমন সময় টেক্সটটা ঢুকল। আবার আরেকটা! রবিবারের বিকেলটার এইভাবে সর্বনাশ হতে দেওয়া যায়! ছবির পর আফ্রায় কন্টিনেন্টাল ডিনারের জন্যে টেবল পর্যন্ত বুক করে রেখেছে। তার মধ্যে পুলিসি ছোঁকছোঁকানিতে ফাঁসতে চায় না।

'পরে দেখছি!' সঙ্গে সঙ্গে ফিরতি টেক্সট করল।

'যা ভালো বোঝ। ফুর্তি করো। ততক্ষণে মহেশগঞ্জ এস্টেটের বুড়ো পালচৌধুরী বেচারা তার কলকাতার বাড়িতে পুত্রেসাইনের গন্ধে দমবন্ধ করে পড়ে থাক!'

সুমিত থমকাল। পুত্রেসাইন জিনিসটাই বা কি, কেনই বা তাকে কোন পালচৌধুরীর পেছনে দৌড়তে হবে কিচ্ছু মাথায় ঢুকছিল না।

'সে কে? ব্যাপারটাই বা কী!'

'মৃত্যুর গন্ধ।'

সুন্দর বিকেলটা, আয়ুষীর সঙ্গে সময় কাটানোর মজা এইটুকুই কেবল সুমিতের মাথায় ছিল। না, আজ সে কিছুতেই ফালতু জিনিসে নাক গলাতে যাবে না। কিছুতেই না। টেক্সট পাঠানো লোকটাকে স্রেফ পাত্তা দিল না। চট করে ফিরতি টেক্সট করল 'সিনেমা যাচ্ছি। কে কোথায় মরল বাঁচল আমার কী তাতে? যা হবে পরে বুঝে নেব।' টেক্সটটা পাঠিয়েই মোবাইলটা অফ করে দিল। কোনোভাবেই ফালতু বিরক্ত হতে চায় না।

শিট! লোকটা ইগোর পাহাড় নিয়ে নিজের গণ্ডিতেই ফিরে গেছে! টিপিক্যাল বাঙালি মানসিকতা! ইগো... ইগো...ইগো... এই ইগোতেই মরল লোকগুলো। কক্ষনো নিজের গণ্ডি থেকে বেরুবে না। এই জন্যেই তো বাঙালি আজ যা ভাবে পৃথিবী কাল তা ভুলে গেছে। মনে হয়েছিল এ বুঝি আলাদা কিছু... কিন্তু কোথায় কী? পলিটিক্যালিও অ্যালার্ট নয়। স্রেফ আর পাঁচটা বাঙালির মতো খাবে দাবে বউকে নিয়ে ফুর্তি করবে। আইএসআই-এর গণ্ডিতে ফিরে গেছে, যেন ওতেই ওর মোক্ষলাভ!

কিছু লোক থাকে যাদের ক্ষমতাটা আছে। তারা সহজেই বিষয়টা ধরে ফেলে। আর কাউকে কাউকে গুঁতিয়ে বোঝাতে হয়। দুঃখের বিষয় হল, সুমিত লোকটা দ্বিতীয় পর্যায়ের।

***

'কদ্দিন দেখা হয়নি।' অমৃতা সুধাকে ফোনে ধরল।

'আজ বিকেলে চলে এসো।' না ভেবেই বলে ফেলল।

রাবেয়ার মারা যাবার খবরটা কেবল তার বলিউডে পা রাখার স্বপ্ন আপসেট করে দিয়েছে তা-ই নয়, প্রথম কাজটা নিয়েও তাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। আন্দাজ করে উঠতে পারছে না মেয়েটা তার প্রোডাকশানের জন্যে ঠিক কতটা জরুরি ছিল। প্রশ্নটা যখন টাকা আর টিকে থাকার তখন সেখানে কোনো নীতিবোধ কি কাজ করে? যেহেতু এখানে কয়েক কোটি টাকার প্রশ্ন, সে উদ্বিগ্ন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই

কাজটা ভেস্তে যাবে কিনা তা-ই নিয়ে। রাবেয়ার মারা যাবার কোনো জোরালো কারণও পাচ্ছে না, এক যদি মেয়েটা কোনো ভুলভাল কিছুতে জড়িয়ে না থেকে থাকে। আবছা জানে রাবেয়ার সঙ্গে বিবেক সিংহানিয়ার লটঘটটা। এরকম ফালতু সেন্সুয়াল ব্যাপারে খুব বেশি নজর দেবারও কিছু আছে বা থাকতে পারে? অবিশ্যি বিবেকের এর পেছনে কোনো হাত যদি থাকে? আছে? মনে হয় না। এরকম রাতের খদ্দের প্রোমোটাররা কক্ষনো তাদের কেপ্টদের সঙ্গে জড়িয়ে কেলো পাকাতে চায় না। অবিশ্যি জানে না আইরিনের কেসটা এখানে জড়িয়ে গিয়ে...

'ঠিক সাতটায়।' অমৃতা বলল।

'পাক্কা।' আনমনেই বলে ফেলেছে।

হয়ত অমৃতার মধুর কণ্ঠস্বর পুনরুজ্জীবিত করতেও পারে।

ঠিক সন্ধে সাতটায় তার বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের অ্যাপার্টমেন্টে ভিডিও ফোনটা বেজে উঠল। রণবীর বিজনেসের কাজে ইউকে-তে। সে অমৃতাকে সাদরে ডেকে নিল। সন্ধেবেলায় একলা বসে মদ খেতে কাঁহাতক ভাল্লাগে! তার থেকে সঙ্গে কেউ থাকলে মজাটা বাড়ে। অমৃতার সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা হলে মনটাও অন্যদিকে থাকবে।

ঢুকেই অমৃতা হাতের গিফট-র‍্যাপারে মোড়া প্যাকেটটা দিল। মোয়েত অ্যান্ড শ্যান্ডন ইম্পিরিয়াল শ্যাম্পেন। সেটাকে ডিনারের জন্যে ফ্রিজে চালান করে স্ন্যাক্সের দিকে মন দিল। গতবার ইউকে থেকে রণবীর যে ব্রুইশলাডিশ ডিস্টিলারির দ্য বোটানিস্টটা এনে দিয়েছিল আজ না হয় সেটাই শেয়ার করা যাবে!

'খুব ভালো হয়েছে এসেছ!' সুধা কিচেনের দিকে যাচ্ছিল।

'দেখে মনে হচ্ছে হাফ ছেড়ে বেঁচেছ!' হাসল অমৃতা।

'স্ন্যাক্সটা এনে বলছি।' কিচেনে ঢুকল।

অল্প কালো অমৃতাকে শাড়িতে দারুণ লাগছিল। সে বসেই লিভিংরুমের চারদিকে নজর বোলাল। খুব দারুণ সাজানো গোছানো জায়গা তার পছন্দ নয়। ভালো লাগে বুদ্ধির খেলা। জীবনের সূক্ষ্ম দিকগুলো বেশি টানে।

সুধা চটপট পকোড়া আর পানিপুরি নিয়ে এল। ওগুলো রেখে যখন ড্রিঙ্ক ঢালছে অমৃতা পানিপুরির দিকে হাত বাড়াল।

'কী যেন বলবে বলছিলে?' অমৃতা জানতে চাইল।

সুধা জিনের গ্লাসে সিপ করল,'রণবীর আর আমি একটা ছবি প্রোডিউস করতে যাচ্ছি। বলিউডের কাজ। ভেবেছিলাম রাবেয়াকে নেব, কিন্তু বেচারা...'

'আর-কাউকে নিয়ে নাও...' অমৃতাকে ক্যাজুয়াল দেখাচ্ছিল।

'খুঁজছি তো! মেয়েটা মরল কেন বলো দেখি!'

'এইসব সেলেবদের ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে চেও না, এসব মেয়েদের হাজার রকম এই-ওই-তাই থাকে, ওসব খুঁজতেও যেও না। তোমার কী কেন মরল তা-ই নিয়ে ?'

'বুঝতে পারছি না মৃত্যুটা অন্য কারণে, নাকি আমাদের প্রোজেক্টের জন্যে।'

'তোমাদের প্রোজেক্ট কেন?'

'আসলে কোটি টাকার প্রোজেক্ট! কীরকম সন্দেহ হচ্ছে।'

অ্যালকোহল এইবার আস্তে আস্তে তার মস্তিষ্কে খেলা করতে শুরু করছিল।

'বাদ দাও। একটা গান হোক! তানপুরা যদিও নেই...' সুধা বলল।

অমৃতা তাকাল,'মেজাজটাই আসল! ওসব তানপুরা-টানপুরা কী হবে...'

চোখ বন্ধ করে রাগ ইমন ভাঁজছিল মনের মধ্যে। নিচু গলায় আলাপ শুরু করল। আস্তে আস্তে সুরের স্রোতে ডুবে যাচ্ছিল গোটা পরিবেশটা।

গান কখন শেষ হয়ে গিয়েছিল কেউ খেয়ালই করেনি। সম্বিৎ ফিরল অমৃতারই প্রথম,'রাত হল...এবার উঠতে হয়...'

'ডিনার রেডি করি। ভেজ কিন্তু। কিছু মনে কোরো না প্লিজ...'

'আরে না। মনটাকেও ভেজিটেরিয়ান রাখবে। আমিষ চিন্তা প্রোজেক্টকেও কেমন যেন মাংসল করে দেয়, দেখবে খেয়াল করে।'

'ঠিক বলেছ।' সুধা কিচেনের দিকে পা বাড়াল।

***

'স্ট্রেঞ্জ।' জুনিয়র ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ খরাজ ফরেন্সিক রুমে রাবেয়ার অটপ্সি করতে করতে বসের ঘরে ছুটে এল, 'স্যার, মাথায় ঢুকছে না এটা কী করে হয়!'

'কী হল?' ডাঃ অভিজিৎ নন্দী হাতের ফরেন্সিক রিপোর্টগুলো সরিয়ে রেখে ভারী চশমার আড়ালে চোখ তুললেন।

'রাবেয়া সরকারের অটপ্সি কেসটা...'

'রাবেয়া... মানে ওই অভিনেত্রী? যে সেদিন এনটি ওয়ানের মেকআপ রুমে মারা গেছিল? কেন, কী হল?'

'লেড, বেরিলিয়াম, ক্যাডমিয়াম আর থালিয়ামের মিক্সচার পাচ্ছি। মানে...'

'সেসব তো মেকআপে ব্যবহার হয়। যদ্দুর জানি প্রাচীন কালে মিশরেও মেকআপ করতে লাগত। জানি না এক্ষেত্রে অদ্দুর যাওয়া দরকার হবে কিনা! তখন নখে, হাতে হেনা দেওয়া হত। চোখে গুঁড়ো ম্যালাচাইট থেকে তৈরি কালো সুর্মা আর আই শ্যাডো। গেরিমাটি দিয়ে ঠোঁট লাল করা হত। যাতে এগুলো অনেক দিন রাখা যায় তার জন্যে এতে মেশানো হত জৈব চর্বি। তারা মনে করত ওই সুর্মায় চোখকে ধুলো থেকেও রক্ষা করা যায়। এখনো মেকআপে এসবই থাকে নিশ্চয়। তাড়াতাড়ি কাজটা সারো!'

খরাজ ফরেন্সিক রুমে ফিরে এল। মেকআপ এখন অনেকটা মুছে গেলেও পুরো মোছেনি। সে ম্যাসকারা, পাফ, লিপস্টিক সংগ্রহ করে এনেছিল। মেকআপের জিনিসপত্র সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সেগুলোকে কেমিক্যাল টেস্টে পাঠাতে হবে। মেডিক্যাল প্রফেশনটাই এমন। যত দিন এই লাইনে থাকবে ততদিন কিছু না কিছু শিখবেই। আজও সে এরকমই নতুন কিছুর হদিশ পেয়েছিল।

বইপত্র ঘাঁটতে গিয়ে যা বেরোল তা অদ্ভুত। নেল পালিশ, আইল্যাশ গ্লু, চুলের জেলে থাকে ফরম্যালডিহাইড, বেশি মাত্রায় ব্যবহার হলে শ্বাসকষ্ট হতেই পারে। তাছাড়াও মেকআপে ট্রাইক্লোস্যান নামে এক ধরনের সিন্থেটিক অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল জিনিস থাকে, লিপস্টিকেও সিসে থাকে যা রীতিমতো টক্সিক। ম্যাসকারায় বিউটিলপ্যারাবেন, ইথাইলপ্যারাবেন, প্রপ্যাইলপ্যারাবেন, থাইম্যারোস্যাল, আলকাতরার ডাই, রেটিনাইল অ্যাসিটেট, ইমিডাজোলাইডিনাইল ইউরিয়া থাকে, যার প্রত্যেকটাই টক্সিক। এদের একটা বা সবগুলো একসঙ্গে একটু ভুলভাবে ব্যবহার হলেও মানুষ মারা পড়তেই পারে।

সাধারণত এইসব উপাদান থাকলেও সেগুলো যথেষ্ট ভেবেচিন্তে ব্যবহার করা হয় যাতে কোনো কেলেঙ্কারি না হয়। তেমন নতুন কিছু না জেনেই ব্যবহার করায়... হতেই পারে। তা ছাড়া আজকাল বাজারের যা হাল তাতে জালি ব্র্যান্ড তো হরবখতই হাতে হাতে ঘুরছে। ফরেন্সিক টেস্টে তার কতটা ধরা যাবে সেটাও প্রশ্ন। অনায়াসেই তারপর জিনিসটাকে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া যেতেই পারে। এখানেই এসে যাচ্ছে ঠান্ডা মাথায় খুনের ব্যাপারটা। যদি ইচ্ছে করে ভুল বা বেশিমাত্রায় এই সব জিনিস দিয়ে ঘটনাটাকে দুর্ঘটনার চেহারা দেবার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে তাহলে! না, তাড়াতাড়ি ছেড়ে না দিয়ে

পুঙ্খানুপুঙ্খ কেমিক্যাল টেস্টের রিপোর্ট না আসা অব্দি অপেক্ষা করাই ভালো। এমনকি তখন তো দরকার মতো ঘটনাস্থলে যা যা পাওয়া গেছে সেসব পরীক্ষা করানোর কথাও ভাবা সম্ভব। সব কিছু এলে তারপর না হয় সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে!

জীবনে সে অনেক অদ্ভুত মৃত্যু দেখেছে। কিন্তু রাবেয়ার কেসটা অন্যরকম। জীবৎকালে রাবেয়া যতটা না খ্যাতি পেয়েছিল মরে গিয়ে তার থেকে বেশিই জুটে যাবে তার ভাগ্যে। হয়ত ফরেন্সিক ইতিহাসেই খ্যাতনামা হয়ে রয়ে যাবে সে। হতেই পারে।

***

সোহিনী লাইনে ছিল। উদ্দেশ্য বিকাশকে যেভাবে হোক উত্তেজিত করা। কিছুদিন হল কিছুই তেমন হচ্ছে না। খুনের পর খুন এমনভাবেই তাকে প্যাঁচে ফেলেছে যে তার আর কোনো দিকেই তাকাবার উপায় নেই। বিকাশেরও কি আর ওকে শান্ত করতে ইচ্ছে করে না! করে, কিন্তু... আপাতত একটাই বাঁচোয়া ওই যে টলিস্টারটা, রাবেয়া না কী যেন নাম, তার কেসটা অন্তত তার এরিয়ায় নয়। এই ক্ষেত্রে ঈশ্বর তাকে রেহাই দিয়েছেন। কেবল সোহিনীর মাখনের মতো নরম নগ্ন শরীরটার কথা ভেবে মধ্যে মধ্যে তার হাতদুটো নিশপিশ করে। নিজের মোটা হোঁৎকা বউটাকে দিয়ে তো এসব হবে না...

বিকাশ যখন বোসপুকুরের ফ্ল্যাটে ঢুকল সোহিনী তখন স্নানে ঢুকেছে। অনেক চিন্তা নিয়েই আজ এখানে এসেছে। এখন একমাত্র চিন্তা এখানে কোনোভাবে নজরদারি হচ্ছে কিনা। হতেই পারে। সমস্যা হল, হলেও কিচ্ছু করার নেই। ইললিগ্যাল প্রপার্টির সমস্যা এইটেই। হাতে ক্ষমতা থাকলেও কিচ্ছু করতে পারে না। শাওয়ারের আওয়াজ থামতেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নগ্ন সোহিনী বেরিয়ে এল। তাকে নগ্ন দেখেই বিকাশ শক্ত হয়ে উঠেছিল।

'এসে গেছ...' চুল মুছছিল সোহিনী। তার ইচ্ছেতেই কেনা বিশাল আয়না বসানো ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকায় তাকে পুরোপুরিই দেখতে পাচ্ছিল বিকাশ।

মেয়েরা সবসময় ফিগার কনশাস। আয়না নিয়ে তাদের বাহানার অন্ত নেই। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখাটাই তাদের একমাত্র ব্যসন বলে মনে হয়। সোহিনীর ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই সে বিছানায় গড়িয়ে গেছিল। তার অঙ্গ এখন আর বাধা মানতে চাইছে না।

'কতদিন বাদে! মাঝেমধ্যেও তো একটু সময় বার করতে পারো...' পাশ না ফিরেই সোহিনী বলল।

তার গলায় কি ব্যঙ্গের সুর? বিকাশের এখন অবশ্য ওর কথার দিকে নজর নেই। ওর নগ্ন শরীরটা নিয়েই ব্যস্ত। এখন কে কথা বলে সময় নষ্ট করে!

'লাঞ্চটা সেরে নেওয়া যাক...' সে বলল।

'একটু নিয়ে নিলে হত না?' সোহিনী বলল।

'যা বলবে!'

আজ আধ বেলা ছুটি। একটু ড্রিঙ্ক করাই যায়। তবে বিকেলের দিকেই হলে ভালো। এখন... সে ক্যাবিনেট থেকে বাকার্ডিটা বার করল। ফ্রুট জুসও আছে। লিভিং রুমের এসিটা অন করা ছিল না। করে দিল। আপাতত তৈরি।

'এখনও জামা-কাপড় ছাড়লে না!' নগ্ন অবস্থাতেই বসেছিল সোহিনী।

মুহূর্তে বিকাশ পাশের ঘরে হাওয়া। ওর যাওয়ার দৃশ্যটা আয়েস করে দেখছিল সোহিনী। জানে তার নগ্নতা এতক্ষণে ওকে ভিসুভিয়াস করে তুলেছে।

'শিগগির এসো...' ড্রিঙ্কসের সঙ্গে জুস মেশাচ্ছিল।

খানিক বাদে সোহিনী জানতে চাইল,'সব ঠিকঠাক?'

'না। আমার ক্ষমতায় কুলোল না। প্রফেসর দাস দেখছেন...'

‘সে কে?’

‘আইএসআই-এর অধ্যাপক।’

‘আশা করি আমাদের নিয়ে হ্যাঁচড়াহেঁচড়ি করবে না!’

‘দেখা যাক...’ বিকাশের এখনো আতঙ্ক এখানে তাদের সব কীর্তিকলাপ সত্যিই স্পাইক্যামে তুলে রাখা হয়েছে কিনা! যা হবার হবে! ফালতু কী হবে না হবে ভেবে লাভ? চিন্তাটা সরিয়ে সোহিনীর দিকে নজর ফেরাল। এই মুহূর্তটা নষ্ট করার নয়। সোফাতেই তাড়াতাড়ি সোহিনীর মধ্যে প্রবেশ করল পাছে চিন্তায় ইরেকশনটা নেতিয়ে না পড়ে। কাজ শেষে খাওয়া, ঘুম।

বিকেলে যখন বিকাশের ঘুম ভাঙল সোহিনী তখন কফি বানাতে ব্যস্ত। শরীরটা আজ বড় শান্ত। ভালোই লাগছিল তার। আচমকা মোবাইল বাজতেই আনমনে সেটা হাতে নিল। নিয়েই... আজ দুপুরে তাদের কীর্তিকলাপের ছবি কেউ তাকে হোয়াটস অ্যাপে পাঠিয়েছে। সঙ্গে একটা স্মাইলিং ইমোজি আর নোট ‘চালাও ফোয়ারা...’

আতঙ্কে সাদা মুখ নিয়ে ছুটে এল,‘আবার সব কিছু রেকর্ড করা হয়েছে। দ্যাখো...’

‘মানে?’ বিকাশের ঘুম ছুটে গেল।

সোহিনী ছবিগুলো দেখাচ্ছিল। বিকাশ এখন নিশ্চিত ফ্ল্যাটে স্পাই ক্যাম আছে। কিছুতেই এই ছক থেকে বেরোবার পথ পাচ্ছিল না। তারা জানেই না ফোনে ইন্টারনেট থাকায় ক্যামেরা রিমোট, অ্যালফ্রেড, ওয়ার্ডেন ক্যাম, আই পি ওয়েব ক্যাম প্রো ইত্যাদি অনেক কিছুই ক্যামেরা ফোন কব্জা করতে পারে। রিমোটলি ইন্সটল করা এমস্পাই স্টেলথ মোডে রান করালে ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্যামেরা রেকর্ডিং হলেও ধরা যায় না। সোহিনীর গুগল অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে। বাকিটা সিম্পল ব্যাপার। এই নেট এজে কোথাও গিয়ে বাগিং কেউ করে নাকি?

মাথায় ঢোকার কথাই নয় গোটা ঘটনায় এই বাগিং-এর তাৎপর্য। সে কেন, প্রফেসর দাসই কি এর পেছনের মতলব ধরতে পারবে!

বোঝার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল,‘ড্রেস করে নাও। যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরোনো যায় ততই মঙ্গল...’

সোহিনী বিনাবাক্যে তার কথামতো তৈরি হয়ে নিচ্ছিল। মাথায় এখন পৃথিবী ভেঙে পড়েছে।

***

‘রাবেয়া সরকারকে চিনতেন?’ ইনভেস্টিগেটিং অফিসার প্রশান্ত দেশমুখ জানতে চাইল।

বিবেক আন্দাজই করেছিল এরকম প্রশ্ন আসবে। অন্তত আসাটাই স্বাভাবিক। আজ নয় কাল পুলিস তার সঙ্গে রাবেয়ার যোগাযোগের হদিশ পেতে বাধ্য। পাবেই। এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যু মানেই তো হাজার প্রশ্নের ঝড়। লাউডন স্ট্রিটের অফিসে চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে সরাসরি লোকটির চোখের দিকে তাকাল,‘চা না কফি?’

‘কফি। চিনি দুধ বাদে...’

‘হ্যাঁ, চিনতাম। আমার কয়েকটা প্রোডাকশনে ও-ই লিড স্টার ছিল।’

‘আপনি তো প্রোমোটিং-এ...’

‘হ্যাঁ। ওটাই আমার রুটিরুজি! এক সময়ে কয়েকটা ফিল্ম-ও প্রোডিউস করেছিলাম। বক্স অফিসে তেমন চলেনি। কিন্তু রাবেয়া ভালো কাজ করেছিল। আমারই ভুল। উইক স্টোরি লাইন নিয়ে ছবি হয় না। হলেও বক্স অফিস পায় না। অন্তত আমাদের দেশের বাজারে।’

‘তারপরেও কি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল?’

‘মাঝেমধ্যে পার্টিতে... ইয়ু নো! স্যাড টু হিয়ার অফ হার সাডন ডেথ!’

প্রশান্তও আশা করেনি লোকটা বিরাট কিছু ঝেড়ে কাশবে। রাবেয়া ছিল পেয়ারের মেয়েমানুষ। গসিপ তার কানেও পৌঁছেছে। কিন্তু স্রেফ তার ওপর ভিত্তি করেই তো পুলিস কিছু করতে পারে না। সে কেবল তক্কেতক্কে আছে আরো কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে। ফালতু বাঁধাধরা প্রশ্ন করে খেপিয়ে না দিয়ে একে খেলিয়ে চলাই ভালো।

কফিতে চুমুক দিয়ে সরু চোখে তাকাল,'খুবই স্যাড কেস। আমরা এখনো বুঝেই উঠতে পারিনি এটা অ্যাক্সিডেন্ট না অন্যকিছু...'

'ঘটনাটা ঘটল কী করে?' বিবেক বুঝে নিতে চাইছিল কতটা জানে।

'ফরেন্সিক বলছে মেকআপে বিষাক্ত টক্সিসিটির ফলে...'

'এই শো-বিজরা সবসময় এত টিপটপ থাকতে চায়... অবশ্য এটা ওদের প্রফেশনের শর্তও বটে... কিন্তু... সারাটা দিন যদি ওরকম চকচকে ঝকঝকে থাকতে হয় তাহলে তো ওসব জিনিস লাগবেই। এখন বাজারের যা অবস্থা তাতে কে কোন মেটেরিয়াল দিয়ে কী করছে কে বলতে পারে?'

বিবেক যা বলছে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট, সোশ্যাল সমস্ত রকম মিডিয়ার এখন যা দাপট তাতে এইসব পুরুষ মহিলাদের সত্যিই সবসময় ঝকঝকে থাকা ছাড়া উপায়ও নেই, আর সেই সুযোগটাই নিচ্ছে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোম্পানিগুলো। নেবেই। যথেষ্ট সাবধান না হলে মৃত্যুও হবেই। এখনো যদি সরকার থেকে যথেষ্ট কড়াকড়ি না হয় তাহলে রাবেয়াদের মতো মেয়েদের ভাগ্যে তো হরবখত এরকম ঘটবেই। রাবেয়ার মৃত্যু যদি চোখ খুলে দেয় তাহলে সত্যিই মঙ্গল। প্রশান্তর খারাপ লাগছিল। কিন্তু তার মতো সামান্য সরকারি কর্মীর ক্ষমতা কতটুকু?

'যা বলেছেন! লোকেদের মধ্যে সচেতনতা জাগাতে উঠে পড়ে লাগা দরকার। শুনলেন কোথায়? এখানেই ছিলেন?'

'না। বাঙ্গালোরে মিটিং-এ গেছিলাম। ওখানেই নিউজে দেখি...'

বিবেক এড়িয়ে গেল বাঙ্গালোরের মিটিং শেষ মুহূর্তে ক্যানসেল হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল এক হপ্তা বাদে হবে। খবর পেয়েই ও রাবেয়াকে খবর দেয়। প্ল্যান ছিল ও চলে আসবে ওর নিউ টাউনের পেন্ট হাউসে।

'আজ রাতে যেতে পারছি না।' রাবেয়া বলেছিল।

'কেন?' জানতে চেয়েছে।

'আজ আইরিনের সঙ্গে বসা আছে!'

'সে কে?' বিবেক ফেটে পড়েছিল।

'রোনাল্ডোর বউ।'

আচ্ছা জ্বালাতন! রোনাল্ডো মালটা ছিল তার কাজের লোক। লোকটা বেঁচে থেকেও জ্বালিয়েছে, এখন আবার ওর বউটাও... একেও সমঝে দিতে হবে মনে হচ্ছে। রাবেয়াকেও। এত বাড়াবাড়ি ভালো না। বিবেক 'না' শুনতে রাজি নয়। মেয়েদের পেছনে বেশি ঝঞ্ঝাট পোয়ায় বোকারা। বিছানায় ফ্যালো, দেখবে ঠিক কাজ দিচ্ছে। তা না... একেও শিক্ষা দিতে হবে। এইজন্যেই এনটি ওয়ানে সেই দুপুরে গেছিল। ওর সঙ্গে দেখা করার আগে রাবেয়ার সঙ্গে সম্ভবত কোনো মহিলার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। বোধহয় আইরিন।

'খুবই দুঃখের বিষয়। এত ভালো অভিনয় করত...' প্রশান্ত উঠতে যাবে এমন সময় বিবেক জিগগেস করল,'খুন বললেন কেন? কিছু গণ্ডগোল আছে নাকি?'

'এখনো দেখা হচ্ছে। স্রেফ বিউটি প্রোডাক্টের জন্যে একজন প্রতিভাময়ী হিরোইন এভাবে মারা যাবে? এইসব মহিলারা তো এসব সবসময়েই ব্যবহার করে থাকে। এরকম হতে শুনেছেন কখনো? ফিলম ইন্ডাস্ট্রিটাই একটা ভয়ানক ফিশি জায়গা...'

'কিন্তু তা-ই বলে খুন?' সে নিশ্চিত হতে চাইছিল।

‘কেন নয়! এরা তো সবাই ডাঃ জেকিল অ্যান্ড মি হাইড লাইফে বিশ্বাস করে! এইসব ফিশি ব্যাপার ঘেঁটে ওর মুখোশের আড়ালের মুখটা বার করতে পারলে...’

‘বাপরে বাপ, আর ও লাইনে যায়! দিব্যি আছি...’ বিবেক দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

নাঃ, আইরিন মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে হচ্ছে! কিছু যদি হদিশ মেলে! বিবেক বাইরের ইম্প্রেশনের বাইরে অন্য মানুষ।

***

কাকা মুকুন্দ পালচৌধুরীর মৃত্যু সংবাদটা অমৃতা পেয়েছিল রাত নটার কিছু বাদে। মহাত্মা গান্ধি রোডের নিউ হোটেল রয়ালের বাসিন্দারাই তাকে খবরটা দেয়। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে হোটেলের দিকে বেরিয়ে পড়েছিল। যদিও বালিগঞ্জ থেকে সামান্য দূর, তবু আশা করছিল এই সময়ে অত ট্রাফিকের ঝামেলা থাকবে না।

মহেশগঞ্জ এস্টেটের এক শরিকের বংশধর অবিবাহিত মুকুন্দবাবুর বয়স সত্তরের শেষদিকে। হোটেলের ১৩ নম্বর ঘরেই থাকতেন। মাঝেমধ্যে অমৃতাই গিয়ে কাকার খোঁজখবর নিয়ে আসত। দীর্ঘদিনের সঙ্গী ছিল ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। যখন যেত কাকাকে ইনহেলার দিয়ে আসা ছিল তার কাজ।

‘ডিনারের পর ঘুমোতে যাবার আগে আমরা রোজ একটু আড্ডা মারতাম।’ শৈলশেখর মিত্র কাকার প্রায় সমবয়সি বন্ধু। পৌঁছবার পর উনিই বলছিলেন,‘আজ দেরি দেখে ডাকতে এসেছিলাম। এসে দেখি ঘরে শুয়ে আছে। দেখে ভালো লাগল না। ডাক্তার কাছেই থাকেন। ডাকা হল। তা তিনি এসে বললেন...’

কাকার প্রাণহীন দেহটার দিকেই তাকিয়েছিল অমৃতা। এখনো বিছানাতেই শুয়ে আছে। যেন ঘুমোচ্ছে। বাতাসে কেমন যেন গন্ধ ভাসছে। একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে অমৃতা শৈলশেখরকে বলল, ‘বাড়ির সবাইকে এবার জানাতে হয়’

‘কাল সকাল অব্দি অপেক্ষা করা যাক। তারপর যা হয় করতে হবে...’ ফোনে সব শুনে বাড়ির ওঁরা বললেন।

‘ব্যবস্থা করছি কাল সবাই না আসা অব্দি পিস হেভেনে রাখার...’ অমৃতা বলল।

‘ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দিতে চায়নি। যেহেতু ওঁর চিকিৎসা করত না, ফলে...’ শৈলশেখর পাশ থেকে বললেন।

‘তাহলে কী হবে?’ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকাল অমৃতা ।

‘এরকম ক্ষেত্রে তো পোস্টমর্টেমই করা হয় জানি...’

‘পুলিসকে জানানো হয়েছে?’

‘বোধহয় হোটেল থেকেই জানিয়েছে। এখুনি হয়ত এসে পড়বে।’

খানিকক্ষণের মধ্যেই আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার এসআই কল্যাণ বিশ্বাস এল। সঙ্গে হোটেলের ম্যানেজার বাণীকান্তবাবু।

‘গত তিরিশ বছর মিঃ পালচৌধুরী এখানেই থাকতেন।’ বাণীকান্ত বললেন।

‘বাড়িতে কেউ ছিলেন না?’ কল্যাণ জানতে চাইল।

‘একাই থাকতেন। মহেশগঞ্জ এস্টেটের পালচৌধুরী বংশের একজন উত্তরাধিকারী।’

‘মহেশগঞ্জ? সেটা কোথায়?’

‘নদীয়ার বালাখানায়...’

‘বাড়ির সবাইকে জানানো হয়েছে?’

‘ভাইঝি ফোন করেছে।’ শৈলশেখর মধ্যিখানে বলে ফেললেন,‘ওঁরা বলছেন বডি যেন পিস হেভেনে রাখা হয়।’

'না না, বডি এখন চলে যাবে কাঁটাপুকুর মর্গে। সেখানে...'

অকারণ তর্কাতর্কি করার অর্থ নেই। অমৃতা বাড়ির সবাইকে ফোন করে দিল।

সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে অদ্ভুত তথ্য বেরিয়ে এল। মুকুন্দবাবুর মৃত্যু নাকি স্বাভাবিক নয়, খুন। খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কে খামোকা একটা অবিবাহিত সত্তর বছরেরও বেশি বয়েসের বুড়োকে খুন করে ফাঁসতে যাবে? এ লোক তো এমনিই কদিন বাদে মারা যেত। মাথায় ঢুকছিল না ব্যাপারটা কী! খুন? এস্টেটের সামান্য ওই কটা পয়সা, ওর জন্যে খুন?

'ঠিক বলছেন?' অমৃতা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

'একদম...' ফরেন্সিক প্যাথোলজিস্ট ভদ্রলোক বলল।

'চেস্টের প্রবলেম ছিল বলে ইনহেলার ব্যবহার করত।'

'কোন ইনহেলার?'

'টিওভা।' যেহেতু সে-ই এটা কাকার জন্যে কিনে আনত, ফলে বলতে অসুবিধে হল না অমৃতার।

'সায়েন্টিফিক নাম টাইস্ট্রপিয়াম ব্রোমাইড।'

সায়েন্টিফিক নামে আগ্রহ ছিল না অমৃতার। কল্যাণও তার মতোই অবাক,'আপনি নিশ্চিত?'

'নিশ্চিত। এক্কেবারে ক্লিয়ার কেস অফ হোমিসাইড। সোডিয়াম সায়ানাইড এলডি$_{৫০}$-র প্রমাণ পাওয়া গেছে। মৃতদেহ থেকে একটা তেতো বাদামের গন্ধ আসছিল না? ওটাই আসলে প্রমাণ। ব্লাড সায়ানাইড লেভেল থেকেই ধরা গেছে। এই রিপোর্ট...' প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টটা এগিয়ে দিল।

'তাহলে তো এনকোয়ারি শুরু করতে হবে?' কল্যাণও কেসটা এদিকে গড়াবে আন্দাজ করেনি।

'সেটাই উচিত।'

কল্যাণ ঘামছিল। খুন!!! যেটাকে এতক্ষণ একটা রুটিন অটপ্সি ধরে নিয়েছিল তা-ই এবার তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ছুটিয়ে মারবে। কোথাকার কোন পালচৌধুরি বংশ, এখন তার এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো ওলটপালট করো! ফালতু একটা বুড়ো, তার জন্যে... নাঃ... একেই বলে ভাগ্য! কিন্তু কাজ! কী আর করা যাবে। করতে হবে।

বাড়ির বয়স্করা এসে যাবার পর অমৃতা তার দায়িত্ব অন্যদের ওপর দিয়ে নিজের গানের জগতে ফেরৎ গেল। কাগজে হেডলাইন হল। সেই হেডলাইন সুমিতের নজরেও পড়ল। তাহলে তাকে যে টেক্সট করেছিল সে মোটেই ফাঁকা আওয়াজ দেয়নি।

কিন্তু এই খুনটা কী করে আরগুলোর সঙ্গে জড়িত হতে পারে?

***

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আকাশে তারাগুলো ঝিকমিক করছে। তাদের ছায়া রবীন্দ্র সরোবরের জলে পড়ছে।

বিবেক সিংহানিয়া গাড়ি ঘোরানোর সময়েই যা দেখার দেখে নিয়েছিল। দূরে বেঞ্চে সে বসে আছে। আবছা আলোয় বেঞ্চিতে মেয়েটির সিল্যুয়েট দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেছে। সারাদিন বিচ্ছিরি গরম গেছে। এখন সন্ধের পরে একটু হাওয়ায় সারা দিনের ক্লান্তি মুছে যাচ্ছিল। আবছা চাঁদের আলোয় আইরিনকে একটু হলেও চেনা যাচ্ছে। বিষণ্ন ভঙ্গিতে বসে আছে জলের দিকে তাকিয়ে। মেয়েটা সাহস করে ওকে যে এখানে ডাকতে পেরেছে তাতেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। ও চায় না তার সঙ্গে অন্য কোথাও দেখা হোক। এনটি ওয়ানে আচমকা দেখা হওয়াতেই বুঝিয়ে দিয়েছে, ও কিন্তু তাকে মাপছে।

'দেখা করতে চাইলে কেন?' বিবেক পাশে বসল।

'তুমি কেবল রোনাল্ডোকেই মারোনি, রাবেয়াকেও মারলে!' আইরিন সরাসরি আসল কথায় চলে এল।

'ভ্যানতাড়া রাখো! আমি কেন ওসব করতে যাব? আমার কি জেলে যেতে তর সইছে না?'

'যদি ধরা পড়ো তাহলে... তুমি জানো তুমি বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু রোনাল্ডো নেই, আমার সব চলে গেছে। ও-ই যখন নেই তখন আমার আর হারানোর কী আছে! সব বলে দেব, সব...'

'কী? কী বলে দেবে? তুমি কী বলছ জানো? এইসব বেসলেস কথা বলে বাজার গরম করতে পারবে? কে পাত্তা দেবে এইসব ফালতু কথায়?'

'সেদিন কী করছিলে এনটি ওয়ানে?'

'রাবেয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম। যেতে পারি না?' বিবেক একটুও উত্তেজিত নয়। ঠান্ডা গলায় বলল,'প্রাইভেট কথা ছিল।'

'প্রাইভেট? মাই ফুট। তুমি ওকে মারতেই গেছিলে...' আইরিনের গলা এবার উঠল,'আমি ছাড়া আর কেউ এই সত্যিটা জানে না বলেই বেঁচে যাবে ভেবেছ? কথাটা বলে দিলে কী হয় দেখবে? পারবে সামলাতে?'

'মানে? আমি ওকে ওখানে কীভাবে মারব? ও কি ওইখানে মারা গেছে? যা হবার তা হয়েছে তো মেক আপ রুমের মধ্যে। সেখানে আমি কোথায়? খামোকা ওকে মারতেই বা যাব কেন?' বিবেক ওকে দেখছিল।

'কেন আবার? নিজের অপকর্ম ঢাকা দিতে এ ছাড়া তোমার আর কী করার ছিল?' আইরিন হিসহিস করে উঠল।

'তুমি ওখানে কেন গেছিলে?'

দুজনেই এ ওকে সন্দেহ করছে। দুজনেরই ধারণা যে কেউ অপরাধটা করে থাকতে পারে। রাবেয়ার তো দুজনের সঙ্গেই যোগ ছিল। আইরিন ঘটনাচক্রে জেনে গেছিল রাবেয়া বিবেকের রক্ষিতা। নিজেও ওর স্বামীকে ঠাকাচ্ছিল। কেবল পর্দায় নয় জীবনেও কারো বিশ্বাসেরই মর্যাদা রাখেনি। বিবেকের ভাগ্যে ঝামেলা একদম নেই যে তা-ও নয়। আইরিন মুখ খুললে তাকে নিয়ে পুলিস এই দুটো মৃত্যুকে সামনে রেখে টানাহ্যাঁচড়া করতে পারে কেবল নয়, করবেই। যেহেতু রোনাল্ডোর সঙ্গেও রাবেয়ার সম্পর্ক ছিল, কেসটা গড়বড় হয়ে যেতেই পারে।

'রোনাল্ডোর খুনের সূত্র খুঁজতে। তাকে ইলেক্ট্রোকিউট করে মারা হয়েছে। রাবেয়া আগেই বলে দিয়েছিল এতে তোমার হাত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রমাণও দেবার কথা হয়েছিল। তার আগেই তুমি ওকেও সরিয়ে দিয়েছ। স্মার্ট গেম! তাই তো?'

এই তাহলে ব্যাপার! এই জন্যেই কি তাহলে তার বদলে রাবেয়া আইরিনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ব্যাপারটাতেই বেশি জোর দিচ্ছিল? তাই যদি হয় তাহলে... মেয়েটা তার সোনার খাঁচা থেকে ওড়ার পরিকল্পনা করছিল যথেষ্ট আটঘাট বেঁধেই! মেয়েটা মরে কাজ কমিয়েই দিয়েছে। কী বলে গেছে একে?

গলা নামায় বিবেক, 'তোমার ধান্দাটা কী!'

'টাকা। শুধুশুধু সব চেপে যাব নাকি?'

এই মামলা! বাপের ভাগ্যি বলেনি বদলা! টাকাই যদি এর ধান্দা হয় তাহলে...

'কত চাই?'

'পঞ্চাশ লাখ। বাকি জীবনটা চালাতে হবে তো!'

ভাবছিল বলবে দামটা বড্ড বেশি ধরে ফেলেছে। ব্যবসা করে খায়, নিজের দিকটা বুঝে নিতে তাকে শেখাতে হয় কি? কিন্তু... না, আপাতত থাক...

'পরে আর কিন্তু বায়না ধরতে পারবে না। কথা দিচ্ছ? খেলাপ করলে...'

'কথা পাবে।' আইরিন আকাশে ভাসছিল।

'কাল। ঠিক সাতটায়। এইখানে...'

গাড়ির দিকে হাঁটার সময় আন্দাজ করতে পারল আইরিন তার কাছ থেকে মাল খসাতে পেরে আপ্লুত।

***

গোড়া থেকেই শ্রেষ্ঠার ব্যাপারে বিকাশের সন্দেহ একটা ছিলই। যদিও চলনে বলনে ফাঁক নেই, তবু মন বলছিল ডালমে কুছ কালা হ্যায়। সুমিত যখন বলল তখন ওর মাথায় খেলল মেয়েটার অতীতে ডুব দিয়ে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখার কথা।

সাউথ পয়েন্ট, প্রেসিডেন্সি, এয়ারটেল। স্কুলের আওতা থেকে কিছু মিলবে বলে মনে হয় না। অধিকাংশ সময় নাকি কাটত ছেলেদের সঙ্গে। কলেজে অগ্নিভ নামে একজনের সঙ্গে স্টেডি ছিল। পরে অবিশ্যি সেই সম্পর্ক ভেঙে যায় বলেই গুজব। কারণ কেউ জানে না। ছবি আঁকা বাদে আগ্রহ ছিল নাটকে। স্কুলেই বেশ কয়েকটা নাটকেও নেমেছিল। কলেজে কেবল নাটক করাই নয়, কলেজের ড্রামা ইউনিটটাই চালাত। অভিনয়ের পাশাপাশি নাটকে ডিরেকশনও দিয়েছে। যেটা অদ্ভুত তা হল তিন বছরের কলেজ জীবনে যে তিনটে নাটকে ডিরেকশন দিয়েছে তার সবকটাই আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাসের নাট্যরূপ। খুনের গল্পই পছন্দ করত। এ থেকে তার মানসিকতার পরিচয়ও মেলে। ঠিক কোন মানসিকতা সাইকিয়াট্রিস্টরাই বলতে পারবে।

মনে পড়ল তদন্তের জন্যে প্রথম সে যখন মহিলার সঙ্গে দেখা করে তখন তার বিরক্তির কথা। সুমিতকে তথ্যগুলো জানানোর আগে ঠিক করল মহিলার সঙ্গে আরেকবার দেখা করবে।

‘কখন গেলে ভালো হয়?’ সে ফোনে জানতে চাইল।

‘সবই তো বলে দিয়েছি। আবার কেন?’

‘আরো কিছু সূত্র মিলেছে। যদি সাহায্য করতে পারেন..’

যদি মেজাজ দেখায় তাহলে হয়ত তাকেই সন্দেহের তালিকায় ফেলে দেবে - এইসব সাতপাঁচ ভেবে শ্রেষ্ঠা বলল,‘শনিবার বিকেলে। আমার ফ্ল্যাটেই।’

‘ফাইন।’

শনিবার সন্ধে ছটা।

বিকাশ নির্বিকার মুখে ঢুকল ফ্ল্যাটে। এক কাপ চা অব্দি অফার করার ভদ্রতাও দেখাল না শ্রেষ্ঠা। সোজা কাজের কথায় এল,‘কী জানার আছে ?’

‘প্রিয়াঙ্কার বড়বাজারের একজন কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল জানতেন? আমিশ শাহ নামে সেই লোকটিও অদ্ভুতভাবে মারা গেছে...’

‘ও কখনো এসব নিয়ে কথা বলত না। অবৈধ কিছু নিশ্চয় সবাইকে জানানোর জিনিস নয়।’

‘স্বামীর সঙ্গে ওঁর রিলেশন ?’

‘আমি তো ওদের শোবার ঘরে কান পেতে থাকতাম না যে বলতে পারব...’

‘কিছু অন্য রকম কথাবার্তা কানে আসছে। যোগেশও নিজের সেক্রেটারি অর্চনা ভানিয়ার সঙ্গে জড়িয়েছিল। সেও অদ্ভুতভাবে মারা গেছে। মৃত্যুগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে রয়েছে বলেই তো আপাতভাবে মনে হচ্ছে... এগুলোই বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখতে বাধ্য করছে। তেমন কিছু থাকতেই পারে যা আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে অথচ আপনার নজরে পড়েছে। জানতে পারলে তদন্তে উপকার হবে...’

‘ওর অত ক্লোজ ছিলাম না। ওর প্রাইভেট লাইফ বিষয়ে কিছুই জানি না। এখানে ওখানে দেখা হত। আড্ডা হত। ব্যাস। আর কী বলব?’

‘যদি কানে কিছু আসে তাহলে জানালে ভালো হয়...’

‘জানাব।’ শ্রেষ্ঠা ফালতু কথা বাড়াবে না ঠিকই করে রেখেছিল।

‘থ্যাঙ্কস ফর ’য়োর টাইম। এক গ্লাস জল যদি...’

‘সিওর।’শ্রেষ্ঠা জল আনতে কিচেনে ঢুকতেই বিকাশ দরজার কাছে চলে গেল। নজর গেল পড়ে থাকা একটা কাগজের দিকে। মনে হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক রস ফার্মেসির বিল। চোখ চালিয়ে বিকাশ বুঝল টিওভা কেনার বিল।

জল শেষ করে রিসিটটা দেখিয়ে জিগগেস করল,‘আপনার অ্যাজমা আছে?’

‘না তো!’ ঠান্ডা গলায় বলল শ্রেষ্ঠা।

‘তাহলে এটা?’

‘কে জানে! আগে দেখিওনি!’ শ্রেষ্ঠা থতমত খেল।

‘পরিচিত কারোর অ্যাজমা আছে?’

‘যদ্দুর মনে পড়ছে, না।’

‘এটা রাখতে পারি?’

‘আমার যখন নয়, রাখুন...’ শ্রেষ্ঠা ক্যাজুয়াল।

বিকাশ সেটা পকেটে গুঁজে বেরিয়ে এল। শ্রেষ্ঠারই বাড়ির জিনিস, অথচ সে-ই জানে না এটা এখানে কী করে এল? ঠান্ডা মাথায় মিথ্যে বলছে না তো! আবার হতেও পারে, কেউ কোনো কারণে ফেলে গেছে। কিন্তু তাতেও কি হিসেব মিলছে? তার তিন নম্বর চোখ খুলে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছে... কিন্তু তার আগে এটা দেখলে সুমিত কী বলে আগে শোনা যাক।

ফেরার পথে সুমিতকে ফোন করল, ‘দেখা করা যায়? মনে হচ্ছে ক্লু আছে। জানি না কতটা কাজে আসবে, কিন্ত...’

‘সিওর। যখন হোক চলে আসুন প্লিজ।’

***

আয়ুষী জানলা খুলতেই সকালের আলো খাবার টেবলে এসে পড়ল। পাখির ডাক কানে আসছিল সুমিতের। ব্রেকফাস্টের ফাঁকে ফাঁকে কাগজের হেডলাইনগুলোয় চোখ বোলাচ্ছিল। পড়তে পড়তে বাঁ দিকের কলমে একটা খবরে চোখ আটকাল।

পালচৌধুরীর মৃত্যুর কেসে নাকি নতুন তথ্য সংযোজন হয়েছে। ফরেনসিকরা মনে করছে এর পেছনে সোডিয়াম সায়ানাইড বিষও নাকি আছে। টোস্টের যে অংশটা তার গলা দিয়ে নামছিল তার সঙ্গে শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিম কিছুও যেন নেমে গেল। মনে পড়ে গেল সেই রোববারের বিকেলে আয়ুষীর সঙ্গে সিনেমা দেখার সময় যে ওয়ার্নিং এসেছিল সেটার কথা। আগে খবরে লিখেছিল মুকুন্দবাবুর বংশের কথা, বলা হয়েছিল ভদ্রলোক সম্ভবত বয়েসজনিত অসুখেই মারা গেছেন বলে মনে করছে পুলিস। আজকের খবরে নড়েচড়ে বসল। কোমল ঋষভ আশাবরীর তান কখন চন্দ্রকোষে বদলে গেছে খেয়ালই করেনি।

‘বিরক্ত করলাম... স্যরি... যদি একটা উপকার করতেন...’ শুভঙ্করকে ফোনে ধরল।

‘বলুন...’

‘মুকুন্দ পালচৌধুরীর অটপ্সি রিপোর্টটা যদি পেতাম! আজকের টিওআই-র প্রথম পাতার বাঁদিকের কলামটা দেখুন। সম্ভবত এম জি রোডের হোটেল রয়্যালে মারা গেছেন ভদ্রলোক।’

‘আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার আন্ডারে। বলতে পারছি না কতটা কী করতে পারব। কেন? ওটাও কি আর সব মার্ডারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে?’

‘হতেই পারে।’ সে গভীর চিন্তায় পড়ে গেছে।

‘দেখি।’

তাহলে কি যথেষ্ট বুদ্ধি খাটাচ্ছে না? নটা খুন! আর এখনো কিনা ওরা সেই মোটিভ নিয়েই লড়ে যাচ্ছে? আসলে গোটা ব্যাপারটাকে কোনো ছকে ফেলতে পারছে না - এটাই সমস্যা। কিন্তু এ-ও হতে পারে না।

ছক একটা থাকতে বাধ্য। সে-ই ধরতে পারছে না। নিশ্চয়ই কিছু নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। স্ট্যাটিস্টিক্সের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে, নইলে খামোকা তাকে জড়ানো হবেই বা কেন! যত তাড়াতাড়ি সে ছকটা ধরতে পারবে তত প্রাণ বাঁচাতে পারা যাবে। বুদ্ধির গোড়ায় খোঁচা তো এমনি পড়বে না, তার জন্যে ভাগ্যও লাগে। চাইছিল লাক ফেবার করুক।

ইন্সটিটিউটে বেরোবার সময় চৌবের কল এল,'দেখা করা যাবে?'

'আইএসআই-তে বেরিয়ে যাচ্ছি। বিকেলে, সাড়ে ছটার পর যদি...'

'ওকে, তাহলে সাতটায়।'

সাড়ে সাতটা নাগাদ চৌবে এল। সুমিত ফিরে স্নান সেরে ড্রিঙ্কস নিয়ে বসতে যাবে এমন সময় ঢুকল ।

'হোক তাহলে একটু...'

'হতেই পারে।' বিকাশ কৌচে এলিয়ে বসল।

জনি ওয়াকার রেড লেবেলের বোতলটা বার করে ঢালল সুমিত। কয়েক পেগের পরেই আস্তে আস্তে মন মেজাজ ঠান্ডা হয়ে এল। বিকাশ বলছিল, 'এনকোয়ারির জন্যে শ্রেষ্ঠার ওখানে গেছিলাম। শ্রেষ্ঠাকে মনে আছে নিশ্চয়।'

'ওর ইতিহাস জেনে গেছেন বোধহয়।'

'মেয়েটাকে ডুবিয়াস মনে হল। সময় নিয়ে ওর পেছনে পড়তে হবে। যতদূর জানি প্রেসিডেন্সির দিনগুলোয় মেয়েটা ছিল ছেলেদের মতো ডানপিটে। অভিনয় করত। প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময় বেশ কয়েকটা নাটকে কেবল অভিনয়ই করেনি এমনকি ডিরেকশনও দিয়েছে। তিনটে নাটকই আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাস থেকে। কেমন যেন মনে হচ্ছে না! '

'বেশি ভাবছেন কেন! কোয়েন্সিডেন্সও তো হতে পারে।' সুমিত তাকাল।

'হতেই পারে। কলেজ থেকেই বেছে বেছে কেবল রহস্য গল্পের দিকে নজর তো, এটাই খচখচ করছে... যাই হোক, ওর ফ্ল্যাটে এটা পেয়েছি...' বলতে বলতে পার্স বের করে ওষুধের রিসিটটা সামনে রাখল বিকাশ।

সুমিত দেখছিল। বালিগঞ্জ ফ্র্যাঙ্ক রস থেকে টিওভা কেনার রিসিট। অন্য সময় হলে উপেক্ষাই করত। কিন্তু সকালের খবরটাই সজাগ করে দিয়েছে। সত্যিই যদি পালচৌধুরীর মৃত্যু সোডিয়াম সায়ানাইড বিষক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে এই ইনহেলার দিয়েও তো এটা ঘটানো যায়। বিষয়টা নিয়ে ফার্মা লাইনের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা দরকার মনে হচ্ছে।

'কে এই ইনহেলার কিনেছে জানতে চাওয়ায় কী বলল?'

'বলছে তো নাকি জানেই না এটা কোত্থেকে তার বাড়িতে এল!' বিকাশ নিজের গ্লাসে একটা ডাবল ঢালল।

'মানে? এটা কি তা'লে তার ফ্ল্যাটে উড়ে এসেছে? নাকি কাকে-পাখিতে?'

'বলছে তো তা-ই। যদি না কেউ ফেলে গিয়ে থাকে...'

'কেউ বিশ্বাস করবে না! কারোর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, গিয়ে অন্যের ফ্ল্যাটে... পাত্তা লাগান...'

'আপনিও তা-ই মনে করছেন?' চৌবে কনফিডেন্ট।

'কী পেলেন জানার ইচ্ছে রইল। এটা কি রাখতে পারি?'

'সিওর। এটা তো খুনের জায়গায় পাওয়া এভিডেন্স নয়!'

শ্রেষ্ঠা? তার নাম করে ফোন আসার পরেও সে বেঁচে গেছে। এই প্রথম ঘটেছে এমনটা। হতে পারে ওকে গার্ড করতেই এটা করা। হতেই পারে। চাবুকের মতো স্মার্ট, প্রেসিডেন্সির ব্যাকগ্রাউন্ড, কেবল ব্রিলিয়ান্টই নয় যথেষ্ট বিচক্ষণও। ও-ই যদি কালপ্রিটও হয় তাহলেও কি এমন একটা ফালতু জিনিসে ফাঁসবে? মনে হয় না।

‘প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে?’ চৌবে এখন বেশ টিপসি।

‘জানি না। মহিলার ওপর নজর রাখুন। সম্ভব হলে মেয়েটির ব্যক্তিগত জীবনের ডিটেলস জোগাড় করার চেষ্টা করতে হবে।’

বিকাশ মাথা নাড়ল। রোনাল্ডো, প্রিয়াঙ্কার কেসের গোলকধাঁধা থেকে যেভাবেই হোক মুক্তি চাই। তিন নম্বর রাউন্ড চলছে যখন তার ফোন জ্যান্ত হল। সুমিত তাকিয়েছিল। বিকাশের মুখ বিবর্ণ, ‘আসছি।’

‘কী হল?’

‘সানি পার্কে দৌড়তে হবে। রোনাল্ডোর বৌ আইরিন দরজা খুলছে না! শালা, এইসব মাতাল মাগিগুলোর জ্বালায় একটু যে হাঁফ ছাড়ব তার জো নেই! যাও, দৌড়ও...’

হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে গেল। সুমিত বসে জটটা ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। রোনাল্ডোর ইলেক্ট্রোকিউশনের পর তার বৌ! এখানেও কি তাহলে শ্রেষ্ঠা... তার বুদ্ধি সায় দিচ্ছে না। কিন্তু প্রমাণটা... সে কি কিছু মিস করে যাচ্ছে... যদি হয়ও, সেটা কী?

সুমিত গেলাসটা এক চুমুকে সারল। মাথার মধ্যে তরলটা আছড়ে পড়ার আগেই মোবাইল বাজল। টেক্সট... **‘আইরিন। খুব বুদ্ধিমান মনে করছিলে নিজেকে? সুমিত দাস? আর বাকিরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলে?’**

বড় বড় চোখে সে বার বার টেক্সটটা পড়ছিল। এই মৃত্যুটাও তাহলে একই সুরশৃঙ্গারের অংশ! কিন্তু এই মিউজিকের কন্ডাক্টর, সেটা কে?

***

‘টাকাটা কোথায় নেবে?’

আইরিন এক মুহূর্ত ভাবল, পাব্লিক প্লেসে অতগুলো টাকা... তার থেকে বাড়িতে হলে কেমন হয়!

‘সানি পার্কে আমার বাড়িতে।’

‘ফাইন। তাহলে সাতটায়।’

রোনাল্ডো নেই। নিজের জীবনটাকে নিশ্চিত করে নিতে হবে! বাড়ি থেকে যা পেয়েছিল তা-ই দিয়ে সানি পার্কের এই অ্যাপার্টমেন্টটা হয়ে গেছে। মানে শেল্টারটা সিকিওরড। এবার চাই দিন গুজরানের খরচাপাতি। টাকাটা নিশ্চয় ব্ল্যাকেই হবে, যা এমনিতে খরচা করা মুসকিল। শনিবারের রেসের মাঠ থেকে সাদা করে নেবে। সময় লাগবে, কিন্তু সমস্যা হবে না। ব্যাঙ্ক লোন নেবে। শোধ করবে রিজার্ভ থেকে। বাকিটা খরচা হিসেবে রাখলেই হবে। নিউ টাউনে একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখলেও পরে কাজে আসবে।

সাতটার ঠিক পরেই ব্রিফকেস নিয়ে বিবেক এল।

‘কফি?’ আইরিন জানতে চায়।

‘নাঃ। এখন কফি মানেই ইনসমনিয়া...’ ব্রিফকেসটা খুলল বিবেক, ‘গুনে নাও...’

‘তাহলে আমি নিই? ড্রিঙ্কস?’

‘নাঃ।’ বিবেক তাড়াতাড়ি কাটবে। এখানে স্পটেড হওয়া চলবে না।

কিচেন থেকে ফিরে গুনতে বসবে এমন সময় বিবেক মত বদলাল,‘বিয়ার অবশ্য চলতেই পারে। আছে নাকি?’

‘দেখছি। ফ্রিজে তো একটা ছিল!’ বলতে বলতে টেবলে নিজের কাপটি সরিয়ে উঠে গেল ভেতরে। ফিরে এল,‘কার্লসবার্গ, স্পেশাল ব্রিউ। চলবে?’

‘ফাইন। মাগ আছে?’

‘আনছি।’ কিচেনে গিয়ে মাগ নিয়ে ফিরে এল।

যতক্ষণ গুনল বিবেক বসে খেয়েই চলল। যদিও দু হাজার টাকার নোটের তাড়া, তবু পঞ্চাশ লাখ গুনতে সময় তো লাগবেই।

একবার ছেড়ে দুবার গুনে বলল,'ফাইন। পঞ্চাশই আছে।'

'আর কোনো ট্যাঁ ফোঁ যেন না শুনি! গপ্পো এখানেই শেষ, ওকে।' বিবেকের বিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল,'রাবেয়া মারাই শুধু যায়নি, ওর নামটা অব্দি হাওয়া।'

'ডিল ইজ ডিল।'আইরিনও মাথা নাড়ল।

বিবেক যাবার পর আইরিন উঠে ওর মাগটা ধুয়ে ক্যাবিনেটে রাখল। আচমকা কেউ এসে গেলে মুস্কিল। শেডি ডিল লোকচক্ষুর আড়ালে থাকাই ভালো। টেবলে ফিরে খুশি মনে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের কাপটা টেনে নিল। কী হল! কেমন যেন একটা লাগছে! শ্বাস নিতে অসুবিধে... চোখের সামনে একের পর এক রঙের বল ঘুরছে তো ঘুরছেই... কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছে না... বড় করে শ্বাস নিতে চেষ্টা করল। বুকে একটা ব্যথা টের পাচ্ছিল। টেবলে মাথাটা রাখলে কি ভালো লাগবে? নাঃ, মাথাটা কেমন ঘুরছে এখনো। চোখ বুঁজল। তারপর সব অন্ধকার। সানি পার্কের অন্ধকার শান্তি গ্রাস করে নিল সব কিছু।

***

বিকাশ চৌবে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। আইরিনের ফ্ল্যাটের সামনে অপেক্ষা করছিল কখন সরকারি লকস্মিথ এসে দরজার তালা ভাঙে। নেশাটা আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। সুমিতের বাড়িতে নেশাটাও ঠিক মতো হল না আবার সোহিনীর সঙ্গে শোয়ার সুযোগও নেই। কে জানে এই কেসটাও প্রিয়াঙ্কার মতো কিছু কিনা। হলে তো আবার... একের পর এক খুন হয়েই যাবে আর তার সমাধানের কোনো উপায়ই রাখা হবে না এ তো আর নেওয়া যাচ্ছে না! এই লাইনে আরো একটা... ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল।

দুপুরে আসা একটা পার্সেল দিতে ভুলে গিয়েছিল বলে আইরিনকে বারবার ফোন করে, এমনকি ভিডিও কল করেও সাড়া না পেয়ে শেষে ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকারই থানায় খবর দেয়। তার মনে হয়েছিল ম্যাডাম হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার ডাক পেয়ে এক সাব-ইন্সপেক্টর আসে। এখনো ভাবতে চাইছে ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। হারামজাদা তালার লোকটা করছে কী! নিজে যদি পনের মিনিটে সেই সলটলেক থেকে চলে আসতে পারে তাহলে এর এত দেরি হচ্ছে কেন! লোকটা এসে দরজার তালা ভাঙতে তবে শান্তি হল বিকাশের।

আইরিন ডিনারে বসে টেবলে মাথা রেখে পড়ে আছে। টেবলে একটা আধ-খাওয়া কফির কাপ। বিকাশ এগিয়ে গিয়ে পালস দেখল - নেই। চোখের তারা দেখল - স্থির। মারা গেছে। আরো একটা মৃত্যু। ফ্ল্যাট সার্চ করল। কিচ্ছু পেল না। রুটিন ব্যবস্থা করে সুমিতকে ফোন লাগাল,'ঢুকেছি ভেতরে। আইরিন মারা গেছে। বডি পোস্ট মর্টেমে যাচ্ছে।'

বডি ছেড়ে দিয়ে ফ্ল্যাট সিল করে দিল বিকাশ। তারপর সোহিনীকে ধরল ফোনে,'আরেকটা মৃত্যু! রাজ বাড়ি ফিরেছে?'

'না, বাঙ্গালোরে। কাল ফিরবার কথা...'

'খিদে পেয়েছে! ফিরছি।'

'যা পাবে খেয়ে নিও।'

ডেথ কেসের তদন্ত কাল অব্দি অপেক্ষা করুক। আজকের কাজ আজ।

ড্রিঙ্কসের নেশায় হতভম্ব সুমিত খবরটা হজম করার চেষ্টা করছিল। যুক্তি কাজ করছে না। আয়ুষী খাবার নিয়ে ডাকবে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বাইরে অন্ধকার গাঢ় । আজ রাতে স্বপ্নও তার পথ মাড়াবে না। যদি কাল সকালেও বুদ্ধি সতেজ না হয়? এভাবেই একটার পর একটা মৃত্যু হাত গুটিয়ে দেখতে হবে? জানতই না কাল ঈশ্বরের বরমাল্য তার অপেক্ষায়।

***

যোগেশ আইরিনের খবরটায় নড়ে বসল। হয় আজ নয় কাল এটাই হবার ছিল। তার মাথায় ঘুরছিল ক্রিস্ট্যাল রুমে আইরিনের কথাগুলো,'বিবেক খুব গভীর জলের মাছ। টাকা আর মাসল পাওয়ার দুটোই ওর হাতে কথা বলে। জানলে ও আমাকেও যে কোনোদিন সাফ করে দেবে।' এর পেছনে বিবেকের হাত না এটা স্বাভাবিক মৃত্যু অটপ্সিই বলবে।

রিপোর্ট যা এল তাতেও চমকাল না। খুব বেশি ক্যাফিন শরীরে যাওয়ায় আইরিন মারা গেছে। কাগজেই পড়েছে ওকে নাকি পাওয়াও গেছিল ডাইনিং টেবলে, সামনে কফির কাপ ছিল। কফি কে না খায়! কিন্তু এই প্রথম শুনল কেউ বেশি ক্যাফিনের জন্যে মারা গেছে। গুগলে গিয়ে দেখল পাঁচ গ্রামের বেশি ঘন কফি পাউডার মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। বাজারে নুট্রিজা নামে এরকম ঘন কফি পঞ্চাশ গ্রাম প্যাকেটে মেলে। সেই প্যাকেটের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পেটে গেলেই সর্বনাশ। কিন্তু আইরিন আত্মহত্যা করার মেয়েই ছিল না। নিশ্চয় এর পেছনে কারো হাত আছে।

বিবেক সিংহানিয়া ছাড়া আর কে হতে পারে?

এমনিতেই পুলিশে ছুঁলে যে আজকাল আর বাহাত্তর নয় রীতিমতো বাহাত্তর হাজার ঘা তা প্রিয়াঙ্কা আর অর্চনা মারা যাবার পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। চৌবে তাকে কাস্টডিতে নিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছে কত ধানে কত চাল হতে পারে। জামিনে বেরিয়েই ধান্দা ছিল কী করে সবার নজরটা ঘুরিয়ে দেওয়া যায়! অর্চনাকে নিয়ে ঝামেলা! আজকাল ঘরে বৌ রেখে অফিসে সেক্রেটারির সঙ্গে লটঘট কী নতুন কিছু নাকি? একঘেয়ে জীবনে একটু মশলা! এসবও তো চাই। তাই বলে মার্ডার চার্জে শ্রীঘর? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

এবার সে-ও নড়েচড়ে উঠল। চৌবেকে ফোনে ধরল, 'আইরিনের মারা যাবার খবর পেয়ে খারাপ লাগছে! মেয়েটা খামকা আত্মহত্যা করার মেয়েই নয়। খবরে দেখলাম ও নাকি বেশি ক্যাফিন খেয়ে মারা গেছে। অদ্ভুত না?'

'খুন?'

'আপনিই ঠিক করুন কী বলবেন। গুগলে দেখলাম নুট্রিজা কনসেনট্রেটেড ক্যাফিন পাউডার। কফিতে বেশি মিশিয়ে দিলে মৃত্যু অনিবার্য।'

যাঃ বাবা! কোর্টের বিতিকিচ্ছিরি অভিজ্ঞতা থেকে বিকাশ এই ব্যাপারটাকে নজরে আনতেই চাইছিল না। গলায় ঝাঁজের সুর।

'ওর ফ্ল্যাট কিন্তু বন্ধ ছিল। আমরাই গিয়ে দরজা ভেঙে ঢুকলাম...'

'এমন কি হতে পারে না যে কেউ হয়ত এসেছিল কফি খাবার আগে।'

হতেই পারে।

'কিন্তু কে?'

'আইরিন একদিন বলেছিল বিবেক সিংহানিয়া খুব গভীর জলের মাছ। টাকা আর মাসল পাওয়ার দুটোই ওর হাতে। চাইলে যে কাউকে সাফ করে দিতে পারে! না না, আমি কিছু বলছি না। কিন্তু একটু বাজিয়ে দেখাই কি ভালো নয়?'

বিবেক সিংহানিয়া!

প্রোমোটিং 'ইন্ডাস্ট্রি'-তে বড় খেলোয়াড়। বৃত্তটা আরো বড় হচ্ছে। যোগেশ কি বলটা পাস করে দিতে চাইছে? হতেও তো পারে লোকটা সৎ। চেক করে দেখতেই বা অন্যায় কোথায়?

'দেখতে তো হবেই।' ফোনটা কেটে দিল।

***

শুভঙ্কর অটপ্সির রিপোর্টটা এগিয়ে দিল,'এসব মেডিক্যাল জারগন বুঝি না। যাক গে, এই হল অটপ্সি রিপোর্ট।'

সুমিত চুপচাপ পুরোটা পড়ে ফেলল। সে-ও এসব বিষয়ে পণ্ডিত নয়, তবে মোদ্দা যেটা বুঝল তা হচ্ছে মুকুন্দ পালচৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে সোডিয়াম সায়ানাইড বিষক্রিয়ায়, সম্ভবত বিষটা দেহে ঢুকেছে শ্বাসের সঙ্গে।

'উনি কি অ্যাজমায় ভুগতেন?'

'এইটাই আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ওসি কল্যাণবাবুর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। শুনলাম উনি ইনহেলার নিতেন। ওঁরই এক আত্মীয়া দরকার হলে এনে দিতেন।'

'কে?' সুমিত চোখ তুলল।

'কে তা অবিশ্যি বলতে পারব না। উনি বললেন একজন মহিলা। নদীয়ার বালাখানার মহেশগঞ্জ এস্টেটের কোনো একজন শরিক। অনেক বছর ধরে একলাই নিউ রয়্যাল হোটেলে থাকতেন।'

'মহিলার নামটা জানা যায়?'

'কল্যাণবাবুকে জিগগেস করছি।'

'রিপোর্টটা রেখে যেতে পারেন?'

'নিশ্চয়। এটা তো জেরক্স। আপনার জন্যেই করানো।'

সে বেরিয়ে যাবার পর সুমিত ধাঁধার হাতে না থাকা অংশগুলো নিয়ে ভাবছিল। চৌবের দিয়ে যাওয়া ফার্মেসির রিপোর্টটা বার করল। ইনহেলার কেনা হয়েছে বালিগঞ্জ ফ্র্যাঙ্ক রস ফার্মেসি থেকে। এটাই যদি মুকুন্দবাবুকে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ক্রেতা থাকার সম্ভাবনা বালিগঞ্জে। কিন্তু এই ইনহেলারটাই কি মুকুন্দবাবুর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল? শ্রেষ্ঠার কাছ থেকে পাওয়া যেহেতু, ফলে তাকে সন্দেহের তালিকায় রাখাই যায়। তাহলে কি সে-ই সে মহিলা যে গিয়ে ভদ্রলোককে এটা দিয়ে এসেছিল? এই টিওভাতেই সোডিয়াম সায়ানাইডটা মেশানো হয়ে থাকতে পারে। শ্রেষ্ঠাই কি বুদ্ধি করে বুড়োকে সরাবার জন্যে কাজটা করেছে?

তাহলেও প্রশ্ন, কেন!

এখানেই ধাঁধার শুরু আর শেষ। বুড়ো মানুষটিই কি তবে টার্গেট ছিলেন? নাকি বিরাট কোনো ছকের অংশ মাত্র? এটা মানা মুশকিল যে কেউ একজন বৃদ্ধকে হত্যা করবে অথচ তাঁর সম্পত্তি বা ইন্সিওরেন্সের টাকা ইত্যাদি নিয়ে কোনো বক্তব্য থাকবে না। এখন মনে হচ্ছে যদি আইএসআই-এর অধ্যাপক না হয়ে পুলিস হত তাহলেই বোধহয় ভালো হত। সহজেই তাহলে সে খুনিদের পেছনে ধাওয়া করতে পারত, যেটা তার মতো কোনো সাধারণ লোক শত চেষ্টা করলেও পেরে উঠবে না। করতে দেওয়া হবে না। আবার পুলিসেরও সমস্যা কম নয়। তাদেরকেও হাজারো প্রোটোকল মানতে হয়, যেটা মানার দায় আবার তার নেই।

চৌবেকে ফোনে ধরল,'আইরিনের মৃত্যু ব্যাপারটা নিয়ে কিছু এগোলেন?'

'অটপ্সি রিপোর্টের জন্যে বসে আছি। যোগেশ অবশ্য অন্য কথা বলছে।'

'যোগেশ কে?'

'প্রিয়াঙ্কার স্বামী। তার ধারণা এর পেছনে বিবেক সিংহানিয়ার হাত আছে।'

'সিংহানিয়াটাই বা কে?'

'বিরাট প্রোমোটার। আইরিন নাকি কখনো যোগেশকে বলেছিল বিবেক ওকে খুন করতে পারে!'

'ওর মারা যাওয়াটা নিয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই কি যে এটা খুন?'

'এমনিতে। তবে পিএম রিপোর্ট না পাওয়া অব্দি...'

'তার আগে ফালতু কথায় কান দেবেন না।'

'সেদিন ঘটনার আগে সারাদিন ওর সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছিল তাদের একটু বাজিয়ে দেখে নিতে হবে।' চৌবে ফোন কেটে দিল।

আরো জটিল হয়ে যাচ্ছে। শ্রেষ্ঠার ওপরেই নজর নিবিষ্ট রাখতে চাইছিল। আর সেখানেই এবার চৌবে কোন এক সিংহানিয়াকে আমদানি করতে চাইছে। বুদ্ধির খেলায় তাকে খুঁজে বার করতে হবে ঘটনাগুলোর মধ্যে আদৌ কোন প্যাটার্ন আছে কিনা! জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে কালো আকাশের দিকে তাকায়। অন্ধকারের মধ্যেও যেন কোথাও একটা বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে রয়েছে। সংখ্যা... কতকগুলো সংখ্যা... এইটেই কেবল চাবি যা দিয়ে রহস্যের দরজা খুলতে হবে। যদি পারে তাহলেই একমাত্র পরের মৃত্যুগুলোকে ঠেকাতে পারা যাবে? বিচিত্র কোনো সাইকোটিক ছকই হয়ত কাজ করছে এর পেছনে। কিন্তু কী সেটা? ব্যাপারটা নিয়ে কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বললে হয়। অঙ্ক, বুদ্ধি আর মনোবিজ্ঞান - বিচিত্র কম্বিনেশন তার সামনে। এর সমাধান করতে হলে সমস্ত ব্যাকআপই চাই। উপন্যাসের কাল্পনিক গোয়েন্দাদের সেই সুযোগ থাকতে পারে, তার নেই। দিবাস্বপ্নের ঘোরে লেখা গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে সে নেই। এখন কঠিন বাস্তবে।

***

সানি পার্কের সিকিউরিটি গার্ডকে দিয়েই শুরু করা ভালো। চৌবে তাকে জিগগেস করল,'যেদিন ম্যাডাম আইরিন মারা গেল সেদিন কে কে এসেছিল ওঁর ফ্ল্যাটে?'

'আমি সেদিন ছিলাম না। আন্দাজে বলি কী করে?'

'তোমরা কি ভিজিটরদের কোনো রেজিস্টার রাখো?'

'রেজিস্টার একটা আছে। ব্যবহারও যে হয় না তা নয়। সাধারণভাবে ফ্যাটের মালিককেই ফোন করে জেনে নিই যিনি এসেছেন তাকে যেতে দেব কিনা।'

চৌবে হতাশ হল। তাহলে তো কেউ এসে থাকলে বার করা মুস্কিল। হতাশ মুখে সে যখন আইরিনের ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়াচ্ছে তখন গার্ডটিই বলল,'স্যার, এখানে অবশ্য একটা সিসি টিভি আছে, যাতে কেউ অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ ঢুকলে দেখা যায়।'

আহ্‌হা! একটা উপায় তাহলে রয়েছে!

'রেকর্ডিং হয়?'

'কম্পিউটার রুমে আসুন।'

মোটামুটি যে সময়ে ঘটনাটা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে তার কাছাকাছি সময়কার ফুটেজ বার করল। এই তো একজনকে দেখা যাচ্ছে আইরিনের দরজার কাছে। হাতে ব্রিফকেস। এই কি বিবেক সিংহানিয়া, যার কথা যোগেশ বলছিল? হুঁ, তাহলে আইরিনের কাছে সেদিন সত্যিই একজন হলেও এসেছিল। যদিও এ-ই যে বিবেক সিংহানিয়া নিশ্চিত নয় তবু যে-ই হোক এ কিন্তু ঘটনায় জড়িত থাকতেই পারে। নিজের ফ্ল্যাশ ড্রাইভে ছবিটা কপি করে নিল। তারপর আইরিনের ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়াল।

রোনাল্ডোর মৃত্যুর তদন্তের সময় এখানে এসেছিল। ছড়ানো লাউঞ্জ কাম ডিনার রুমে তেমন কিছু চোখে পড়েনি। কফির কাপ চলে গেছে কেমিক্যাল ল্যাবে। শোবার ঘরের ডাবল বেড খাটটি টিপটপ। বেড শিট টানটান। আইরিন শোবার সুযোগই পায়নি। বালিশের এক পাশে একটা নীল প্যান্টি আর ব্রা রাখা। মুহূর্তের জন্যে সোহিনীর শরীরটা মনে এসে যেতেই শক্ত হয়ে উঠল। এগুলো পরে কেমন দেখাত মেয়েটাকে! ডান দিকে ওয়ারড্রোব। মেঝেয় নীচের দিকে একটা অ্যাটাচি কেস। পাশে বিরাট সাইজের হ্যান্ডব্যাগ। বাথরুমে শাওয়ার কিউবিকল। র‍্যাকে তোয়ালে ঝুলছে। হুকে জিনস আর স্কাই ব্লু টপ। ব্যাগটায় মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগে যা যা থাকার তার থেকে আলাদা কিছু পেল না - পাউডার, কসমেটিক্স কিট, মোবাইল ফোন, ফ্যান্সি রুমাল, কোহিনূর কন্ডোমের প্যাক। বেশ কিছুদিন হল রোনাল্ডো মারা গেছে। তাহলে কি আর কেউ ছিল? নাকি কোনো আর্বানাইটের ব্যাগ বলেই...

ড্রেসারের পাশে অ্যাটাচিটা খুলল। আর অমনি চোখ বড় বড় - তাড়া তাড়া নোট। ভিডিও রেকর্ডিংটা মনে পড়ল। এই অ্যাটাচিই লোকটার হাতে ছিল না? তাই তো! লোকটা এটা দিতেই এখানে এসেছিল। পরিষ্কার খুনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই লোকটাও নিশ্চয় তাতে জড়িয়ে আছে। মোবাইলটা নিয়ে কলগুলো খুঁটিয়ে স্টাডি করার জন্য ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়ল। লোকটা কে? এ-ই কি তাহলে বিবেক সিংহানিয়া? হলে একে আগে জিগগেস করা দরকার।

'হ্যাঁ। টাকা দিয়েছিলাম...'

'কেন?'

'ব্যক্তিগত কারণ। ট্রেড ডিল নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলি না। এটাই আমাদের রীতি।'

'উনি বেঁচে থাকলে দরকার হত না।'

'দুঃখিত। ঘটনাচক্রে সেদিন আমি গিয়ে পড়েছিলাম!'

'তারপর।'

'দেখা হবার কথাই ছিল।'

'সিসিটিভি ফুটেজে তাই...'

'হ্যাঁ। টাকা দিই। ও কফি অফার করল। আমি নিইনি। কফি খেলে ঘুমে ডিস্টার্ব হয়। বিয়ার খেয়ে চলে এলাম।'

'কী বিয়ার ?'

'কার্লসবার্গ স্পেশাল ব্রিউ।'

টেবিলে কোনো বিয়ার মাগ দেখেনি। আইরিন কি সেটা ইচ্ছে করে সরিয়ে ফেলেছিল? নাকি আর কারোর কাজ, যে তারও পরে এসেছিল? বিবেক ঠান্ডা চোখে ওকে মাপছিল। জিজ্ঞাসাবাদে কোনো আপত্তি করেনি। এই ফিল্ডে অনেকদিন হয়ে গেল। আগে কোনো কালপ্রিটকে এত কুল দেখেনি। আর যাই হোক মুখে তো ছায়া পড়বেই। নাকি ঠান্ডা মাথার খুনে?

'কতক্ষণ ছিলেন ওখানে?'

'বিশ-পঁচিশ মিনিট হবে। একটা বিয়ার শেষ করাটুকু, ব্যস!'

'পরিচয়ের সূত্র?'

'ওর হাসব্যান্ডের বাইরের অনেক প্রোগ্রামই স্পনসর করেছি। অ্যাজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, এসব আমাদের করতেই হয়।'

বিকাশ মজাই পেল। বাংলার প্রোমোটাররা তাহলে নিজেদের 'ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট' বলছে! ইন্ডাস্ট্রি কোথায়? এই রাজ্যে, শাসক দলের কল্যাণে ইন্ডাস্ট্রি ব্যাপারটাই হাওয়ায় মিশে গেছে! মজাই লাগছিল। এই সিংহানিয়া লোকটার ব্যবসার হালহদিশ যদিও জানে না তবু লোকটার নাম আছে। হয়ত শাসক দলের সঙ্গে গা ঘষাঘষি আছে বলেই। এমনিতে এসব লোককে যেমন ঘাটায় না আবার পোঁছেও না। ডিটেলস না জেনে ফালতু ফেঁসে যাওয়া মোটেই কোনো কাজের কথা নয়।

যদি এইসব খুনখারাপি না হত বালিগঞ্জ পোস্টিং-এর হিসেবে দারুণ জায়গা। যেহেতু উচ্চ মধ্যবিত্তদের বাস, সোনার খনি বললেও কম বলা হয়। সোহিনীও কাছেই থাকে। যখন তখন হাত বাড়ালেই কাজ হয়ে যায়। আর কী চাই! একটু এদিক ওদিক হলেই ধ্যাদ্ধেড়ে কোন গোবিন্দপুরে ঠেলে দেবে কে জানে!

'আইরিন মারা গেছে কফি থেকে ক্যাফিনের বিষক্রিয়ায়। এ জিনিস আমরা হরদম খাই। প্রাথমিক পরীক্ষা হয়েছে। ফুল অটপ্সি এখনো হয়নি। বলা যাচ্ছে না খুন না সুইসাইড। একমাত্র খটকা হল আপনি খাচ্ছিলেন কার্লসবার্গ বিয়ার আর ও কফি। কেন? খুব স্বাভাবিক কী? বিয়ার মাগটাও কিন্তু পাওয়া যায়নি...'

বিবেক বুঝতে পারছিল চৌবে যদিও ধন্দে আছে কিন্তু তার ওপর সন্দেহও আছেই। সন্দেহ থাকলেই ঝঞ্ঝাট। তদন্তে তোলপাড় করবেই। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্টেটমেন্টও নেবে। যাচিয়ে নেবে।

'যেটা হয়েছিল বলেছি। বিশ্বাস-অবিশ্বাস আপনার মামলা।' সে থামল, 'আর বাস্তবে এরকম ঘটনা ঘটবেই। বিশেষ করে ট্রেড ডিলে এরকম উলটো পালটা হয়ই। আপনাকে বাস্তবকে বুঝে নিয়ে পা ফেলতে হবে।'

বলটা ওর কোর্টে চালান করে দিয়ে সে যখন ফোন রাখল চৌবে তখন বিশ বাঁও জলে।

***

ডাঃ অনঙ্গ দত্ত সুমিতকে তার ক্যালক্যাটা গ্রিনসের ফ্ল্যাটে সাদরে আমন্ত্রণ জানাল। শনিবারের বিকেলটা স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মেরেই কাটাবে। এমনিতে এত ব্যস্ত থাকে অন্যদিকে চোখ দিতেই পারে না। স্কুলের দিনগুলোয় সুমিত ছিল অঙ্কে তুখোড়। তার নিজের টান ছিল সাহিত্যে। পরে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে, পাশ করে বেরোনো, ধীরে ধীরে এক সময় কখন পেশাটাই নেশা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি। নিজের ফিল্ডে এখন যথেষ্ট নামী। নামের সঙ্গেই এসেছে ব্যস্ততা। সুমিতকে পেয়ে ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল।

'আয়ুষীকেও আনবি তো! জমে যেত।'

'আমাদের আড্ডায় বসে বেচারি বোর হয়ে যেত। তাই...'

অনঙ্গ বারের দিকে এগোল,'আয়ুষী আসছে না বলে তনুকাও ওর বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বলল, 'তোমরা তো পুরনো দিনের গপ্পে মেতে থাকবে। আমি কেন মধ্যিখান থেকে বোর হই? ১২ বছর পুরনো কারধুই?'

'আগে খাইনি...'

'স্পেনে সেই ক-বে কিনেছিলাম! বিলেতেও খুব চলে না। কেন ঈশ্বরই জানেন...'

'ফাইন, চল টেস্ট তো করি।'

বোতলটা নিয়ে ফিরে অনঙ্গ টাম্বলারে বড় মাপে দুটো পেগ ঢালল,'অন দ্য রকস?' কাজের লোককে হাঁক দিল,'বরফ দিয়ে যাও আর তনু কী করে রেখে গেছে দ্যাখো...'

বেকড স্টাফড ক্যাপ্সিকাম। তনু এখনো তার প্রিয় জিনিসটা ভোলেনি। সুমিত তুলে নিয়ে কামড় দিল,'দারুণ!'

'মনে আছে?' অনঙ্গ হাসছিল।

'ভুলি কী করে? তুইও তো ভুলতে পারিসনি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তোর প্যাশন...'

'আজ কি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কথা বলবি বলেই এলি?' অনঙ্গ জিগগেস করল।

'আরে, ফালতু একটা ঝামেলা... পর পর কিছু খুন হয়েছে। যে এসব করছে তার কী মনে হয়েছে কে জানে, আমায় প্রতিটি খুন করার আগে জানিয়ে দিচ্ছে। তার চ্যালেঞ্জ, যদি পারি এই খুনগুলো যেন আটকাই। কিছুতেই কিছু করতে পারছি না। বলে বলে করে যাচ্ছে, কিন্তু...'

'এত লোক থাকতে তুই কেন?' অনঙ্গ ভুরু তুলল।

'সেটাই রহস্য।'

'হতেই পারে তোর সঙ্গে খুনেটার যোগ আছে বা ছিল। তাই হয়ত---'

'বুঝতে পারছি না...' সুমিত অনঙ্গর ধারণায় ঘাড় পাতল না।

'পুরুষ না মহিলা?'

'কখনো কথা বলছে পুরুষ কখনো মহিলা।'

'একটা গ্যাং?'

'জানি না।' সুমিত অসহায়ের মতোই বলল।

'ইন্টারেস্টিং! ব্যাপারটা খুলে বল।' আরেকটা বড় ঢেলে অনঙ্গ জমিয়ে বসল।

সুমিত পরপর ঘটনাগুলো বলে গেল। কীভাবে কী কী হয়েছে। নিজের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে চুপচাপ অনঙ্গ শুনছিল। যেন পেশেন্টের কথা শুনছে। ফারাক একটাই, পেশেন্টের বদলে সামনে বসে ছেলেবেলার বন্ধু। এবং কন্সাল্টিং রুমে নয়, নিজের বাড়িতে।

'এসবের পিছনে মোটিভ কী?' অনঙ্গ শেষ হওয়ার পরে জিগগেস করল।

'নিশ্চয় কিছু আছে। আমার জানা নেই।'

'মৃত্যুগুলোর মধ্যে যোগসূত্র...'

'আপাতভাবে নেই কিছু। দেখলে মনে হবে স্রেফ পরপর কতকগুলো খুন।'

অনঙ্গ ফাঁকা টাম্বলারটা টেবলে রাখল,'শুনে মনে হচ্ছে গ্যাং বোধহয় নয়। গ্যাং হলে তাদের একটা নির্দিষ্ট মোটিভ থাকতে বাধ্য - যেমন টাকা, ক্ষমতা... মনে হচ্ছে একজনেরই কাজ।'

'কিন্তু পুরুষ মহিলা দুজনের কাছ থেকেই ফোন...'

'এরকম অ্যাপস বাজারে আছে - যেমন ভয়েস চেঞ্জার, মিনিওন প্র্যাঙ্ক কল, ফান কল, ভয়েস চেঞ্জ অ্যালোগ্যাগ এইসব। এতে ভয়েস বদলে যাবে। না জানলে বোকা বানানো সহজ। মানে, ব্যাপারটা হল, আমরা পুরুষ না মহিলা জানি না।'

সুমিত ক্যাপ্সিক্যামটা চিবোচ্ছিল। ঘাড় নাড়ল।

'যদি সত্যিই কোনো নির্দিষ্ট মোটিভ না থাকে তাহলে তার সমস্যাটা ডাক্তারি পরিভাষায় বর্ডারলাইন পারসোন্যালিটি ডিজঅর্ডার।'

'সেটা কী?'

'বিহেভিয়ারাল প্যাটার্নের নতুন আবিষ্কৃত ধরন। ব্যক্তিত্বের একদম ইন্ট্রিনজিক সমস্যা। এরা কখনো কখনো কোনো সম্পর্কেই স্থির না-ও থাকতে পারে। সম্পর্কের বিচারের ক্ষেত্রে আইডিয়ালাইজেশন বা ওভার আইডিয়ালাইজেশন থেকেও। এদের মধ্যে শূন্যতার বিচিত্র বোধও অনেক সময় কাজ করে। সবথেকে সমস্যা হল অ্যাফেকটিভ ইনস্টেবিলিটি...'

'সেটা কী? তোদের এই মেডিক্যাল জারগনগুলো বোঝা ঝামেলার...'

'চোখে পড়ার মতো ডিপ্রেসন থেকে নানা রকম অস্বস্তি, মুডের ওঠাপড়ার জন্যে অ্যাংজাইটি, যাকে ডিস্ফোরিয়াও বলি। এটা কয়েক ঘন্টাও থাকতে পারে আবার কয়েক দিনও থাকতে পারে। কখনো কখনো তখন সাবকনশাস লেভেলে একটা অপরাধ বোধও কাজ করে। এ থেকে একটা অস্থায়ী প্যারানয়েড অবস্থার জন্মও হতে পারে।'

'সিজোফ্রেনিয়া?'

'না। ওটা আলাদা ব্যাপার। আম আদমির ভাষায় স্প্লিট পারসোন্যালিটি। মেডিক্যাল টার্মে মাইক্রো-সাইকোটিক এপিসোড।'

'মানুষ মারা পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ। কোনো কারণে যদি স্ট্রেস বেশি হয় তাহলেও হতে পারে। অতীত জীবন খুব সুবিধের না হওয়ায় চেপে রাখা ক্রনিক রাগের থেকেও... প্রতিশোধের জন্যে...'

'এদের কী করে চেনা যাবে?'

'সে তোর মামলা, আমার নয়। সবসময় অতীত জানা যাবেই তা-ও নয়। কিন্তু জানা দরকার। সাধারণত এদের আইকিউ ১৪০-এর বেশি হয়। তুই যেসব খুনের কথা বলছিস তাতে মনে হচ্ছে খুনি যথেষ্ট স্মার্ট, বেশি আইকিউ তো বটেই। অতীত থেকেই চিনতে হতে পারে।'

'জেন্ডার?'

'মেডিক্যালি বলা কঠিন। কাজের ধরন আর প্রমাণের ওপর নির্ভর করে আন্দাজ করতে হবে।'

সুমিত টের পাচ্ছিল ঝোড়ো কোনো সমুদ্রে কেউ তাকে ঠেলে দিয়েছে। অনঙ্গ যতটা সম্ভব স্পষ্টভাবে বলেছে। বাকিটা পরে দেখা যাবে, আপাতত কারধুতেই মন দেওয়া যাক।

এই সময় তনুকা ফিরল 'কী, ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ হল? চেঞ্জ করে আসছি। এসে ডিনার সার্ভ করব?'

***

সুমিত যখন শ্রেষ্ঠার একডালিয়া রোডের অ্যাপার্টমেন্টে হানা দিল তখন কাজের মেয়েটি একা। 'দিদিমনি নেই। বেরিয়েছেন।'

কিচ্ছু না জানিয়ে সুমিত এসে হাজির অপ্রস্তুত অবস্থায় শ্রেষ্ঠাকে ধরবে বলে। ফ্র্যাঙ্ক রস ফার্মেসি থেকে কেনা টিওভার ব্যাপারটা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

'আইএসআই থেকে প্রফেসর সুমিত দাস।'

'অ্যাপোলো হসপিট্যালে গেছে। এসে যাবে। আমিও সাতটায় চলে যাব। আরো দুটো বাড়ি যেতে হবে। তারপর সুভাষগ্রামের ট্রেন ধরব!'

'অপেক্ষা করি।' সে ভেতরে সোফায় বসল গিয়ে।

'বাবু, চা দিই?'

'মন্দ হয় না।'

মহিলাটি কিচেনে অদৃশ্য হয়ে যেতে সুমিত উঠে জানলার কাছে গেল। বিকেলের গড়িয়াহাট সেজে উঠেছে। ব্যস্ত শহরের জীবন প্রবাহ বয়ে চলেছে বিরামহীন। সল্টলেকের ফাঁকায় অভ্যস্ত মাথায় এই ব্যস্ততা ব্যস্ত বাজারের মতোই মনে হচ্ছিল। অনেকে বাজারের কাছেই থাকতে পছন্দ করে। হতে পারে শ্রেষ্ঠাও তেমনই মানুষ একজন। যদিও এক সময় সে-ও এই দক্ষিণ কলকাতাতেই বড় হয়েছে, তবু আজ সল্টলেকের শান্ত পরিবেশই বেশি পছন্দ। এমনকি বিশ্ববাংলা সরণীও কখনো কখনো অসহ্য ঠেকে।

জানলা থেকে একটু পিছোলেই একটা ডিভান। তার ওপর একটা হারমোনিয়াম রাখা। মনে পড়ে গেল শ্রেষ্ঠার গানে ডুবে থাকার ছবিটা। নিশ্চয় এখানেই বসে রেওয়াজ করে। তার বাবা-মাও যে কোনো একটা হবি ডেভেলপ করতে বলেছিলেন। যার মধ্যে গানবাজনা অন্যতম। ভালোই জানে তার গান আঁকড়ে বাঁচার মতো ক্ষমতা নেই। মিউজিক তার এক্তিয়ার নয়। আয়ুষী নিজেও বিয়ের আগে গান শিখত, যদিও বিয়ের পরে তাকেও আর গান নিয়ে সেইভাবে বসতে দেখেনি।

আপন মনেই হারমোনিয়ামে হাত চালাল। কোমল সা থেকে নিখাদ সা-য়ে চলে গেল। খেয়াল করল হারমোনিয়ামের একটা কালো রিড ভাঙা। একটা লাল ক্রস চিহ্ন দিয়ে রাখা আছে। রিড ভেঙে যেতেই পারে, কিন্তু লাল চিহ্ন কেন? অদ্ভুত! গোড়া থেকে রিড গুণতে শুরু করল। অবাক হয়ে খেয়াল করল হারমোনিয়ামের সাদা আর কালো রিড ঠিক অর্ডারে নেই। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরপর সাদা। বারো আর তেরো নম্বরটাও। এগারো নং কালো রিডটা ভাঙা। রিডগুলোর এই অর্ডার কি কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্নে? এই দুটো পেয়ার ভিন্ন কেন?

মহিলা চা নিয়ে এল, 'কতটা চিনি দেব জিগ্যেস করতে ভুলে গেছিলাম। এক চামচ দিয়েছি।'

'একদম ঠিক।'

'আপনিও গান করেন?'

'না তো!'

'দিদিমনি প্রায়ই রেওয়াজ করেন। কিন্তু অমৃতাদি দারুণ! দিদিমনি তো শখে বসেন। এই তো এলেন বলে! উনি ফিরলে...' সে তাকাল, 'রান্না সেরে নিই। ফিরলেই তো আবার আমায় ছুটতে হবে!'

'বেশ তো! তুমি তোমার কাজ সারোগে...'

মহিলা চলে যাবার পর ও আপন মনে গুণতে থাকল ‘পাঁচ, তেরো...’ পরপর গুণতে গিয়ে হিসেবটা চেনা মনে হচ্ছিল, যদিও ধরতে পারছিল না। আনমনেই হারমোনিয়ামটা বাজাতে গেল, যাতে এমনি একটা সুর তোলা যায়। বেলোটা টিপতেই আচমকা বিদ্যুতচমকের মতো মাথায় খেলে গেল। এটা ফিবোনাচ্চি সিরিজের সিকোয়েন্সে সাজানো না! পুরো কিবোর্ডেই সেই অর্ডার মেন্টেন করা হয়েছে। শূন্য, এক, এক, তিন, পাঁচ, আট, তেরো, একুশ, চৌতিরিশ, পঞ্চান্ন, উননব্বই, একশো চুয়াল্লিশ... অঙ্কের হিসেবে ধরলে Fn = Fn-1 + Fn-2 এইরকম। পরপর রিডগুলো গুণে গেল। পাঁচটা কালো, আটটা সাদা। যদি কালোগুলোকে পুরুষ ধরা হয় আর সাদা মহিলা তাহলে খুনের হিসেবের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ১০টা খুনের ঘটনা ঘটেছে। প্রিয়াঙ্কা জয়সওয়াল (সাদা), আমিশ শাহ (কালো), অচিরা চ্যাটার্জি (সাদা), রোনাল্ডো ডি’সুজা (কালো), অর্চনা ভানিয়া (সাদা), ঈশিতা ভট্টাচার্য (সাদা), সরসিজ চক্রবর্তী (কালো), রাবেয়া সরকার (সাদা), মুকুন্দ পালচৌধুরী (কালো), আইরিন ডি’সুজা (সাদা)... যদি তার হিসেব ঠিক হয় তাহলে এগারো নম্বরটা হওয়া উচিত পুরুষ (কালো)। সমস্ত খুনগুলো মিউজিকের সঙ্গে খাপেখাপ মিলে যাচ্ছে।

শ্রেষ্ঠাই যে অপরাধী ধারণাটা আবার মাথায় আছড়ে পড়ল। তার ওপর টিওভার বিলটা... সেটা ওর বাড়িতে কেন থাকবে, যদি কিচ্ছু না জানে? খোঁচানোর জন্যে অঙ্কের ধাঁধা কাজে লাগিয়েছে। এই নম্বরের ধাঁধা পুলিসের পক্ষে সলভ করা নেক্সট টু ইম্পসিবল।

ডাঃ অনঙ্গ দত্তর কাছ থেকে জেনেছে, যেসব লোক বর্ডারলাইন পারসন্যালিটি ডিজঅর্ডারে ভোগে তাদের আই কিউ খুব বেশি হয়। সাধারণ মানুষের থেকে তাদের মাথা কাজ করে বেশি। যদি সেটা খুনখারাপির দিকে গড়ায় মানুষ সিরিয়াল কিলারেও পরিণতি পেতে পারে।

আরো তো অনেকে আছে। সবার মধ্যে থেকে তাকেই কেন? এর উত্তর নেই। ফিরে এসে শ্রেষ্ঠাকে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে।

খানিক বাদেই শ্রেষ্ঠা ফিরল। ফেরার পর মহিলা চলে গেল। সুমিত বসেইছিল। সোফায় ওকে দেখে শ্রেষ্ঠা জিগ্যেস করল, ‘আপনাকে চা দিয়েছিল?’

‘হ্যাঁ, দিয়েছিল।’

‘আসছেন বলেননি তো!’

‘এদিকে কয়েকটা জরুরি কাজ ছিল। সেরেসুরে মনে হল একবার হ্যালো করে যাই। আপনার সেল নম্বরটাও নেই যে ফোন করব। সেদিনটা যা গেছিল... যাক গে, এখন ঠিক আছেন নিশ্চয়। আর কোনো হুমকি এসেছিল নাকি?’

‘ওই হুমকিটাও যে আমায় দেওয়া হয়েছিল তা তো নয়। কেবল ডিসিডিডি কল করেছিলেন। না আর ওরকম ফালতু কিছু হয়নি...’

নীল জিনস আর সাদা টপে শ্রেষ্ঠাকে অন্য রকম লাগছিল। ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে আসা চুলগুলোকে শাসন করে বলল,‘জঘন্য একটা ওয়েদার। কী হিউমিডিটি বাইরে! অ্যাপোলোয় একজন আত্মীয়কে দেখতে যাবার ছিল। ওলা নিয়েও এই বাইপাসের যা-তা জ্যামে...’

‘আপনার হারমোনিয়ামটা দেখছিলাম। অবিশ্যি আপনি তো বলেইছিলেন গানই আপনার প্রিয়...’

‘অমৃতার মতো নয়। গান, ছবি আঁকা এইসব নিয়েই...’

‘হারমোনিয়ামের একটা রিড দেখলাম ভাঙা।’

‘হ্যাঁ, একদিন হাত থেকে গ্লাস পড়ে...’

সুমিত মনে করতে পারছিল না আগেরবার যখন এসেছিল তখন এটা দেখেছিল কিনা,‘এটা কি আগেরবার দেখেছিলাম?’

‘না। তোলাই থাকত। অমৃতার চাপে... ও আমায় গায়িকা করবেই... ওর হয়েছে, এবার আমায় নিয়ে পড়েছে।’

‘গ্রেট! বলেছিলেন আপনি ছবিই আকেন!’

‘আমার আসল প্রেম তা-ই! দেখবেন এখন কী আঁকছি?’ শ্রেষ্ঠা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে পাশের ঘরের দরজার দিকে ডাকল, ‘আসুন না...’

ঘরে পা দিয়েই কম্পিউটার, আঁকার জিনিসপত্র, কাপড়, ইস্ত্রি করার বোর্ড, কয়েকটা কাগজ এলোমেলো চোখে পড়ল। এসবের মধ্যিখানে একটা ইজেলে টাঙানো আর্ধেক আঁকা ছবি। যদিও শেষ হয়নি কিন্তু মোনালিসার মতো কারো ছবি বলেই মনে হল।

‘আরেকজন ভবিষ্যৎ লেওনার্ডোকে দেখে দারুণ লাগছে কিন্তু...’ হাসি ঠোঁটে নিয়ে বলল সুমিত।

‘ঠাট্টা করছেন! কোথায় আমি আর কোথায় দ্য ভিঞ্চি! আসলে পোর্ট্রেটের মধ্যেকার অঙ্কটাকে বুঝতে চাইছি! শেখার তো শেষ নেই।’

‘সত্যি দারুণ! ঈর্ষা হয়... যদি আপনার মতো এত গুণ থাকত!’

‘আপনারাই আসল ব্রেনি। আমরা তো ঘষে ঘষে তৈরি হওয়া জিনিস।’

‘খুব দেরি হয়ে গেল! দেখি বাইপাসের জ্যাম কাটল কিনা!’

‘বাইপাস ক্লিয়ার থাকলে ক মিনিট!’

বেরিয়ে আসার মুখে সুমিত আচমকাই জিগ্যেস করল, ‘আপনার বাড়িতে কারো হাঁপানি আছে বুঝি!’

‘যদ্দূর জানি, না। কেন?’

‘চৌবে বলছিল ও নাকি আপনার এখানে ইনহেলারের প্রেসক্রিপশন দেখেছে।’

‘আপনাকে বলছিল?’

‘হ্যাঁ। আমার মাথায় কিছু এলে আমি ওকে বলি। যেমন প্রিয়াঙ্কার হাসব্যান্ড যোগেশ আমার কাছে একবার ন্যাসকমের একটা প্রোজেক্ট নিয়ে এসেছিল। ও-ই ওকে আমার বিষয়ে বলেছিল। যোগেশ নিশ্চয় স্ত্রীর মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারে ওকে চাপ দিয়েছে।’

‘আমার কাছে অনেকে আসে। কে কখন ফেলে গেছিল ঈশ্বর জানেন...’

শ্রেষ্ঠা চৌবেকে মোটে পছন্দ করে না। বেশি চাপাচাপি করলে হিতে বিপরীতও হতে পারে। সুমিত চেপে গেল।

‘চায়ের জন্যে থ্যাঙ্কস। আপনার ট্যালেন্ট দেখি আর মুগ্ধ হই... প্লিজ, প্র্যাকটিসটা ছাড়বেন না...’

সুমিত যাবার পর শ্রেষ্ঠা ভাবছিল। সুমিত কি সত্যি এদিক দিয়ে যাচ্ছিল বলেই ঘুরে গেল? নাকি অন্য কোনো মতলব ... সুমিত বুদ্ধিমান নিশ্চয়, কিন্তু সে-ও তো নির্বোধ নয়।

***

বড় মানুষ বলতে সবাই যে কাজের জন্যেই বড় তা নয়। অনেক সময় নেহাত টাকার জোরে নিজেদের অপকর্ম না ঢাকলে অনেকের কপালেই লজ্জার ছোপ থাকত। কে জানে... আইরিনের অটপ্সি রিপোর্টটা নিয়ে মন খুঁতখুঁত করছিল চৌবের। নিজের পুলিসি যোগাযোগ কাজে লাগাল। বিবেক সিংহানিয়া লোকটাকে ভালো লাগছিল না।

আইরিন মারা গেছে ক্যাফিনের হেভি ডোজের জন্যে। স্বাভাবিক কফিতে যা থাকার কথা তার ডবল ক্যাফিন তার শরীরে মিলেছে। কী করে? বিবেক নিজে কফি খায়নি। খেয়েছে কার্লসবার্গ ব্রিউ। এতেই অস্বস্তিটা বেড়েছে কয়েক গুণ। অস্বাভাবিক নয় কি?

বিবেক হেঁজিপেঁজি নয়। যোগেশের মতো ওর ক্ষেত্রেও থুতু গেলার হাল হতেই পারে। কিছু করতে গেলে চাই শক্তপোক্ত, বাস্তবিক প্রমাণ। প্রথমবার যখন মুখোমুখি হয়েছে তখন সে কুল ছিল। অন্য কেউ হলে

পুলিস দেখলেই কাজ হয়ে যেত। তেমন তেমন হলে টাকা ছড়ানো শুরু হয়ে যেত, ওপর মহলে দৌড়োদৌড়ি পড়ত। মোটকথা, নাড়াচাড়া একটা পড়ত।

চৌবেকে কঠিন দৌড়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে ভুল মানেই তার কাজ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। এই খুনগুলো কেবল তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে না, উপরির রাস্তাতেও হাত দিয়ে বসে আছে। তার ওপর নিজের ঝামেলাও তো রয়েছে। একটা ভুল পা ফেলা মানেই সর্বনাশ। যেভাবেই হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঝাড় ঘাড় থেকে নামাতেই হবে, নইলে... ঈশ্বর করুন একটা ঢিল ঠিকমতো খাপেখাপ লেগে যাক, ঝাড়টা সোজা ডিসিডিডির ঘাড়ে ফেলে হাত ধুয়ে ফেলবে। তিনি ধড়ের দিকেই কাটুন আর মাথার দিকেই কাটুন মামলা তাঁর।

একেই কি বলে লাক!

একটা খবর দিল এক খোঁচর : যোগেশের নাকি সিংহানিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ আছে! লাফিয়ে উঠল চৌবে! আহহা, এই না হলে... ফোনে যোগেশকে ধরল। যোগেশ ভাবছিল দ্বিতীয়বার আবার তাকে ধোয়া হবে। একটু থতিয়েই ছিল। একে প্রিয়াঙ্কা, অর্চনা, তারপর এবার আইরিন! আর পুলিসের ঝুটঝামেলা চায় না। শান্তি চায়। চৌবের ধান্দা আঁচ করতে চাইছিল। চৌবে ডাকল।

'বলেননি তো যে বিবেক সিংহানিয়া আপনার পরিচিত!'

'সুযোগ হয়নি।' যোগেশ চার্জটা কোন দিক থেকে আসছে বুঝতে চেষ্টা করছিল।

'জানি আপনার সঙ্গে সিংহানিয়ার যোগাযোগ আছে। কীভাবে পরিচিত?'

'কেরিয়ারের গোড়ায় ফিনান্সের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছিলাম... তখনই আলাপ।'

'ও ফিনান্স করেছিল?' চৌবে চোখ সরাচ্ছিল না।

'করবে বলেছিল। একটাই কন্ডিশনে, যদি প্রিয়াঙ্কা ওর সঙ্গে শোয়। প্রশ্নই ওঠে না বলে আমি সরে আসি।'

'কী মনে হয়, সেই গ্রাজ থেকেই ও প্রিয়াঙ্কাকে...'

'সম্ভাবনাটা কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? সরাসরি প্রুফ নেই। আমায়ও তো সন্দেহ করছিলেন। প্রুফ বাদে কিছু হয় না ...আর ও বিগ শট। আমার সেক্রেটারি অর্চনাও এক সময় ওর কাছেই ছিল। আমিই ওকে ভাগিয়ে এনেছিলাম। হতে পারে তার জন্যেও খেপেছিল...'

'ওঁর মৃত্যুর সঙ্গেও যোগ থাকতে পারে?'

'পারে। যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলেই...'

চৌবের জন্যে এটাই যথেষ্ট। আগে জানলে তদন্তের রাস্তাটাই বদলে যেতে পারত। হাত কামড়াচ্ছিল আগে যোগেশের সঙ্গে ভালো করে কথা না বলার জন্যে। অবশ্য করেই বা করত কী! তখন তো মাথা খাটানোর বদলে ধান্দাই ছিল কীভাবে ওকে ফাঁসিয়ে তাড়াতাড়ি কেসটা ধামাচাপা দেওয়া যায়! যাক গে, বেটার লেট দ্যান নেভার। এখন ফাঁকটা কেবল বুঁজিয়ে ফেলতে পারলেই হয়, তাহলেই ধাঁধার সমাধান হাতের মুঠোয়।

'ডি'সুজা দম্পতির ব্যাপারটা...'

'বলতে পারব না। রোনাল্ডো সিংহানিয়ার সঙ্গে কাজ করত। ওর ট্রুপ আছে। বাইরে যায়। শুনেছি ওকে দিয়ে ড্রাগ পাচার করাত...'

'কখনো কিছু বলেনি?'

'আমরা ছোটখাটো লোক। পরিষ্কারভাবে বাঁচবার জন্যে সব সময় উদয়াস্ত খাটতে হয়। আর এদের কাছে নীতি-ফীতি বোগাস। আপনারা চেষ্টা করলেও ওদের ছুঁতে পারবেন না। কেবল আমাদেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলবেন।'

বিকাশ কিছু বলল না। যোগেশ তাকে পথ না দেখালে এগোতেই পারছে না। আইরিন সম্ভবত রোনাল্ডোর মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জানত। তাকে সরিয়ে দিতেই পঞ্চাশ লাখের ব্যবস্থা। কিন্তু মারার দরকারটা

হল কেন, যখন টাকা মিটিয়েই দেওয়া হয়েছিল? ওর কললিস্ট বার করলে কিছু বেরোতে পারে।

পত্রনবীশকে ফোন করল,'স্যার, আইরিন ডি'সুজার কেসটায় একজনের নামই ঝুলে রইল।'

'কে?'পরের পর কেস জমা হয়ে চলায় পত্রনবীশও স্বস্তিতে নেই।

'প্রোমোটার বিবেক সিংহানিয়া...'

'বলেন কী?' পত্রনবীশ চমকেছে বোঝা গেল।

'সিসিটিভি ফুটেজ বলছে লোকটা মহিলার ফ্ল্যাটে ছিল। মহিলাকে পঞ্চাশ লাখ টাকাও দিয়ে এসেছিল। আইরিন মেয়েটার কল ডিটেল পেলে কাজ হতে পারে মনে হচ্ছে...'

'মোবাইলটা আনানোর ব্যবস্থা করুন। তারপর দেখুন...' পত্রনবীশ ফোন কেটে দিলেন।

এইসব ঝুটঝামেলায় ফেঁসে কয়েকদিন সোহিনীর খবর নেওয়া হয়নি। নতুন করে ঝাঁপাতে গেলে আগে একটু চাঙ্গা হওয়ারও দরকার।

'বোসপুকুরে লাঞ্চ, ও কে?' গলায় অনুরোধের চেয়ে আদেশেরই সুর।

ডিসিডিডির ফোন ছেড়ে ভাবছিল বোসপুকুরে পৌঁছনোর আগে রাস্তায় কোথাও থেকে চাইনিজ নিয়ে নিলেই হবে। রাজ নেই এখন। জমবে ভালো।

নগ্ন সোহিনী টয়লেট থেকে বেরোল। বিকাশ লক্ষ করল ওর একটু মেদ বেড়েছে। শরীরটা চাখছিল। নজর সাধারণত ওর দু পায়ের ফাঁকেই থাকে। স্বাদ বদলাবার জন্যে টনটনে বুক দুটোর দিকেই তাকিয়েছিল।

'ফেঁসে আছ?' বিকাশ চোখ দিয়ে চেটে নিল।

'আইরিন মারা যাবার পর রোজ শ্রেষ্ঠার ওখানেই...'

'আইরিনকে চিনতে?'

'চিনব না কেন? ছোটবেলার বন্ধু। কেসটার কী হল?'

'চেষ্টা চলছে। ওর সম্পর্কে কী জানো?'

'বাবা-মা প্লেন ক্র্যাশে মারা যায়। ঠাকুমা ডরোথি ডি'ক্রুজের কাছেই মানুষ। মহিলা পরে অ্যালঝাইমারের পেশেন্ট হয়ে গেছিলেন। লোকে বলে ও-ই নাকি ঠাকুমাকে কুঁচ ফলের বিচি খাইয়ে স্লো পয়জন করে। সবটাই অবিশ্যি রিউমার। হার্ডকোর কিছুই পাওয়া যায়নি। ঠাকুমা মরার পর সম্পত্তি পেয়ে ও বাড়িটা বেচে রোনাল্ডোকে বিয়ে করে চলে এল সানি পার্কে। ওখানেই থাকত।'

'ঠাকুমাকে বিষ খাওয়ালেও খাওয়াতে পারে?'

'সিওর নয়। তখন ওসবে কেউ মাথাও ঘামাইনি। আজ কনসার্ট, কাল মুভি, পরশু আউটিং... অমৃতার একটা প্রোগ্রামেই আলাপ হয়েছিল শ্রেষ্ঠার সঙ্গে। সবাই একসঙ্গেই থাকতাম...'

সোহিনী ভেবে পাচ্ছিল না যে বিকাশ ওর শরীরটায় বুঁদ হয়ে থাকে সে ফালতু এত প্রশ্ন করছে কেন? বিকাশের কাজ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। চায় কেবল একটু শরীরের মজা... ব্যাস!!!

'মনে হচ্ছে এটাও তোমার পুলিশি ঠেক?' সোহিনী বুকদুটো ওর রোমশ বুকে ঘষতে থাকে। তারপর চেপে ধরে। তার গোলাপি স্তনাগ্র দুটি শক্ত হয়ে উঠেছে।

'ওর ব্যক্তিগত জীবনটা না জানলে...'

'সুবিধে হবে?' ওর তর সইছিল না।

'রোজ বিকেলেই শ্রেষ্ঠার ওখানে কেন?'

'কী ভালো ছবি আঁকে! এখন মোনালিসার ছবি আঁকছে। আমিও ছোটবেলায় ছবি আঁকতাম। আবার যদি ধরা যায়... ফাঁকা সময়টা কাটে! বাড়িতে বোর হই!'

'মোনালিসা কেন? লেওনার্দোরটা বুঝি ভালো হয়নি?'

‘ওই ছবির অঙ্কের ভিত্তিটা খুব ইন্টারেস্টিং ...’

বিকাশের মোনালিসা নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। সোহিনীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

‘ওতে ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স অ্যাপ্লাই হয়েছে! গোল্ডেন স্পাইরাল। ইন্টারেস্টিং।’

‘প্রত্যেক রাতেই ডিনার ওখানে?’ বিকাশ অবাক হয়ছিল।

‘ও এখন আঁকছে তো ওইটা। এইসময়েই সহজে অঙ্কটা ধরা যায়। সব বাড়িতে এনে...’ বিকাশের মুখ বন্ধ করতে ব্যস্ত হল। চুমুতে চুমুতে এই উষ্ণতায় কোনো পুরষ ফালতু বকতে পারবে না।

একটু মোটা হয়েছে সোহিনী। তবে বিকাশের তাতে কী? প্রত্যেক ভারতীয় পুরুষের মতো তারও পছন্দ একটু ভারী শরীর। সোহিনীকে কেউ মোটা বলবে না, আবার রোগাও বলতে বাধবে। দুটো শরীর যখন চূড়ান্ত উত্তাল, বিকাশ যখন আর পারছে না ঠিক তখনই ফোনটা বাজল।

প্রশান্ত দেশমুখ।

‘কনফার্মড রাবেয়া বিবেক সিংহানিয়ার কেপ্ট ছিল। আরেকটা মেয়েকে নিয়ে বিবেক সেদিন ওই সময়ে এন টি ওয়ানে গেছিল...’ শালা আর সময় পেল না! বিকাশের সমস্ত উত্তেজনা যেন ছানা কেটে যাচ্ছিল। যদি কিছু প্রত্যক্ষদর্শীকে জোটানো যায় তাহলেই একমাত্র দুইয়ে দুইয়ে চার! নইলে...

সে সোহিনীর ওপর থেকে নেমে এসেছিল।‘কেউ সাক্ষী দেবে?’

‘যদি গোপন থাকে ঝামেলা হবে না। না জানলে ও কী করে এদের মুখ বন্ধ করতে পারবে?’

‘গুড। কিপ ইট দ্যাট ওয়ে!’ ফোন ছাড়ল।

শিট! সোহিনীর বিরক্তির চূড়ান্ত ঘটিয়ে বেরোবার কথাই ভাবছিল। সোহিনীকে শান্ত করতে হলে আবার পরিশ্রম! সোহিনীরও ইচ্ছেটাই মরে গেছিল। খিদে পেয়েছে। উঠে ব্রা, প্যান্টি নিয়ে টয়লেটে ঢুকল। পরে কিচেনে ঢুকবে।

***

চৌবের একটাই দিকে নজর। যদি একবার এই খুনের কেসগুলো সাল্টে নেওয়া যায়, তাহলে এসিপি পোস্টে প্রোমোশন ঠেকায় কে!

বিবেক সিংহানিয়া - কলকাতার মাথা, এলিট, সে-ই কিনা এইসব খুনখারাপির সঙ্গে... একবার যদি কেসটা সলভ করে ফেলা যায় তাহলে কেবল যে কাগজে কাগজে হেড লাইনই হবে তা নয় খোদ সিপি অব্দি পিঠ চাপড়ে দেবেন। চিন্তা এখন কেবল ওই ব্যাটা সুব্রতই সব ক্ষীরটা খেয়ে নেবে কিনা! হয়ত সব ক্রেডিটই নিজে নেবে, তার ভাগ্যে পড়বে শুকনো ধন্যবাদ। বিবেকের ওপর মহলে যোগও কম নয়। তাকে ঠিক মতো পাকড়াতে পারবে?

সুমিতকে ফোনে ধরল,‘মনে হচ্ছে আমাদের কালপ্রিটকে পেয়ে গেছি।’

ইন্সটিটিউট থেকে ফিরে সুমিত ড্রিঙ্কস নিয়ে বসতে যাচ্ছিল। এক কোলিগ সবে বাইরে থেকে ফিরেছে। তার জন্যে বারো বছরের পুরনো একটা ব্যালভেনি ডাবলউড নিয়ে এসেছে। সেই কবে, দুহাজার বারোর পর এটার স্বাদ আর নেওয়া হয়নি। স্পেন্সার থেকে আনা কিছু ককটেল সসেজ নিয়ে আয়ুষীকে ডাকতে যাচ্ছিল।

থমকে জিগগেস করল,‘তাই? কে?’

‘বিবেক সিংহানিয়া। প্রিয়াঙ্কা, অর্চনার সঙ্গেও ওর যোগ ছিল।’ থেমে শ্বাস নিল বিকাশ, ‘যোগেশই লিডটা দিল। অন্য সোর্স থেকেও জানা যাচ্ছে ডি’সুজাদের সঙ্গেও ওর যোগ ছিল। আইরিন আর রোনাল্ডো দুজনের সঙ্গেই। রাবেয়ার সঙ্গে ঘষাঘষি তো ছিলই, এমনকি মেয়েটা মারা যাবার সময় ও এনটি ওয়ানেও হাজির ছিল...’ বিকাশের গলা কেঁপে যাচ্ছিল।

সুমিতের তর সইছিল না। আয়ুষী ককটেল সসেজগুলো নিয়ে আসা অব্দি আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। তার আগেই...

'এক মিনিট। ড্রিঙ্কসটা নিয়ে নিই...'

বিকাশ বলেই চলল,'আইরিনের মারা যাবার দিন ওর বাড়িতে সিসিটিভিতে ওকে দেখেই মাথায় খেলেছিল। তারপর...'

প্রথম সিপটার সঙ্গে সঙ্গে সুমিতের মাথাও ঝড়ের মতো কাজ করছিল। লোকটা বলে কী? কিন্তু বাকি খুনগুলো? আমিশ শাহ, অচিরা চ্যাটার্জি, ঈশিতা ভটচাজ, মুকুন্দ পাল চৌধুরী? কেবল অন্য দিকে বলেই তো এই খুনগুলোকে বাদ দেওয়া যায় না! বিশেষ করে তাকে যখন জানানো হয়েছে তখন এগুলো বাদ দেয় কী করে?

বিকাশ একটাই দিক ধরে ভাবছে। যুক্তি নেই তা নয়। অথচ ফিবোনাচ্চি নিয়ে যা জানা গেছে তা ধরলে সন্দেহ নেই বিকাশ ভুল করছে।

'কিন্তু মোটিভ?' নিচু গলায় জিগগেস করে।

'আলাদা আলাদা। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে শুতে চাওয়ায় যোগেশ আপত্তি করেছিল। অর্চনা একসময় ওর ফার্মে কাজ করত। যোগেশ ওকে ভাগিয়ে এনেছিল বলে রাগ ছিল। মারা গেছে বলে জানা যাবে না কেসটা ঠিক কী হয়েছিল। হতেই পারে এটাও প্রিয়াঙ্কার মতোই কেস। রোনাল্ডো ওর অবৈধ ড্রাগ পাচারের সাগরেদ ছিল। আইরিন ওকে ব্ল্যাকমেল করছিল। তাকে সরানোর কারণ পরিষ্কার। অর্থাৎ কিলার যদি বলেন তাহলে এ-ই তো দাঁড়াচ্ছে...'

চৌবেকে না ঘাঁটিয়ে সুমিত কথা ঘোরাল,'গ্রেট। কখন ওকে ধরছেন?'

'ডিটেল রিপোর্ট বানাতে হবে। ডিসিডিডিকে দিয়ে পাস করাতে হবে। উনি ফাইন্যাল সিগন্যাল দিলেই...'

'একদম সিওর এতেই গোটা ব্যাপারটা কভার করা যাবে? কোর্ট তো প্রমাণ চাইবে?'

'সব আছে। সাক্ষী, প্রমাণ সব মিলিয়ে কেবল রিপোর্টটা বানিয়ে ফেলার অপেক্ষা। ব্যাস, ডান।'

'বেস্ট অফ লাক। আপডেটগুলো দেবেন প্লিজ...' ফোন নামাতে যাবে মনে পড়ে গেল,'শ্রেষ্ঠার বাড়িতে পাওয়া বিলটা...'

'কে ফেলে গেছে কে জানে!' বিকাশ নিজের পয়েন্ট থেকে নড়ছে না। অনেক কষ্টে কেসগুলো থেকে মুক্তির উপায় মিলেছে, ছাড়ে কেউ?

'হয়ত তা-ই! যেমন যেমন সম্ভব হবে জানাবেন প্লিজ...'

'নিশ্চয়...'

চৌবে উৎসাহে ফুটছে। খামোকা তাকে কী করা দরকার তাই নিয়ে জ্ঞান দেওয়ার মানে হয় না। পত্রনবীশ জানলে সুমিতকেও হয়ত সঙ্গে ফাঁসাবে। এরা স্রেফ প্রোটোকল মেনে চলে। ফাঁসেও প্রোটোকলের দৌলতেই। তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলছে খুনি সমস্ত ব্যাপারটা ছকে নিয়ে নেমেছে। বুদ্ধি না খাটালে ধরা অত সহজ কথা নয়।

সুমিত চটপট হাতের গ্লাসটা শেষ করে আর একটা ঢালল। আয়ুষী এর মধ্যেই এল,'শুরু করে দিয়েছ? সসেজের জন্যে তর সইল না?'

'ওসি চৌবে ফোন করেছিল। ওর ধারণা ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছে...' চিকেন সসেজ জিভে চনমনে স্বাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে, 'লোকটা পাগল হয়ে গেছে। বোকার মতো ভুল দিকে ছুটছে।'

'এবার আবার কাকে কালপ্রিট ভাবছে?'

'ভাবছে কতটা জানি না, ধরেই নিয়েছে বিবেক সিংহানিয়াই খুনি।'

'সে আবার কে?'

'সিংহানিয়া বিল্ডার্সের মালিক। যদি না ঠিকঠাক পা ফেলে যা ফাঁসা ফাঁসবে ভাবতে পারছে না! বিবেক সিংহানিয়া মানে বুঝতে পারছ তো? তার গায়ে হাত...'

আয়ুষী বুঝতে পারছিল,'তোমার কী? ওটা ওদের কাজ। ওদের সামলাতে দাও!'

'আমি কি আর এমনি ভাবছি? অচিরা যদি এখানেই মারা না যেত হয়ত এতটা ভাবতামও না...'

আয়ুষী জানে সুমিত অচিরাকে যথেষ্টই পছন্দ করত। ওকে কবে থেকে রীতিমতো তৈরি করেছে। তার মৃত্যু যে মেনে নিতে পারবে না সহজে এটাই স্বাভাবিক। হয়ত এতটা ভাবতও না যদি না সামনেই বেচারির বিয়ে না থাকত। সব মিলে... ফলে ওকে অকারণ না ঘাঁটানোই ভালো। যা ভাবছে ভাবুক।

বাড়ি ফেরার আগে বিকাশ লালবাজারে গিয়ে আইরিনের কললিস্টটা সংগ্রহ করল। এটাই এখন সব থেকে বেশি দরকার। লিস্টটা হাতে পেয়ে চোখ বোলাতে গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ! আইরিন শেষ ফোন করেছিল সোহিনীকে!

মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল বিকাশের। ফোনে ধরল সোহিনীকে, 'আইরিন যে রাতে মারা যায় সে রাতে তোমায় ফোন করেছিল?'

'একদম ভুলে গেছিলাম বলতে। হ্যাঁ, করেছিল। সেদিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। ফোনটা ড্রয়িং রুমের সোফাতেই পড়েছিল। আনা হয়নি। পরদিন সকালে দেখি ফোন করেছে। তার আগেই খবরের কাগজে খবরটা চোখে পড়েছিল। যে মারাই গেছে তাকে আর ফোন করার তো মানে হয় না, তাই আর... মনেই ছিল না...'

'শিট! আগে তো বলবে!'

'আগেই বলি আর পরে তার সঙ্গে কী আছে?'

'অনেক কিছু আছে। হয়ত ফোন করেছিল খুনির নাম বলার জন্যেই। যখন ও কফি বানাচ্ছে তখন সিংহানিয়া তো ওর বাড়িতেই ছিল। ও-ই কফিতে কিছু মিশিয়ে দিয়েছে এটা আশঙ্কা করছি। সব প্রমাণই পুরো সারকামস্ট্যানশিয়াল। যদি সেদিন ফোনটা ধরতে তাহলে হয়ত কোনো ডায়রেক্ট প্রমাণ হাতে এসে যেত...'

'আমায় কেন ফালতু ব্লেম করছ বলো তো! কখন ঘুম পাবে সেটা কি আগে থেকে জানা যায়? রোজই কি রাতে আমায় ফোন করত? সেইদিন কী জন্যে হয়ত করেছিল, তারপর মারা গেছে...'

'কেন বুঝছ না ওই মিসড কলের মধ্যে অনেক কিছু সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে?'

'স্যরি বিকাশ...' বিকাশের মানসিক অবস্থা বুঝেই সোহিনী আর কথা বাড়াল না। আর কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে সোহিনীর ওপরেই ঝাল ঝাড়ছে। বিকাশও বুঝতে পারছিল এটা বেচারির দোষ নয়। ভাগ্যকেই দোষারোপ করছিল। সমস্ত উৎসাহ আস্তে আস্তে উবে যাচ্ছিল। হাতাশ হয়ে পড়ছিল। জিপটা ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়েছে। অনেকগুলো মানুষ অপেক্ষা করছে বাসের জন্যে। বিকাশের মাথার মধ্যে আস্তে আস্তে অনেকগুলো প্রশ্ন জেগে উঠছিল এখন... সিংহানিয়া যদি আইরিনকে বিষই দেবে তাহলে কি তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে আসবে যখন কাউকে ফোন করে বলে দিতে পারে? নাঃ। বিষয়টা ভাবাল। তাহলে...

তাহলে কি অন্য কেউ?

***

অ্যাপোলো হাসপাতালের ৩৫৭ নম্বর কেবিনে শুয়ে সুমিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল বেঁচে রয়েছে বলে। সে-ও কি তাহলে ওই ফিবোনাচ্চি সিকোয়েলের মধ্যে পড়ে গেছে? নইলে এখানে কেন? মনে পড়ল হারমোনিয়ামের রিডের হিসেব অনুযায়ী এবারের পালা একজন পুরুষের। যদি তা-ই হয়, প্রত্যেকটি হত্যাই

যদি সত্যিসত্যিই মেপেজুখে ঘটানো হয়ে থাকে , তাহলে সে বাঁচল কী করে? বাঁচার কথা তো নয়। হাসপাতালের মানসিক শারীরিক চাপের মধ্যেও মনে পড়ে গেল শ্রেষ্ঠার হারমোনিয়ামের এগারো নম্বর রিডটা ভাঙা । লাল ক্রস দেওয়া ছিল। কোনো কিছু ভেবেই নিশ্চয় ক্রসটা দেওয়া হয়েছিল লাল রঙে। কী ভেবে! কোনো ইঙ্গিত!

আকুতি নিয়ে আয়ুষীকে ধরল,‘আমার আইপ্যাড বা ম্যাকটা নিয়ে আসবে?’

‘কোনটা আনব?’

‘যদি পারো দুটোই। বোর হচ্ছি এখানে...’

‘সিওর, আনব...’ সুমিতের তেমন কিছু হয়ে যায়নি এতেই আয়ুষী খুশি। নইলে... না না, সে আর কিচ্ছু ভাবতে পারছে না...

খারাপ কিছু হতেই পারত। ঈশ্বর মানুষকে পাঠান বিশেষ কিছু কাজ দিয়ে। কাজ শেষ হলেই মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যায়। তার ভবিতব্য নিয়ে ভাবার বদলে ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স নিয়েই ভাবছিল।

দিন কয়েক আগে প্রত্যেক দিনের মতোই সকালে সাইকেল নিয়ে প্রাত্যহিক রুটিন মতো বেরিয়েছিল ও। বাড়ির সামনেই সাইকেলটি স্কিড করে। পড়ে গিয়ে মুখে আঘাত পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে চোখে, গোড়ালিতে আঘাত পায়, চোয়ালের হাড় ভাঙে। আর্তনাদ শুনে আয়ুষী ছুটে নামে। দাঁড়াতে পারছিল না। অত সকালে আশেপাশের বাড়ির লোকজনও তখন ঘুমোচ্ছে। আয়ুষীর চিৎকারে হইচই পড়ে যায়। সকলে এসে তুলে নিয়ে সুমিতকে বাড়িতে আনে। তখন ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

‘পড়ে গেলে কী করে?’ আয়ুষী জানতে চেয়েছিল।

সুমিত কথা বলতেই পারছে না। আয়ুষী দেখে সাইকেলটা যেখানে পড়ে সেই জায়গাটা মোবিল পড়ে ভিজে জবজবে হয়ে আছে। ওখানে সাইকেল গিয়ে পড়লে বীভৎস কাণ্ড হতে বাধ্য। বোধহয় কোনো গাড়ি থেকেই মোবিল পড়েছে। লিক ছিল নিশ্চয়। সকালে আয়ুষী ওঠার আগে প্রত্যেক দিনের মতো বেরিয়ে পড়েছিল প্রাতঃভ্রমণে। ফিরে চা খেতে খেতে কাগজ পড়বে। তারপর প্রতিদিনের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এইজন্যেই রাস্তার দিকে অত নজর দেয়নি।

আয়ুষী ১০৬৬-এ ডায়াল করতেই অ্যাপোলোর অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে তাকে তুলে আনে। হাসপাতালে এনে প্রাথমিক পরীক্ষার পর ডাক্তাররা বুঝলেন গোড়ালি ভাঙেনি, কেবল মচকেছে। লিগামেন্ট স্প্রেন। আপাতত তিন হপ্তার বিশ্রাম। সিঙ্গল পড ইনফ্রা-অরবিটাল ফ্র্যাকচারের জন্যে সেদিনই অপারেশন করে মিনি-প্লেট লাগানো হল।

বাড়িতে লোক নেই। আয়ুষী একা। সুমিত এখন কিছুদিন হাসপাতালে বন্দি। হাতে অনেক সময়। এই দুর্ঘটনা কি সত্যিই কোনো দুর্ঘটনা? নাকি কেউ ইচ্ছে করে রাস্তায় মোবিল ছড়িয়ে রেখেছে? সিরিজে পরের জন হওয়ার কথা পুরুষ। কিন্তু সে তো মরল না। এই জন্যেই কি হারমোনিয়ামের এগারো নম্বর কালো চাবিটায় লাল ক্রস দেওয়া ছিল? তাই যদি হয় তাহলে এই আঘাতের অর্থ কী? প্রশ্ন অনেক। সে যদি ঠিক মতো বিষয়টাকে ধরতে পারে তাহলেই উত্তর মিলবে।

গুগলে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখল ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স আবিষ্কার হয়েছিল এই ভারতেই খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে, পিঙ্গলার কাব্যে, বেদাঙ্গের সংস্কৃত ছন্দে। ৯০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্ট পূর্ব-তে বৈদিক সাহিত্যের শতপথ ব্রাহ্মণেও এর দেখা মেলে বলে কেউ কেউ মনে করেন। ৬০০ থেকে ২০০ খ্রিস্টপূর্ব-র মধ্যে এই বিষয়ে চর্চা চলে এবং ঋগ্বেদের (২০০ খ্রিস্টপূর্ব) ছন্দসূত্রেও এর ব্যবহার হয়। ফিবোনাচ্চি সিরিজের উল্লেখ প্রথম করেন ফিবোনাচ্চি নামে একজন ইতালিয়, যাঁকে পিসার লেওনার্দো বলা হত, ‘লিবের আবাসি’ (১২০০ খ্রিস্টাব্দ) নামে তাঁর গ্রন্থে।

এর গাণিতিক প্যাটার্নের পরিচয় পাওয়া যায় প্রকৃতিতে, মৌমাছির বংশাবলির নিয়মে, মানুষের জিনে এক্স ক্রোমোজোমের বাহক প্যাটার্নে। মানুষের মুখের আদর্শ পোর্ট্রেট গোল্ডেন স্পাইর‍্যাল রেশিওকে অনুসরণ করে

ফাই বা ১.৬১৮০৩৪। এর আদর্শ উদাহরণ হল মোনালিসার পোর্ট্রেট। শিল্পকলায় আগ্রহীরাও খুব উৎসাহ না থাকলে এতকিছু জানবে না।

সুমিত হারমোনিয়ামের কি বোর্ডের ছবিটা ভাবছিল। অনেক সময় কোনো কোনো গান ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছোয় মধ্যিখানে বা শেষের বদলে তার ফাই পয়েন্টে (৬১.৮%) এসে। খুনগুলোর রকমসকম দেখে তার মনে হচ্ছিল তেরোটি খুন হবে যার মধ্যে তিনটি বাকি আছে। অথবা পরের সম্ভাব্য সেট-এ, অর্থাৎ একুশে গিয়ে। যেভাবেই হোক এই অর্থহীন খুনের মিছিল থামাতে চাইছিল। কেবল... কেবল যদি ঠিক সময়ে ঠিক হিসেবে গিয়ে হিট করতে পারে। হয়ত পরের তিনটে খুনকে ঠেকানো সহজ হবে না কিন্তু যদি খুনিকে শনাক্ত করতে পারে তাহলে অন্তত আরো আটটা খুন অন্তত ঠেকানো যাবে।

হিসেব মতো এখানে ফাই পয়েন্ট হল ৮, অর্থাৎ রাবেয়া সরকারের মৃত্যু, এটাই মনে হচ্ছে মূল গোল্ডেন রেশিওর ফাই পয়েন্ট। তার মৃত্যুতেই গোটা সিকোয়েন্সের থ্রিলিং পয়েন্টটা লুকিয়ে আছে।

বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে বিকাশ উঁকি মারল ৩৫৭ নম্বর কেবিনে,‘কেমন আছেন?’

‘বেঁচে আছি’ হাসছিল সুমিত,‘মারা যাবারই কথা ছিল। ইনশাল্লাহ! নিওপ্যাচের জন্য ব্যথাগুলো অনেকটা কম। সিংহানিয়াকে পাকড়াও করলেন?’

‘এখনো না...’বিকাশ ঘাড় নাড়ল,‘ডিসিডিডিকে সব কাগজ পাঠানো হয়েছে। উনি দেখছেন। সিংহানিয়া বড় মাছ, অনেকের সঙ্গে যোগ আছে; যদি গুবলেট হয়ে যায় ঝামেলায় পড়তে হবে...’ এখন সন্দেহ নেই যথেষ্ট জোরালো ডিফেন্সের ব্যবস্থা না করে এর গায়ে হাত না দেওয়াই ভালো...

‘বড় বড় ক্যাচের উঁচু মহলে যোগ থাকবেই। অত ওপরে ওঠা কি চাট্টিখানি নাকি? পার্টি ডোনেশন দিতে হয়, যারা ক্ষমতায় তাদের জন্যে ভালো নজরানার ব্যবস্থা করতে হয়...’

‘আইরিনের কললিস্ট দেখতে গিয়ে দেখলাম একদম শেষে সোহিনী বলে একজনকে ফোন করেছিল’ দুর্বলতা লুকিয়ে সাবধানে বলল বিকাশ,‘শুনলাম সে নাকি ওর ছেলেবেলার বন্ধু। সোহিনীকে জিগগেস করায় বলেছে সেদিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল, তাই ধরতে পারেনি। এমনও তো হতে পারে মেয়েটা বন্ধুকে ফোন করে কিছু বলে যেতে চেয়েছিল...’

‘চাইতেই পারে, চেয়েছিল কিনা তা এখন স্রেফ ঈশ্বরই বলতে পারেন! এখন তো সে...’ সুমিত বলল।

‘যদি বিবেকই ওকে মেরে থাকে , নিশ্চয় মরেছে নিশ্চিত না হয়ে ওখান থেকে আসেনি।’

‘আপনি তো ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ঢুকেছিলেন?’

‘হ্যাঁ। স্যুইসাইড নয়। বিশেষ করে যে লোক সদ্য পঞ্চাশ লাখ টাকা হাতিয়েছে... অস্বাভাবিক। কেউ এ কাজ করবে না। খুন ছাড়া কিচ্ছু নয়...’

‘অটপ্সিতে ক্যাফিন বডিতে ঢোকা আর মারা যাওয়া এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান কিছু বলেছে?’

‘না...’

‘এমনও কিন্তু হতে পারে যে, সে ওকে বিদায় জানিয়েছে, বিবেক চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে বন্ধুকে ফোন করেছে। তাকে পায়নি। তারপর মারা গেছে...’

‘আবার এমনও তো হতে পারে, ওর পরিচিত আরো কেউ ছিল, কোনো তিন নম্বর লোক, যে কিনা সব জানত... সে-ই হয়ত বিবেককে ফাঁসাতে এই কম্মটি করেছে...’

‘হতেই পারে। কিন্তু তা-ই যদি হত তাহলে টাকাটাও হাওয়া হয়ে যেত।’

‘স্বাভাবিক। টাকাটা তাহলে থাকার কথাই নয়। বিবেককে তাহলে ফাঁসানো সহজ হত। এরা শত্রু নিয়ে ঘোরে। আইরিন সেক্ষেত্রে গুটি হিসেবে...’ বিকাশ শ্বাস ফেলল, ‘যদি মরা লোক কথা বলত...’

‘তা’লে তো ভালো হতই... ভালো হয় যদি বাইরে না রেখে ওকে তুলে নেন। আমি নেহাৎ বরাত জোরে বেঁচে গেছি... তবে বিবেকই যে এর পরের টার্গেট নয় জানছেন কী করে?’

কথাগুলো বিকাশের হাড় হিম করে দিচ্ছিল। ঠিকই তো! হতেই পারে। এদিক থেকে ভাবেনি। যদি এটা ওদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলই হয় তাহলে বেচারির জীবনও সুতোয় ঝুলছে। খুনি হোক আর না-ই হোক তার নিরাপত্তার জন্যেই এক্ষুনি পত্রনবীশকে ধরেকরে ওকে পুলিশের হেফাজতে নিয়ে নেওয়া জরুরি। যত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় ততই ভালো।

কষ্ট করেই সুমিত বিছানায় উঠে বসল,'একটা উপকার করুন না প্লিজ, রাবেয়ার কেসের ডিটেলটা যদি একটু...'

'ওটা তো দেশমুখ দেখছিল, কেন বলুন তো?'

'এমনিই। মনে হচ্ছিল...'

'ওকে তাহলে বলছি যেন আপনার এখানে চলে আসে। এখানে কদ্দিন থাকছেন?'

'জানি না। তিন হপ্তা তো বলেছিল... শ্রেষ্ঠার অতীতটা যদি একটু ঘেঁটে দেখা যেত...'

'সে এর মধ্যে আসছে কোত্থেকে?'

'এমনিই। জাস্ট কৌতূহল। সাউথ পয়েন্ট, সেখান থেকে প্রেসিডেন্সি...'

'চেক করেছিলাম! যা পেয়েছিলাম বলেছি। আর কিছু... এবার কিছু জানতে হলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগাতে হবে।'

'জানতে চাইছিলাম ওর স্কুল লাইফ, বয়ফ্রেন্ড কেউ ছিল কিনা, কোনো রকম অসুখ বিসুখ... এইসব...'

'দেখি যারা খবর দেয় তাদের বলে... যদি কিছু বার করতে পারি...' বিকাশ উঠে পড়েছিল,'আসছি তাহলে। নিজের যত্ন নেবেন...'

'কিছু খবর হলে জানাবেন...'

বিকাশ বেরিয়ে যেতে সুমিত শুয়ে পড়ল। সে কি তাহলে শ্রেষ্ঠার মধ্যে কোনো রকম বর্ডারলাইন পারসোন্যালিটি ডিজঅর্ডারের ইতিহাস খুঁজছে? মহিলার সাইকিয়াট্রিক ইতিহাসটা পেলে মন্দ হয় না। বিকাশের খবরদেনেওয়ালারা কতটা খবর আনতে পারবে বুঝতে পারছিল না। ডাঃ অনঙ্গ দত্তই মনে হচ্ছে এক্ষেত্রে একমাত্র কাজের লোক হতে পারে, যদি তার কোনো নিজস্ব সূত্রে ওকে চেনে তাহলেই... মনে হচ্ছে শ্রেষ্ঠার ক্ষেত্রে খুঁজলে এরকম কিছুর হদিশ বেরোলেও বেরোতে পারে। সেক্ষেত্রে হয়ত কখনো সাইকিয়াট্রিক কনসালটেন্সির দরকার হলেও হতে পারে।

রাবেয়ার মৃত্যুটা এই খুনেকে ধরার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠলেও উঠতে পারে!

***

'আপনারা? আসুন আসুন...' শ্রেষ্ঠা আর অমৃতাকে তার কেবিনে ঢুকতে দেখে খুশিই হল সুমিত।

শ্রেষ্ঠা একটা চেয়ার টেনে বসে বলল,'এক আত্মীয়কে দেখতে এসেছিলাম। শুনলাম আপনিও নাকি ভর্তি। ভাবলাম দেখেই যাই। কেমন আছেন?'

'ভালোই। ফেসিয়াল ফ্র্যাকচারের ব্যাপারটা ওঁরা সামলে দিয়েছেন। অ্যাংকল স্প্রেনের জন্য এখন হপ্তা তিনেক শুয়ে থাকতে হবে...'

জানলার পাশের সোফায় অমৃতা বসল। পরিষ্কার আকাশে হালকা মেঘ। জৌনপুরী রাগ মাথায় আসছিল। মেঘগুলো 'মেঘদূত'-এর দূতের মতোই সুদূরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। চোখ মন সব স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রের মতো চাঁদের আলোর দেশে হারিয়ে গেছিল।

'অমৃতা বলছিল একটু বাইরে কাটিয়ে এলে হয়...'

'কোথায়?'

'ইকো পার্ক। একান্তে-তে লাঞ্চ...' শ্রেষ্ঠা বলল।

অমৃতা সোফায় বসে আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, 'পরে সিনেমাও...'

সুমিতেরও পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ওরা তখন এভাবে বাইরে যেতে হলে বাছত ভিক্টোরিয়া, ইডেন গার্ডেন। গরমের দিন হলে র‍্যালিজে।

'আমাদের সময়ে মধ্য কলকাতাতেই সমস্ত মজার সন্ধান মিলত! ইস্টের এইসব জায়গা তখন কোথায়! খেতে হলে নিজাম, সিনেমার জন্যে হয় লাইটহাউস, নয় নিউ এম্পায়ার কিংবা এলিট, ঘুরতে হলে ভিক্টোরিয়ার লন...' সুমিত আনমনে বলল,'নিউ টাউন তো সেদিন হল...'

অমৃতার টয়লেট যাবার দরকার হয়েছিল। ঘড়ি দেখল। ক্যাব ধরাও দরকার, ফিরতে হবে।

'এক্সকিউজ মি, টয়লেট যেতে হবে।'

'এখানেই তো আছে...'

'সেটা ঠিক হবে না। পাবলিক টয়লেটে যাব...' উঠল। শ্রেষ্ঠা রয়ে গেল।

'মোনালিসার কী খবর?' সুমিত জিজ্ঞেস করল।

'ফাইন। আজ বুঝি দ্য ভিঞ্চি এসব গ্র্যামার না জেনেও কী কাজ যে করেছিলেন! আমার এক বন্ধু সোহিনীও এর প্রেমে পড়ে গেছে। রেগুলার আসছে। ছবি ভালোবাসে। যদিও কাজ শিখছে খুব ধীরে...'

'স্লো বাট স্টেডি উইনস দ্য রেস...' সুমিত হাসছিল।

'কে জিতল কে হারল বড় কথা তো নয়...' শ্রেষ্ঠা বলল।

'ঠিক। হারমোনিয়ামের রিড ঠিক করালেন?'

'উঁহু, ভাঙা জিনিস দিয়েই ঠিক মতো নোট তুলতে পারলে ক্ষতি কী?'

'গান শেখা নিয়ে দুঃখ আছে! গান আর স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর জিনিস...'

'চেষ্টা করেছেন কখনো?'

'সময় বা সেই স্কিল কোনোটাই ছিল না!'

'তা-ও চেষ্টা করতে পারতেন! হয়ত নিজের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার দেখা পেতে পারতেন...'

অমৃতা ঘরে ঢোকার সময় আলোচনার একাংশ শুনেছিল। বলল, 'যখন দুনিয়াটাই ক্ষমতার থাবায় পড়ে খাবি খাচ্ছে তখন প্রতিভা নিয়ে কে কথা বলছে!'

'ঈশ্বরদত্ত অবদান নিয়ে মাথা ঘামাব না বলছিস?' শ্রেষ্ঠা ঘাড় বাঁকাল।

'তুই যদি চেষ্টার ওপর আস্থা রাখিস ঈশ্বরকে নিয়ে আর আলাদা করে মাথা না ঘামালেও চলবে...' অমৃতা দৃঢ় গলায় বলল, 'যাক গে, বাদ দে। আরে, উঠবি না? এবার ওঠ।'

'চল...' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল শ্রেষ্ঠা,'সাবধানে থাকবেন। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে হবে!'

ওরা বেরিয়ে যাবার পর সুমিত ভাবছিল ওদের আসাটা নিয়ে। কেবল কি ভদ্রতা রক্ষা? কার্টসি ভিজিট, নাকি ডাবল-চেক? শ্রেষ্ঠা ভেবেচিন্তে দান ফেলার মানুষ। তার আপাত শান্ত মুখটার পেছনে এমন কিছু ছিল যেটার আঁচ সুমিতকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। বুঝে উঠতে পারছিল না গপ্পোটা ঠিক কী! কিন্তু তাকে তো বুঝতেই হবে। আর তাহলেই অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে...

'প্রশান্ত। প্রশান্ত দেশমুখ।' পুলিশ অফিসারটি এসে পৌঁছেছিল ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে যাবার পর।

'আসুন আসুন...' সুমিত মনে মনে চৌবেকে ধন্যবাদই দিচ্ছিল।

'এসেছিলাম একটা এনকোয়ারিতে। আমার এরিয়ার এক প্রোমোটার, নামী লোক, বিবেক সিংহানিয়া এখানে আজ মারা গেছে। মেডিক্যাল নেগলিজেন্সি নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে। ডিটেল নিতেই আসতে হল...'

'সিংহানিয়া মারা গেছে!' সুমিতের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। তার আশঙ্কা এত শিগগির যে ফলে যাবে ভাবতে পারছিল না।

'হ্যাঁ, আজই। এসেছিল পেসমেকার চেঞ্জ করাতে। ক্যাথ ল্যাবেই মারা গেছে...'

‘কীভাবে?’ সুমিত উত্তেজনায় বেডের ওপর উঠে বসেছিল।

‘সেটাই রহস্য। ডাক্তাররা কেউ কিছু বলতেই পারছে না। এখন পোস্ট মর্টেমে যদি ধরা যায়...’

‘মেডিক্যাল নেগলিজেন্সির কথা কেন?’

‘লোকে তো আর দেখতে যাচ্ছে না ভেতরে কী হচ্ছে। মেডিক্যাল বুলেটিনকে আজকাল কেউ পাত্তাই দ্যায় না। সব নাকি হোক্স। আজকাল এই তো হচ্ছে সর্বত্র... কোনো কোনো কেসে এরকম হয় না তা-ও হয়ত নয়, কিন্তু সব জায়গাতেই যে এরকম তারও অবিশ্যি মানে নেই! এই কেসে মনে হচ্ছে তেমন কিছু হয়ওনি। হাসপাতাল তো হাত ঝেড়ে দিচ্ছে। চৌবে বলছিল আপনি রাবেয়া সরকারের মৃত্যুটা নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছেন...’

তার মাথায় টং টং করে বাজছিল এগারো নং রিডটা। একটা পুরুষের মৃত্যু সম্ভাব্য ছিল। কিন্তু সিংহানিয়া যে এত শিগগির... হাত কামড়াচ্ছিল এই ভেবে যদি চৌবে তার কথা শুনেও অন্তত বেচারিকে তুলে নিত তাহলে এটা আটকাবার চেষ্টা করা যেত। অবিশ্যি সে-ও তো ওকে বলেছে সবে কাল। এবার হয়ত ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব খাড়া করা হবে। ঘটনা যদ্দূর সম্ভব তা নয়। ফিবোনাচ্চি অর্ডারে সিংহানিয়া ছিল ১১তম লক্ষ্য। প্রশান্ত যাবার পর এটা নিয়ে ভাবতে হবে।

‘আপনি যদি একটু সাহায্য করতেন...’ সুমিত মুখ তুলল।

‘খুঁজছিলেন রাবেয়ার ডিটেলস আর অদ্ভুত ভাবে সিংহানিয়া মারা গেল, আর রাবেয়া ছিল ওরই কেপ্ট...’

‘মেয়েটা কীভাবে মারা গেছিল?’ সুমিত তাকিয়ে থাকল।

‘মেক আপ রুমে, মেক আপ নিচ্ছিল।’

‘তদন্ত কী বলছে?’

‘কী আর বলবে? যা হয় এসব ক্ষেত্রে, এখানে তো বাজারটা ছোট, পয়সাও নেই, এই টলি নায়িকা চেষ্টা চালাচ্ছিল বলিউডে পাড়ি দিতে। টলি ক্লাবে এদিন বিকেলে ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রোডিউসার সুধা গোয়েঙ্কার কথাও হয়েছিল...’

‘ওই সুধা কি কলকাতার মেয়ে?’

‘অজন্তা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে...’

সুমিত চকিতে তাকাল। প্রিয়াঙ্কাও ওখানেই থকত না? মহিলা কি প্রিয়াঙ্কাকে চিনত বা চেনে? অনেকেই, যারা মারা গেছে, তাদের সঙ্গে ওর সরাসরি বা ঘুরপথে যোগ ছিল। এবার বিবেক... তার এখন মনে হতে শুরু করেছে শ্রেষ্ঠাই আসলে খুনি। কেবল মোটিভটাই যা বোঝা যাচ্ছে না!

‘ওকেও কি সাসপেক্টের মধ্যে রাখা হচ্ছে?’

‘তদন্তের পর ওকে নিয়ে তেমন কিছু সন্দেহ নেই... নিজের ফান্ড করা ছবির নায়িকাকে খুন... না বোধহয়। টাকা তো আর খোলামকুচি নয়?’

প্রশান্তের যুক্তি মনে ধরল। ও হাল ছাড়ল না,‘ কিন্তু আমি হলে ওকে এত সহজে ছাড় দিতাম না...’

‘কেন?’ দেশমুখ ভুরু কোঁচকাল।

‘যদি আরো কোনো বড় খেলা হয়? হবেই বলছি না, কিন্তু হতেও তো পারে, না কি?’

‘ইন্ডাস্ট্রিতে এমন কারো কথা জানা যাচ্ছে না যার ওকে সরানো দরকার ছিল। সিংহানিয়াই ছিল একমাত্র, কিন্তু সে-ও তো এখন নেই...’

‘পি এম রিপোর্টের একটা কপি পেতে পারি?’

‘আবার এখানে আসা হবে না। বিকাশ বলেছিল বলেই ঘুরে গেলাম। ও আপনাকে পছন্দ করে। স্ক্যান কপি পাঠিয়ে দেওয়া যাবে নিশ্চয়। এটা কিন্তু একদম আনঅফিসিয়াল। পুলিস পেপার বাইরে বেরোলে ঝামেলায় পড়ে যাব...’

‘কথা দিচ্ছি কিচ্ছু হবে না। কেউ জানবে না।’

তার ভিজিটিং কার্ডটা নিয়ে প্রশান্ত বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় নার্স আসতেই সুমিত জিগ্যেস করল, 'প্রোমোটার সিংহানিয়া নাকি এখানে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ স্যার। ক্যাথ ল্যাবে পেসমেকার অ্যানালাইজারের সমস্যা...'

'এরকম আগেও হয়েছে নাকি এখানে?'

'যদ্দূর জানি, না। কখনো শুনিনি। ওরা কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভকে ডেকে খোঁজখবর করছে। শুনলাম অ্যাপারেটাসটা চেক আপে পাঠানো হয়েছে। রিপ্রেজেন্টেটিভকে নিয়ে খুব টানাটানি হচ্ছে। স্বাভাবিক না স্যার, যেখানে আমাদের হাসপাতালের কোনো ফলট নেই সেখানে এটা... এটা তো আমাদের বদনাম?'

'শুনছিলাম মেডিক্যাল নেগলিজেন্স নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে।'

'হবেই তো। লোকেরা তো জানে না ভেতরে কী হচ্ছে... আমাদের কোনো হাত নেই। কোম্পানির দায়...'

'নতুন কোনো কোম্পানি নাকি?'

'না। এরা এখানে পেস মেকার সাপ্লাই করছে বহুদিন। এরাই রেগুলার মনিটর করে। খুবই রেপুটেড ফার্ম। ইন্ডিয়া মেডট্রনিক...'

সুমিত চুপ। প্রেস্টিজিয়াস কোনো ফার্ম খামোকা বদনাম কুড়োতে যাবে কেন? অ্যাপারেটাসই বা আচমকা কাজ করবে না কেন? ইউজ করার আগে তো চেক করে নেওয়াই স্বাভাবিক, করতে বাধ্যও। ইলেক্ট্রনিক গুডস অনেক সময় কাজ ঠিক মতো না করতেই পারে। সেটা তাই চেক করে নেওয়া হয় ব্যবহারের আগেই। তাহলে? নার্স কাজ সেরে চলে গেল। সুমিত শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবছিল। নাঃ সিংহানিয়ার মৃত্যুকে আকস্মিক ধরার কোনো কারণ নেই। তাহলে কি খুনি রিপ্রেজেন্টেটিভকে হাত করেছিল? হতেই পারে। কিন্তু রিপ্রেজেন্টেটিভও তো এই করেই খায়। সে কি খামোকা নিজের ঘাড়ে এতবড় ঝামেলা নিতে যাবে? যুক্তি মানলে উত্তর - একটি বিশাল 'না'।

সিংহানিয়ার মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠাকে সবথেকে বেশি সন্দেহ হচ্ছে। যদি সে-ই হয়, মোটিভ কিন্তু এখনও ধোঁয়াটেই রয়ে যাচ্ছে। তাকে গাঁথতে গেলে শক্তপোক্ত প্রমাণ খাড়া করতে হবে। বিকাশ একাজ করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। একমাত্র শরণ নেবার পাত্র থাকছে ডাঃ অনঙ্গ দত্ত।

ফিবোনাচ্চি ল মানলে ক্লাইম্যাক্স হবে ৬১%। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে তেরো হল গিয়ে চূড়ান্ত সংখ্যা, তাহলে এখনো আরো দু-জন মহিলাকে মরতে হয়। তাহলেই রাবেয়া দাঁড়াবে ক্লাইম্যাক্স। অটপ্সি রিপোর্টই থাকছে একমাত্র অস্ত্র। যতক্ষণ না হাতে আসে তার মধ্যে ডাঃ অনঙ্গ দত্তের সঙ্গে কথা বলে নেওয়াই ভালো।

সে ফোন করল,'অ্যাপোলোয় ফেঁসে আছি। বাইক থেকে পড়েছিলাম। মুখে ফ্র্যাকচার হয়েছে। পায়ে স্প্রেন...'

'কী করে পড়লি?' অনঙ্গ কনসাল্টেন্সি রুম থেকে বেরিয়েছিল।

'কে রাস্তায় মোবিল ফেলে... খেয়াল করিনি। ফ্র্যাকচার অপারেটেড। এখন থাকো পায়ের জন্যে ৩ হপ্তা শুয়ে । আয়ুষীও বলল এখানে থাকলেই ভালো টেক কেয়ার হবে...'

'তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ...'

'যে জন্যে ফোন করলাম, শ্রেষ্ঠা বিশ্বাস নামে একটা মেয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজছিলাম। এখন একডালিয়ায় থাকে। এক্স সাউথ পয়েন্ট। প্রেসিডেন্সি। তোর কোনো সিনিয়ার কেউ কখনো ওর সাইকিয়াট্রিক কন্সাল্টেন্সি করে থাকে যদি তাহলে তার হিস্ট্রিটা যদি...'

'কোনো ঝামেলা?'

'সেদিন তুই বর্ডারলাইন পার্সোন্যালিটি ডিজঅর্ডারের কথা বললি। মনে হয় ওতেই ভুগছে...'

'জানি না কেউ করলেও তার মনে আছে কিনা! দেখছি...'
'থ্যাঙ্কস। দ্যাখ যদি পাস। বেরিয়ে দেখা করব।'
'সময় লাগবে। যদি কিছু পাই জানাচ্ছি...'
'ধন্যবাদ।' সুমিত ফোন ছাড়ল।

সে কি ঠিক পথে ভাবছে? চৌবে আর অনঙ্গই ভরসা। সাইকিয়াট্রিক হিস্ট্রি জরুরি বটেই, কিন্তু অতীতটাও দরকার। সাইকিয়াট্রিক হিস্ট্রি কি মিলবে? যদি কোনো ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে... অমৃতাই অবিশ্যি আছে, কিন্তু ওকে কি আর...

ভাগ্য কার সঙ্গে কখন কী খেলা খেলে কে বলবে?

***

অ্যাপোলো থেকে ফিরে সুমিত আয়ুষীর সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। বর্ষা চ্যাটার্জির কাছ থেকে ফোন পেয়ে অবাক।

'শুনলাম আপনি হাসপাতালে?'
'হ্যাঁ, মুখে ফ্র্যাকচার আর অ্যাঙ্কল স্প্রেন হয়েছিল। সবে ফিরেছি হাসপাতাল থেকে।'
'ঈশিতার মারা যাবার ব্যাপারটার কিছু হল?'
'যদ্দূর জানি, না।'
'সিচুয়েশন ওই রকমই। ওর স্বামী মনোজিতের ধারণা ওটা খুনই ছিল। অগ্নিভর প্রেমিকা শ্রেষ্ঠার ওখানে কিছু হাত ছিল বলেই মনে হয়।'
'এক্স-আইএসআই লোকটা?'
'সে-ই। শ্রেষ্ঠাই ছিল তার গার্লফ্রেন্ড। মনে হয় হিংসেয় ও-ই করেছে। লাভ ট্র্যাঙ্গল...'

এই... এই... এই ... এই আসল খবর! শ্রেষ্ঠা তাহলে এখানেও! মনোজিৎ এখানে পয়েন্টই নয়। যত নাড়াচাড়া পড়বে তত এই নামটাই উঠে আসবে। সে নিশ্চিত। আসবেই। হাসপাতাল থেকে বেরোবার আগে তাকে যিনি দেখছিলেন সেই ডাঃ সপ্তর্ষি মুখার্জির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অদ্ভুত খবর দিলেন।

'লোকে কোনো মেডিক্যাল মিসহ্যাপ হলে তো ডাক্তারদেরই দোষ দেয়। কিন্তু সব সময়েই আমাদের করার কিছু কি থাকে? এই তো সম্প্রতি সিংহানিয়ার কেসটা হল, শুনেছেন নিশ্চয়...'
'শুনছিলাম...'
'প্রথমে ওরা ডাক্তারদের দোষ দিচ্ছিল। পরে নজরে এল পেস মেকার অ্যানালাইজারটাই অচল হয়ে গেছিল। মেডট্রনিক কোম্পানি, যারা পেস মেকার সাপ্লাই করেছিল, কাল বলল পেস মেকার অ্যানালাইজারে সমস্যা ছিল না। হ্যাক হয়েছিল।'
'হ্যাক হতে পারে?'
'হতেই পারে। পেসিং-এর সময় স্টেরাইল ডিটেক্টর পেশেন্টের ওপর ফেলা হয়। ওয়াই ফাই দিয়ে ওটাকে কন্ট্রোল করতে হয়। বলছে অ্যানালাইজার হ্যাকড হয়েছিল...'
'এরকম হতে পারে?'
'কী করে বলব? পারে হয়ত। টেকনিক্যাল ব্যাপার। বলছে ৩০০ মিটার রেডিয়াসের মধ্যে হলে হ্যাক হলেও হতে পারে।'

তখন তো শ্রেষ্ঠাও হাসপাতালেই ছিল? তখনই কি করে বসে আছে? উত্তেজনা সামাল দিতে অসুবিধে হলেও মুখ-চোখ স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল।

সপ্তর্ষি বলছিলেন,'এখন এত টেকনিক্যাল জিনিস এসে গেছে আধুনিক মেডিক্যাল লাইনে, সব কিছু নখদর্পণে রাখাটাও সমস্যা। এই যে আপনার ফ্র্যাকচার অপারেট করলাম, এবার ওই প্লেট যদি ভেঙে যায়

বা স্ক্রু খুলে যায় তাতে আমি কী করব? আমার দোষ তো হতে পারে না। কিন্তু লোক আমাকেই ধরবে। মিডিয়াও এদের সব কথা বলবে না। টি আর পির ব্যাপার আছে। তারাও আমাদেরকেই ধরে। মানুষও ওদেরকেই বিশ্বাসও করে...'

ঠিকই। মিডিয়া সত্যিই ব্যাপারটাকে আরো ঘোরালোই করে দেয়। তখন এই মহান পেশা নিয়ে মানুষ ক্ষোভ উগরে দেয়। যদি এর জন্যে তাঁরা চিকিৎসা না করতে চান তখন তাঁদের ঝামেলায় ফাঁসতে হয়, আবার করলেও পান থেকে চুন খসলে জনসাধারণ, মিডিয়া সবাই একসঙ্গে চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে দেয়। যদিও মেডিক্যাল নিয়মেই তাঁদেরও চিকিৎসা না করার অধিকার আছে।

যদি শ্রেষ্ঠা এখানে অপরাধী হয় তাহলেও সিংহানিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর থিওরি বাতিল করতেই হচ্ছে।

'শ্রেষ্ঠার কি অগ্নিভর সঙ্গে যোগ আছে?'

'মনে তো হয়...'বর্ষা বলল, 'নইলে মনোজিৎ চেঁচামেচি করত কি?'

মনে পড়ে গেল খুনির কাছ থেকে পাওয়া টেক্সটা: এত বুদ্ধি নিয়ে কি ধুয়ে খাচ্ছেন ! প্রফেসর ঈশিতা ভট্টাচার্যের ব্যাকগ্রাউন্ড, আফেয়ার্স চেক করার কথা মাথায় এল না ? ছ্যাঃ সে পাত্তা দ্যায়নি ! এখন বুঝতে পারছিল সবগুলো তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ !

'অগ্নিভর ব্যাপারটা চেক করছি। আপনিই নম্বরটা দিয়েছিলেন। ফোনে থাকার কথা। দেখছি। যদি আরেকবার পাঠিয়ে দেন...'

'পাঠাচ্ছি। আমি কথা বলতে পারছি না। ও মনে করতে পারে আমি বুঝি ওদের রিলেশনশিপের গসিপ করছি। আপনাকে বাদে কাউকে বলিওনি। আমিই বা কী করি, ঈশিতা মনোজিতের সঙ্গে সম্পর্কটা বিশ্বভারতীর সাহিনা নামে মহিলার জন্যে একেবারে তলানিতে ঠেকেছে বলে এত কান্নাকাটি করত... আমি কী করি বলুন, কলিগ হিসেবে শুনতে তো হয়ই...'

'আরেকবার ওর নম্বরটা...'

শ্রেষ্ঠার অতীত সম্পর্কে ক্লু পেলে হত। কোত্থেকে পাবে জানে না, কিন্তু পেতেই হবে। অগ্নিভর কাছে চৌবের বা অনঙ্গদের থেকে বেশি কিছু পেতেই পারে। কিন্তু কথাটা বলবে কীভাবে? জিগ্যেস করলেই হুড়মুড় করে বলে দেবে এমন তো হতে পারে না... অগ্নিভকে ধরার আগে বিষয়টা ছকে নিতে হবে। আগে বরং মনোজিৎকেই ট্রাই করে দেখা যাক! সুবিধের হলেও হতে পারে। সময় নষ্ট না করে সুমিত ওদের বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

মনোজিৎ সবে স্নান সেরে বেরিয়ে মাথা মুছছিল। বলল, 'ধন্যবাদ, এলেন বলে। ওর মৃত্যুর কারণটাই মাথায় ঢুকছে না...'

'শুনলাম স্যালিসাইলেটের জন্যে...'

'জানি। পুলিস করছে কী? আমার স্ত্রী হঠাৎ, কথা নেই বার্তা নেই স্যালিসাইলেটের জন্যে মারা গেল! একটা ব্যাখ্যা তো থাকবে? কী করে ওই ডোজে খেল? শেষে এটাকে স্যুইসাইড বলে চালিয়ে দেবে...'

'অত নেগেটিভ হচ্ছেন কেন? হাল ছেড়ে দিলে তো শেষ। বন্ধু মানুষ, যার সঙ্গে কয়েক ঘন্টা আগেও কথা হয়েছে... ওরা নিশ্চয় সব অ্যাঙ্গেল থেকে ব্যাপারটা দেখবে...' সুমিত সান্ত্বনা দিতে চাইছিল।

'সিওর অগ্নিভর এখানে হাত আছে। থাকতে বাধ্য...'

'অগ্নিভ কে?' সুমিত যেন নামটা আগে শোনেনি।

'লুকিয়ে লাভ নেই। যা হবার হয়েই গেছে। ওর কোনো পোস্ট-ডক বন্ধু। আমার অবর্তমানে ঈশিতার সঙ্গে শুচ্ছিল।'

'তা-ই? কী হয়েছিল? আপনারা এত সুখী।'

'আমি শান্তিনিকেতনে, সেই সুযোগটা নিয়ে ওরা... কত বলেছি, এসব ক্ষেত্রে রিস্ক থাকে! জানতাম একদিন ঝামেলায় পড়বে। সেই হল...'

'যা ভাবছেন তা নয় হয়ত...'

'তা-ই। সব এক সময় বেরোবে। ও স্যুইসাইড করার মেয়েই ছিল না। এটা খুন। সিম্পল মার্ডার।'

'অ্যাফেয়ার হলে খুন করবে কেন?'

'আর কী হবে! বেনারসি পানওয়ালার দোকান অব্দি দৌড়েছি! ওখানকার নিয়মিত খদ্দের ছিল। গলথেরিয়া অয়েলের ব্যাপারে কিছু জানে না। ওই আসল লোক। পুলিসকে সব বলব। ধরিয়ে আনাব ওকে। শেষ দেখে ছাড়ব...'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, আগে একটু দেখতে দিন বিষয়টা... লোকটির নম্বর আছে আপনার কাছে?'

দ্বিতীয়জনের কাছ থেকেও নম্বরটা নিয়ে সুমিত বেরিয়ে এল।

'প্রফেসর সুমিত দাস বলছি। আমায় মনে আছে?' অগ্নিভকে ধরল ফোনে।

'অফ কোর্স। সেই আইএসআইয়ের দিনগুলো কি ভুলতে পারি?'

'কথা বলা যায় , ঈশিতার মারা যাবার ব্যাপারটা নিয়ে?'

ফোনটা পেয়ে যে চমকেছিল সেটা অগ্নিভ গলায় লুকোচ্ছিল, 'সিওর। ওরা খুঁজে পেল কী করে মারা গেল?'

'না। ওর স্বামী মনোজিৎ আপনার বিরুদ্ধে... খুনের চার্জ, বুঝতে পারছেন?'

'কী-ঈ-ঈ-ঈ!!!' অগ্নিভ চমকেছে।

'বলছে আপনাদের নাকি অ্যাফেয়ার ছিল। পুলিসে বলে দেবে...'

অগ্নিভ সত্যিই থতিয়ে ভয় পেয়েছে,'আ-আমি?'

'শুনে আপনার নম্বর নিলাম ওর থেকে।' বর্ষার কথা চেপে গেল,'এখন না হয় ঠেকিয়েছি, কিন্তু বেশিদিন যাবে না। কথা হলে সুরাহা হতে পারে...'

অগ্নিভও সেটাই ভাবছিল,'শনিবার বিকেলে?'

'আমার এখানে। ড্রিঙ্কস নিয়ে বসে প্ল্যান ছকা যাবে!'

'ফাইন...'

'ব্যাপারটা কী? প্রফেশনাল কলিগের ভিউপয়েন্ট থেকে জানতে চাইছি---' সুমিত পল জন নিয়ে বসেছিল। ভারতীয় সিঙ্গল মল্ট হুইস্কির মধ্যে এটাই পছন্দ। একটা ডাবল অগ্নিভর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আগে টেস্ট করা আছে?'

'না...'

'ব্রিলিয়ান্ট। গোয়ার প্রোডাক্ট! হাইলি অ্যাক্লেইমড।'

পেগ নিয়ে সোফায় এলিয়ে বসল। অগ্নিভ একটু বদলেছে। তখন মুখচোরা টাইপ ছিল। এখন আল্ট্রা-মড।

'ও কিন্তু আমার কলিগ ছিল। ভালো সম্পর্কই ছিল। তবে অ্যাফেয়ার নয়...'

'বিয়ে করেছেন?'

'এখনো না। ভালো পাত্রী পেলে এবার ভাবছি করেই ফেলব...' আয়ুষীর পেঁয়াজি দারুণ যায় ড্রিঙ্কসের সঙ্গে। তুলে নিল অগ্নিভ।

'ডেটিং করছেন না?' সুমিত চাইছিল শ্রেষ্ঠার সঙ্গে ওর কিছু আছে কিনা আন্দাজ পেতে।

'একবার দাগা খাওয়া তো! সাহস হয় না। ফালতু ফেঁসে বসে থাকতে হবে...'

'বলেন কী? তা, সুন্দরীটি কে?'

‘শ্রেষ্ঠা। শ্রেষ্ঠা বিশ্বাস। বান্ধবী। প্রেসিডেন্সির। না না, আরো আগের, সাউথ পয়েন্টের...’

‘তিনি বিয়ে করেছেন?’ সুমিত গ্লাসে চুমুক দিল।

‘না। ও যদি বিয়ে করে নিত তাহলেও হয়ত এতটা... ওই জন্যেই তো...’

‘এখনো খুবই ভালোবাসেন নিশ্চয় ওঁকে। ফিরে যাচ্ছেন না কেন?’

‘কী করে ফিরব? আর হয় না। শ্রেষ্ঠাই নিজের হাতে সব শেষ করে দিয়েছে...ও আর হয় না...’

সুমিত অগ্নিভর মুখে শ্রেষ্ঠার নামটা উঠে আসায় খুশিই হয়েছিল। আর কয়েকটার পর নিশ্চয় আরো কিছু বলবে। শ্রেষ্ঠার কথা তোলার ব্যাপারে খুব খাটতে হল না।

‘কদ্দিন চলেছিল অ্যাফেয়ারটা?’ জানতে চাইল। দু নম্বর বড় পেগের পর অগ্নিভ মনে হচ্ছিল ভুলেই গেছে কী জন্যে এখানে এসেছে। সুমিত ঠিক এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

‘তখন আমরা সাউথ পয়েন্টে, জানেন! তিন বছরের জুনিয়র ছিল। টমবয় গোছের মেয়ে বলে মেয়েদের সঙ্গে পটত না...’

‘এরকম কোনো মেয়ের সঙ্গে সাধারণত ছেলেদের তেমন জমে না।’

‘স্কুলে যে খুব কিছু হয়েছিল তা নয়। পরে... ওর আর-পাঁচজনের থেকে আলাদা দিকটাই বেশি করে টেনেছিল...’

‘সুন্দরী খুব?’

‘না। ছোট চুল। জিনসেই বেশি অভ্যস্ত। খুব যে ভলাপচুয়াস তা-ও নয়। সব মিলিয়ে তেমন নজর কাড়াও নয়।’ অগ্নিভ পেঁয়াজির দিকেই মন দিচ্ছিল। মাঝেমধ্যে বড় চুমুক দিচ্ছে। তিন নম্বর চলছে, ‘কলেজে এসে ওকে নতুন করে চোখে পড়ল। আইকন ফেস্টের সময়... আমি তখন কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি। সেই আলাপ। পরে দেখলাম গানটা গায়। অন্য ইন্টারেস্টও আছে...’

‘সেখান থেকে প্রেম?’

‘তেমন পাত্তা দিতাম না। কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি! ও-ও দেখলাম আমার দিকে ঝুঁকেছে। তখন...’ অগ্নিভর গলায় আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া।

‘আপনি তখন...’

‘কোনো মেয়ে যদি নিজেকে খুলে দিতে চায়, কে আপত্তি করে ওই বয়েসে! পরে যতদিন গেছে দেখেছি মানতেই হবে ওর ট্যালেন্ট প্রচুর। এরকম একটা মেয়ে...’

সুমিত ওদের প্রেম কাহিনিতে মন দিচ্ছিল। বিশেষ করে শ্রেষ্ঠার মানসিক চেহারাটা বুঝতেই হবে। অগ্নিভকে অন্য বিষয়ে যেতে দিলে সব গুলিয়ে যাবে।

‘ওর মানসিকতাটাই অদ্ভুত ছিল! অন্যদের নানাভাবে টিজ করে, অপদস্থ করে মজা পেত; স্যাডিস্টিক কিক পেত...’

‘স্বাভাবিক নয়। এরকম কেন করত?’

‘ঈশ্বর জানে! ওর মানসিকতাটাই ওরকম ছিল...’

সুমিত নড়ে বসেছিল। ওই তাসটাই এই ধাঁধাতেও খেলা হচ্ছে কি? মনে হচ্ছে না? মনের গভীর গহ্বর থেকে উঠে আসা এ কি একধরনের কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাবার, উত্তেজনা লাভ করার বাসনা? আগে যেটা অন্যকে খেলিয়ে মজা পাওয়া ছিল এখন হয়ত সেটাই সিরিয়াল কিলারের চেহারায় বেরিয়ে এসেছে। স্মার্ট সুমিতকে ধোঁকা দিয়ে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েই মজা পাওয়ার বিকৃত একটা ইচ্ছে --- এটাই কি যথেষ্ট নয়, এরকম ক্রাইমে জড়িয়ে ফেলার জন্যে। সব বোঝা যাচ্ছে, জানাও যাচ্ছে, ধরো দেখি কে পারো! কিন্তু অহঙ্কার, কেবল নিজের ওপর অসম্ভব রকম বেশি বিশ্বাস - এ থেকে কি এরকম পরের পর খুন সম্ভব? বুঝতে পারছিল না।

‘আয়ুষীর ডিনার মনে হয় রেডি...’ অগ্নিভকে নিয়ে উঠল। এরপর নিজেও আর সটান থাকতে পারবে না হয়ত। তার চেয়ে...

তিনজনে চুপচাপ ডিনার সারল। অগ্নিভ কথা বলার অবস্থায় ছিল না। সুমিতই বলল, ‘চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসি।’

‘না, একটা উবের-টুবের কিছু ধরে নিলেই হবে! ঠিক আছে।’

***

‘কী কাণ্ড!’ সোহিনী দরজা খুলেই হইহই করে উঠল শ্রেষ্ঠা আর অমৃতাকে দেখে, ‘আগে ফোন করবে তো!’

‘কাছেই এসেছিলাম। মনে হল একবার হ্যালো বলে যাই!’

সকাল দশটা। সোহিনী একটা শর্টস আর হাতকাটা কুর্তি পরে রান্নায় ব্যস্ত ছিল। এক গাল হেসে বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাল।

‘আজ আইসিসিআরে সন্ধে ছটায় অমৃতার গানের প্রোগ্রাম। ভাবলাম তোমায় বলে যাই। যদি আসো...’শ্রেষ্ঠা বলল।

‘প্রবলেম হবে না। রাজ দিল্লিতে। আমার আর কাজ কী? এসো, কিচেনে এসো। রান্না করছিলাম...’

তিনজনে কিচেনে ঢুকল। সোহিনী আনাজপাতি কেটে সেগুলো ভাজছিল। বলল, ‘অমৃতার গান! দারুণ ব্যাপার...’শ্রেষ্ঠার দিকে ফিরল, ‘তোমার ছবি দেখাতে ডাকছ কবে?’

‘শিগগিরই। ভাবছি অ্যাকাডেমি না বিড়লা - কোথায় করব এক্সিবিশনটা?’

‘দারুণ হবে!’

‘ছবি তো আর বেচব না! লোকে ভালো বললে ইগোয় বাতাস লাগবে!’

‘তোমাদের মতো ট্যালেন্ট থাকলে কী ভালোই না হত! তাই তোমার কাছে শিখছি তো! যদি কিছু করা যায়...’

এমন সময় ডোরবেল বাজল। ‘কে আবার এল, শ্রেষ্ঠা প্লিজ একটু দ্যাখো না ...’

শ্রেষ্ঠা বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্তে তার গলা, ‘বলছে কাগজের ছেলে। টাকা নিতে এসছে...’

‘দাঁড়াতে বলো না প্লিজ, এখুনি আসছি...’ ভাজাটা শেষ করে গ্যাসটা আঁচ কমিয়ে শ্রেষ্ঠার কাছে। যেই না দরজায় হাত রেখেছে অম্নি লাউঞ্জের টেবলে রাখাটা ফোনটা বেজে উঠল। সোহিনী পড়িমরি করে দৌড় দিল। বিকাশ!

‘রাতে ফ্রি?’ তর সইছে না, সিংহানিয়ার কেসটাই মাথায় ঘুরছে।

‘না। শ্রেষ্ঠা আর অমৃতা এসেছে। আইসিসিআরে অমৃতার গানের প্রোগ্রামে যাবার কথা হচ্ছে।’বুঝতে পারছিল বিকাশ হয়ত আরো কিছু বলবে। চেঁচিয়ে শ্রেষ্ঠাকে বলল,‘শেলফে টাকা রাখা আছে। ওকে দিয়ে দাও...’

‘কাকে কী দেব?’ বিকাশ অবাক!

‘তোমায় কে বলল, শ্রেষ্ঠাকে কাগজের ছেলেটাকে টাকা দিতে বলছি...’

‘রাজ এখানে?’

‘না। দিল্লিতে...’

‘শোয়ের পর ওখানেই থেকো। তুলে নেব...’

‘সে তো গাড়ি থাকবে আমার।’

‘ফাইন। ফ্রি হলে ফোন কোরো, কথা আছে...’ ফোন কেটে দিল। সোহিনীর চোখে পড়ল যে ঘরে ও ছবি আঁকে শ্রেষ্ঠা সেদিকেই গেল। আদ্ধেক শেষ হওয়া ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

‘খারাপ তো হচ্ছে না কিছু...’ শ্রেষ্ঠা বলল।
‘আমি তো সময়টা কাটাতেই...’
‘এটাই আসল স্পিরিট!’
অমৃতাও কিচেন থেকে চলে এসেছে,‘এবার কিন্তু যেতেই হবে! অজন্তা আর বালি হাইটসেও তো যেতে হবে...’
‘কে কে আসছে?’
‘সুধা আসবে বলল, মণিদীপাও হয়ত, যদি ফ্রি হয়ে যেতে পারে...’ শ্রেষ্ঠা বলল, ‘চলি! ছ’টায় দেখা হচ্ছে...’

৬টা বেজে গিয়েছিল। শ্রেষ্ঠা তখনো সোহিনীর অপেক্ষায়। টেক্সট করছে চলে আসার জন্যে। কিছুক্ষণ ধরে ফোনে ট্রাইও করছিল। কিন্তু মোবাইল কেবল বেজেই যাচ্ছে...
অমৃতা দারুণ গাইল। পুরো অডিয়েন্স ওর সুরে পাগল। সাড়ে আটটা বেজে যাবার পর শ্রেষ্ঠা উৎকণ্ঠায় পড়ে গেল,‘সোহিনীটার কী হল বলো তো... এরকম তো কই করে না। এল না। ফোন বেজে যাচ্ছে, ধরছেও না...’
‘ও জানত তো প্রোগ্রামটা আজ ৬টায়?’ সুধা জিগগেস করল।
‘অফ কোর্স। ফোনটাই বা ধরছে না কেন? টেক্সট করলাম। কোনো রেসপন্স নেই...’
‘পরে চেক করা যাবে... কাল...’ মণিদীপা বলল।

বিকাশও বারবার সোহিনীকে ফোনে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ওপার থেকে কোনো রেসপন্স না পেয়ে এবার সজাগ হল। ব্যাপারটা কী! এমন তো হয় না। ওর ফ্ল্যাটেই গিয়ে দেখবে নাকি? রাজ নেই, তাই চিন্তারও কারণ নেই। ভিডিও ফোনে সাড়া না পেয়ে যথেষ্ট চিন্তায় পড়ে গেছে।
শেষে ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙার আগে অনেক ভেবে শ্রেষ্ঠাকেই ফোনে ধরল,‘সোহিনী আছে? আপনারা তো বোধহয় আইসিসিআরে।’
‘না তো! আসেইনি। ফোন ধরছে না। টেক্সট করলেও জাবাব দিচ্ছে না...’
ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়। দরজা ভাঙার জন্যে তৈরি হল। পুলিস টিমকে ডাকল। দরজা খোলার পর বেডরুমে দেখা গেল সোহিনী শান্ত মুখে ঘুমিয়ে আছে। প্রথমে খুব রাগ হচ্ছিল। সবাইকে উদ্ভ্রান্ত করে ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে! রেগে গিয়ে ওকে জাগাবার চেষ্টা করল। সাড়া নেই। পালস নেই। চোখ স্থির। এ হতেই পারে না! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। বহুদিন পরে তার চোখে আজ জল এল। কাঁদছিল সে। শেষে সোহিনীও...!
রূঢ় বাস্তবকে কি আর অস্বীকার করা যায়?

***

ভোর পাঁচটায় চৌবের ফোনে জাগল সুমিত।
‘সোহিনী নেই...’ চৌবের কান্নাজড়ানো গলা।
‘সোহিনীটা কে?’ জানতে চাইল।
‘আমার বান্ধবী। আপনি আগেই বলেছিলেন... সিংহানিয়ার পেছনে দৌড়েও বাঁচানো গেল না, তার ওপর আবার এই...’
‘হুঁ, সিংহানিয়া তো নেই, কিন্তু হলটা কী করে?’

‘ভগবান জানে! বডি পি এমে গেল। বিষ মনে হচ্ছে। অথচ কাল সকালেও কথা হল... শ্রেষ্ঠা-অমৃতারাও তখন ওর ফ্ল্যাটে... বলল বিকেলে নাকি আইসিসিআরে যাবে, অমৃতার গান আছে...’

‘গিয়েছিল?’

‘না। যায়নি। ফোনে ওকে না পেয়ে ওরাও চিন্তা করছিল। তারপর...’

সুমিতের মাথা বিদ্যুৎগতিতে কাজ করছিল। শ্রেষ্ঠাও ছিল সোহিনীর ফ্ল্যাটে? তারপর এই কাণ্ড? তার মানে কি সে এখানেও কাণ্ডটি ঘটিয়ে ভালো মানুষের মতো... অটপ্সির আগে জোর দিয়ে কিছু বলা যাবে না। কিন্তু সন্দেহের তির কি তার দিকেই নয়? অমৃতাও অবিশ্যি ছিল। প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু সব পথ যে রোমের দিকেই বেঁকে যাচ্ছে। যদি বিষই হয় তাহলে মেয়েটার অপরাধ কেবল প্রমাণের অপেক্ষা। এবং সমস্যাও সেখানেই। বিষ যদি হয়ও তাহলেও কাজটা যে ওরই এটা যে দাঁড়ায় না। সন্দেহ একটা ব্যাপার, কিন্তু আইনের বিচার অন্য কথাই বলবে।

‘প্রমাণ ছাড়া কিছু অন্য রকম ঘটনা ঘটানো হয়েছে এটা এস্ট্যাবলিশ করা কঠিন। হতে পারে কিছু মেডিক্যাল সমস্যা হয়েছিল। যেমন হার্ট অ্যাটাক। শুনেছি ডায়াবেটিকদের ক্ষেত্রে আচমকাই হতে পারে। আগে থেকে নাকি বোঝাই যায় না...’

‘যদ্দুর জানি ও ডায়াবেটিক ছিল না।’

‘অটপ্সি রিপোর্ট আসুক। কী বলে দেখুন। তার আগে কথা বলে লাভ হবে না...’

চৌবের থেকে বেশি আর কে জানে! পুলিসে এত বছর কাজ করে এটা অন্তত বুঝেছে প্রমাণ ছাড়া কোনো অভিযোগই ধোপে টেকে না। আর কোনো ভাবেই কোনো ফাদে পড়তে চায় না। পর পর দুবার ফেঁসেছে, একবার যোগেশ একবার সিংহানিয়ার ক্ষেত্রে, এবার বড়কর্তারা ক্ষমার চোখে দেখবে না। হয়ত ট্রান্সফার হতে হবে, প্রোমোশনও আটকাতে পারে... সে ওই পথ মাড়াতে চায় না...

সুমিত হাড়েহাড়ে বুঝতে পারছিল এটাই হারমোনিয়ামের বারো নং রিড। তেরো নম্বরের জন্যে অপেক্ষা করছিল। জানে এই অব্দি যা হবার হবেই। ঠেকাতে পারবে না। তার মধ্যেই যদি খুনির কাছে পৌঁছে যেতে পারে তাহলে অন্তত পরের আটটি মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব।

‘কী হয়ে গেল তাই নিয়ে খুব বেশি মাথা না ঘামিয়ে মাথা ঠান্ডা রাখুন। ভুল পা ফেলবেন না...’ সুমিতের সাবধানবাণী এই মুহূর্তে বিকাশের কাছে শিরোধার্য। ফোন নামাবার আগে সুমিত বলল,‘পি এম রিপোর্ট এলেই সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন...’

অনঙ্গর সঙ্গে শ্রেষ্ঠার বর্ডারলাইন পার্সোন্যালিটি ডিজঅর্ডার নিয়ে আবার কথা বলাটা খুব দরকারি হয়ে পড়ছে।

***

অনঙ্গ শ্রেষ্ঠার গপ্পো শুনে বলল,‘না। এটা বর্ডারলাইন পার্সোন্যালিটি ডিজঅর্ডার নয়। বরং চিত্রাঙ্গদার মতো...’

‘কী?’ সুমিত অবাক। রবীন্দ্রনাথ? মানুষটি তার কাছে গোলানো নাম।

‘রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের সারমর্ম ওর সাইকির সঙ্গে মিলে যায়। ওই নাটকের শেষ গানঃ

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।

নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।

পূজা করি রাখিবে উর্ধ্বে

সে নহি, সে নহি,

হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে

সে নহি, সে নহি,

যদি পার্শ্বে মোরে রাখো

সঙ্কটে সম্পদে,

সম্মতি দাও কঠিন ব্রতে

সহায় হতে

পাবে তুমি চিনিতে মোরে।

আজ শুধু করি নিবেদন

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।

যেটা নেই সেটা হল অর্জুনকে প্রত্যাখ্যানের পরের কাহিনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক এখানেই শেষ করেছেন। কিন্তু জীবন তো তার পরেও এগিয়ে চলে। এই মানসিক বিবর্তনই শ্রেষ্ঠার মানসিকতায় প্রকট।'

'তোমার তো দেখছি দিব্যি মনে আছে। আমার তো নেই। স্মৃতি থেকে এরকম পুরো গান... আমি পারব না...'

'রবীন্দ্রনাথ আমার প্যাশন। বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত। পাবে তুমি চিনিতে মোরে... এটাই ওর আসল মানসিকতা। কফি বলি...'

'সিওর। রোববারের সকালটা অনেকদিন এমন কাটেনি...' হাসছিল সুমিত।

অনঙ্গর মতো এমন সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। যখন তখন বিরক্ত করলেও কিছু মনে করে না। কিন্তু শ্রেষ্ঠার চরিত্র তার থিওরির সঙ্গে না যাওয়ায় হতাশ হয়েছিল। আগের ধারণা কি বাতিল করতে হবে?

'মেয়েটা সম্পর্কে যা বলছিস তাতে ও উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের , তবে তেমন পুতুপুতু নয়! ওর পুরুষালি হাবভাব, বয়ফ্রেন্ড না থাকা, এসব থেকে মনে হয় ওর মধ্যে নিজের আইডেনটিটি বিষয়ে অবচেতনে সন্দেহ কাজ করে। পুরুষদের সঙ্গে মেশে সন্দেহ নিরসনের জন্যে, পুরুষকে কন্ট্রোল করার মানসিকতা নিয়ে। বাইরের নারী অবয়ব এই পুরুষালি দিকটাকে চাপা দিতে সাহায্য করে। এগুলো প্রকট ইন্টারসেক্স ইস্যুর ক্ষেত্রে। সেক্সের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মেডিক্যাল গাইডলাইন খুব পরিষ্কার। সেক্স বিবেচিত হয় সাইকোলজিক্যাল সেক্স, জেনেটিক সেক্স, ফিজিক্যাল সেক্স, গোনাডাল সেক্স, জেনিটাল সেক্স প্যারামিটারে। এর মধ্যে সাইকোলজিক্যাল সেক্সই প্রধান। এর ক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল দিকটা বাদে বাকিটা পড়ে যাবে অন্য দিকে। মেডিক্যাল সংজ্ঞা এখানে কাজ করবে না।'

এতদিন শিখেছে স্ট্যাটিস্টিক্স, এখন গোয়েন্দাগিরির স্বার্থে প্রাণের দায়ে মেডিক্যাল বিষয়েও মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

'ওর অবচেতন সত্তা সব সময় শারীরিক সত্তার কাছে পৌঁছতে চেয়েছে। শেষ অব্দি কলেজে তার রোল মডেল অগ্নিভর সংস্পর্শে আসতেই তার প্রেমে পড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে অগ্নিভও ওর শিল্পপ্রেম, সংগীতপ্রেম বা ব্যক্তিত্বেরই প্রেমে পড়ে যায়। পরে সম্ভবত ওকে বাতিলই করেছিল। ঠিক চিত্রাঙ্গদারই মতো। এতেই ওর রাগ যায় দুগুণ বেড়ে। তখন মিউজিক, শিল্পকলা এসবে ডুবে থেকে আহত অহঙ্কারজনিত ক্ষোভ, প্রত্যাখ্যানকে ভুলতে চেষ্টা করল। খানিকটা সফলও হল।'

এই মুহূর্তে লুচি-আলুর দম-কফি এসে গেল টেবলে। আলোচনায় সাময়িক বাধা পড়ল। খেতে খেতেই সুমিত জিগ্যেস করল,'চিত্রাঙ্গদার দ্বিতীয় পর্বেই সমস্যা। তার সঙ্গে তো এটা মিলছে না...'

'এক্ষেত্রে রাগটা জটিল বাঁক নিয়েছে - কন্ট্রোল, লোককে ডমিনেট করা, চাতুর্য দিয়ে বশ করা... প্রবল মানসিক জোর দিয়ে শারীরিক সৌন্দর্যের ওপর দখল নেওয়া, রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টাকেই নৃত্যনাট্যে তুলে ধরেছিলেন। প্র্যাকটিক্যাল না হলেও সাইকিটা স্পষ্ট। লাইনগুলো ভাব একবার,'সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে/ সহায়

হতে/ পাবে তুমি চিনিতে মোরে...’ এটাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নিজের জোরে অন্যকে দখল করে অহংবোধকে তৃপ্ত করার আকাঙ্ক্ষা। অন্যকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা। এটাই পরিণতি, যা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে নেই।’

‘এমনকি সিরিয়াল কিলিঙের ক্ষেত্রেও, দরকার হলে...’

‘নিজের অহংবোধকে তৃপ্ত করার জন্যে এ তো সামান্য ব্যাপার। নিজেকে প্রমাণ করাটাই আসল কথা। তবে যদি ও অপরাধীও হয় তাহলেও কি তুই প্রমাণ করতে পারবি?’

সুমিত চুপ। ওরা চুপচাপ খাওয়া শেষ করল। খানিক বাদে কফির কাপে চুমুক দিয়ে সুমিত বলল,‘ না।’

‘সেটাই ওর বুদ্ধির ওপর জয়। বলে বলে দেখিয়ে দিচ্ছে সে-ই আজকের গর্বিত রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা।’

***

দিন কয়েক বাদে চৌবের ফোন এল,‘খুন। সোহিনীকে খুনই করা হয়েছে।’

‘কী? কে করল?’ সুমিত হকচকিয়ে গিয়েছিল।

‘অটপ্সি রিপোর্ট বলছে। সিঁদুর বা মার্কারি সালফাইড পয়জনিং হয়েছিল। সিসের হদিশও পেয়েছে ওর শরীরে।’

‘এর মানেই খুন এরকম বলা যায় কি?’

‘কেউ কি সাধ করে সিসে বা পারা খায়?’

বিকাশ ভুল বলছে না। কোনো মহিলা বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় করতে করতে গান শুনতে যাবার আগে খামোকা সিসে খেয়ে মরতে যাবে কেন? গন্ডগোলের সম্ভাবনা যথেষ্টই থেকে যাচ্ছে।

‘সকালে ওর বাড়িতে কেউ এসেছিল কিনা খবর নিলেন ?’

‘শ্রেষ্ঠা। আমি যখন সকালে ফোন করি তখন ও শ্রেষ্ঠাকে কাগজওয়ালা ছেলেটাকে কী যেন বলতে বলছিল শুনেছিলাম।’

এখানেও আবার সেই শ্রেষ্ঠা!

‘শ্রেষ্ঠা ওখানে কী করছিল?’

‘কী করে বলি? ও কিছু বলেনি। ওর বডি সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। দিন কয়েকের মামলা। গণ্ডগোলের গন্ধ পাচ্ছি। রাজ এখন শহরে, সে-ও আমার হেল্প চাইছে।’

‘সব ঝামেলা মিটুক, ওই রিপোর্টের একটা কপি দেবেন...’

‘মেলে স্ক্যানড কপিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

চৌবে ফোন ছাড়ার পর সুমিত নেট থেকে সিঁদুর বা মার্কারি সালফাইডের সম্পর্কে জেনে নিল। এটা প্রাচীন ওষুধে ব্যবহার হত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজে লাগে। বিন্দি, তিলক আর সিঁদুর হিসাবে ব্যবহার হয়ই। অনেক সময় এতে সিসেও থাকে। খেলে বা শুঁকলে প্রাণহানি হতেই পারে।

শ্রেষ্ঠার উপস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কারণ সে-ই যে আসল কলকাঠি নেড়েছে প্রমাণ করা কঠিন। আগে অটপ্সিতে আর কী মিলল সেইগুলো দেখা দরকার।

পরদিন রিপোর্টের স্ক্যানড কপি এসে গেল। সোহিনী খাওয়াদাওয়া করেছিল। তারপর সম্ভবত ঘুমোতে গেছিল বা সিরিয়াল দেখছিল - বাড়িতে স্বামী না থাকলে বা অনেক সময় থাকলেও দুপুরে বাঙালি গৃহবধূদের নিত্যকর্ম। পরে নিশ্চয় তার পরিকল্পনা ছিল বেরিয়ে আইসিসিআরে চলে যাবে অমৃতার গান শুনতে।

‘তুমি রান্নায় কী মশলা দাও?’ আয়ুষীকে ডেকে জানতে চাইল।

‘কী রাঁধার কথা বলছ?’ আয়ুষী প্রশ্ন করে।

‘রান্নায় রং আনতে কী ব্যবহার করো?’

‘কাশ্মীরি মির্চ মশলা।’

'ঘরে আছে?'

'থাকবে না কেন?' আয়ুষীর মাথায় ঢুকছিল না সুমিত আসলে ঠিক কী জানতে চায়।

'শিশিটা আনবে প্লিজ!'

আয়ুষী ১০০ গ্রামের প্ল্যাস্টিকের বটলটা এনে দিল। লাল গুঁড়ো। যদি শ্রেষ্ঠা রান্নাঘরে ঢুকে কাশ্মীরি মির্চ মশলার সঙ্গে সিঁদুর মিশিয়ে দিয়ে থাকে সোহিনী ধরতে পারবে কী করে! সেই মশলা দিয়ে যদি রান্না করা হয় তাহলে তার পেটে যথেষ্ট পরিমাণ সিঁদুর আর সিসে চলে যাবার কথা। শেষ অঙ্ক ঘনিয়ে আসার বাকি কী থাকে? মোটিভ ধরা না গেলে শ্রেষ্ঠাকে এক্ষেত্রেও পাকড়ানো অসম্ভব।

কিন্তু ও যে খুনি তা না হয় বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু প্রমাণ? পুলিস বা গল্পের গোয়েন্দা যে কেউ ঠেকে যেতে বাধ্য এখানে এসে। তার বুদ্ধিও এই কানা গলিতে আর পথ পাচ্ছে না।

জানলার কাছে উঠে গেল। বাইরে বিষণ্ণ সকাল। হাওয়া ল নেই। গুমোট। বুঝতে পারছিল ওর বুদ্ধির নাগাল পেয়ে উঠতে পারছে না। ফিবোনাচ্চি সিরিজের থিওরিটাও এই একটা জায়গায় এসে আর কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। যেভাবেই হোক একে তেরোতেই থামানো দরকার, নইলে এই মৃত্যুমিছিল চলবে একুশ পর্যন্ত।

প্যাটার্ন পাবার জন্যে ওকেই বাছা হয়েছিল। এবং সে জিতেও যাচ্ছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠাকে তো সে আগে চিনত না, আর যদি না-ই চেনে তাহলে প্রথম থেকেই তাকে বাছা হল কেন? অনঙ্গ যেভাবে চিত্রাঙ্গদাকে তুলে আনল এমনিতে তা মাথায় আসার কথা নয়। অথচ এই আধুনিক রাজেন্দ্রনন্দিনী কেবল তার অর্জুনের জন্যেই অধরা নয়, সুমিতের জন্যেও বটে।

ইনসিকিউরিটি বোধ থেকে অহঙ্কার? যদি তা-ই হয় তাহলে তো মহাকাব্য আরো মৃত্যুতে গড়াবে!

***

বৃষ্টি আসবে আসবে মনে হচ্ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। খানিক আগে শ্রেষ্ঠা ঘুম থেকে উঠেছে। ব্রেকফাস্ট বানাতে হাত লাগিয়েছিল। অমৃতার ফোন,'বাইরে ঘুরতে যাবার জন্যে দারুণ দিন!'

'দারুণ! গেলেই হয়! এই জঘন্য পরিবেশটা থেকে একটু রেহাই পাওয়া যায়...' শ্রেষ্ঠারও দম আটকে আসছিল।

'তাহলে বেরিয়ে পড়ি...' অমৃতা বলল।

'ফ্রেজারগঞ্জ?'

'বোরিং। তার থেকে চল বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের জন্মস্থান পারমাদন যাই। ইছামতীতে নৌকোয় করে বেশ ঘোরা যাবে। কাছেই ফরেস্ট বাংলোও আছে।'

'গাড়ি নিয়ে আধঘন্টার মধ্যে আসছি।'

বিশ্ববাংলা সরণী ধরে অমৃতার অল্টো ছুটে চলল। বারাসতের ট্রাফিক জট কাটিয়ে ওরা চাকদা-বনগাঁ রোড ধরল। গাড়ির স্টিরিওতে মাতান গানের সুরঃ

'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ

খেলে যায় রৌদ্র ছায়ে বর্ষা আসে বসন্ত...'

বিভূতিভূষণ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি নামে বদলে যাওয়া পারমাদন ফরেস্টের গেট দিয়ে ঢুকে ভেতরে। চারিদিকে শাল, সেগুন, দেবদারু গাছের জঙ্গল। পাখির কলকাকলিতে মুখর গোটা এলাকাটা। ওদের মন ভালো। গাড়ি দেখে একটা বাঁদর চমকে ছুটে পালাল। দুপাশে গাছের মধ্যিখান দিয়ে বনপথ। গাছে গাছে মৌমাছি চাক বেঁধে আছে। তাদের গুনগুনানি । মাথার ওপর দিয়ে টিয়াপাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। তাদের ডাক বাতাসে ভাসছে।

গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই রাস্তার পাশে বেড়ার ওদিকে হরিণের দেখা মিলল। খরগোশ, বাঁদর আর পেঁচা, কাঠঠোকরা, কালো ঝুঁটিওলা ময়না, মাছরাঙা নানা ধরনের কত পাখি! কাছেই নদী। দূরে পটে আঁকা ছবির মতো নিস্তরঙ্গ গ্রাম। জেলেরা কেউ মাছ ধরতে বেরিয়েছে, কেউ বা জাল শুকোতে নিয়ে যাচ্ছে। কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদী দেখেই অমৃতার নৌকোয় চাপার বাসনা মাথা চাড়া দিল।

'নৌকোয় চাপি।' প্রস্তাব দিল।

ওদের ডাকে ইছামতীর বুক চিরে নৌকো পাড়ে নিয়ে এল মাঝি। অমৃতার মনে পড়ে যাচ্ছে বিভূতিভূষণের লেখায় ফুটে থাকা ইছামতীর শান্ত ছবি। সেদিনের গ্রামীণ শান্ত জীবনের ছবিগুলো মনের মধ্যে অনুরণন তুলছে। মনে পড়ে যাচ্ছে মহেশগঞ্জে নিজের ছেলেবেলার কথা। একসময় ওই মহেশগঞ্জই ছিল নীল চাষিদের প্রাণকেন্দ্র। তাদের নিয়ে কত গল্পই না শুনেছে ছেলেবেলায়।

বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে নীল চাষিদের কথাও বলেছেন, এসেছে উনিশ শতকের বাংলার জাতি প্রথার কাহিনি, এসেছে কত মানুষ। সেই সঙ্গে ছায়া ফেলেছে বাংলার গাছপালা, যা আজ অনেকটাই হারিয়ে গেছে। সেই হারানো প্রকৃতির ছোঁয়া বহুদূর থেকে এই নৌকোয় বসেও মনের মধ্যে অনুভব করতে পারছিল। তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে অনুরণিত অদ্বৈত বেদান্তের অশ্রুত বাণী অন্তরে অনুভব করছিল। অবাক লাগে এই ভেবে যে, প্রকৃত প্রতিভা কী জন্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন না। রবীন্দ্রনাথের মতো বিদেশের যোগ যদি থাকত! আফশোস হয়।

নৌকো পাড়ের কাছাকাছি আসতেই অমৃতা নিচু হয়ে কচুরিপানার ফুল তুলবার চেষ্টা করল। খানিক বাদে নৌকো থেকে এসে নামল। খিদে পেয়ে গেছে বেশ। আসার পথেও রাস্তার পাশের ছোট ঝোপঝাড় থেকে হলুদ আর সাদা ফুল তুলছিল।

'এগুলো তুলছ কেন?'

'কী ভালো গন্ধ!'

ফিরে এসে গাড়ি নিয়ে চলল খাবারের খোঁজে।

'কাছে হোটেল আছে?' আশপাশের স্থানীয় লোকদের কাছে খবর নিচ্ছিল শ্রেষ্ঠা।

'হোটেল! তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে দিদি? রাস্তার ধারের কিছু দোকান আছে। ওরা যদি কিছু করে দিতে পারে!'

রাস্তার পাশের দোকানগুলো আগেই দেখেছিল অমৃতা, 'আমি ওইসব দোকানে খেতে পারব না!'

'তাহলে ফরেস্ট বাংলোয় যাই!' শ্রেষ্ঠা বলল।

গাড়ি নিয়ে সেদিকেই রওনা দিল। কেয়ারটেকার জিগ্যেস করল, 'বুকিং আছে?'

'না।'

'তাহলে তো ম্যাডাম ভেতরে ঢুকতে দিতে পারব না, দুঃখিত।'

গাড়িতে ফিরে শ্রেষ্ঠা বলল,'তাহলে ফিরেই যাই! ফেরার সময় ধাবায় কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে।'

ফেরার রাস্তায় বারাসত অব্দি তেমন সুবিধেজনক কোনো খাবার জায়গাই পেল না। যশোর রোডে সুকান্তনগরের কাছে শের-ই-পাঞ্জাবই মোটামুটি জনপ্রিয়। দহি মাটন আর বাটার নানে লাঞ্চশেষে তারা শ্রেষ্ঠার ফ্ল্যাটে ফেরৎ এল।

'কীরকম ভ্যাপসা একটা গরম?' এসির সুইচ অন করে শ্রেষ্ঠা বলল,'দাঁড়া, চট করে স্নানটা সেরে নিই।'

বলতে বলতে ও বাথরুমে ঢুকল। স্নান সেরে শর্টস আর টপ পরে ফেরৎ এল। অমৃতা কিচেনে ব্যস্ত ছিল। খানিক বাদে দু কাপ চা নিয়ে এল। চায়ে চুমুক দিয়েছে কি দেয়নি অমনি ফোনটা বাজল। উদ্বিগ্ন কথাবার্তার পর ফোন রাখল,'নিউ আলিপুরে থাকে এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে উডল্যান্ডসে ভর্তি! এখুনি যাওয়া দরকার।' কাপটা নামিয়ে প্রায় দৌড় দিল।

'টা টা।' শ্রেষ্ঠার গলা কানে ঢোকার আগেই বাইরে।

নিশ্চয় খুব সিরিয়াস ব্যাপার। নইলে...

খুব টায়ার্ড লাগছিল শ্রেষ্ঠার। একে এই ভ্যাপসা গরম তার ওপর অতখানি গাড়ি চালিয়ে যাওয়া-আসা... ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল। বিছানায় শরীরটা ঢেলে দিতে যাবে এমন সময় বেল। অমৃতা নাকি? কী হল আবার?

অমৃতা নয়, চৌবে।

'ফোন করেছিলেন?' গলায় বিরক্তি।

'না। আর্জেন্ট বলে চলেই এলাম।' ঠেলেই ভেতরে ঢুকে এল চৌবে। সোহিনীর মারা যাওয়াটা ওকে এলোমেলো করে দিয়েছে। দিন কয়েক গেছে সামলাতে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তার প্রেমিকার খুনিকে ধরবেই। ও মারা যাবার আগে শ্রেষ্ঠা সোহিনীর বাড়িতেই ছিল। সিংহানিয়ার কেসের মতো এখানে ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা নেই। বরং হাতের বাইরে যাবার আগে ও ধরবেই। এখন রীতিমতো মরিয়া, কারণ সোহিনীর মৃত্যু তার কাছে মোটেই আরো একখানা মৃত্যু-মাত্র নয়। এ হল সোহিনী। তার হৃদয়ের রানি, তার সমস্ত দেহমন নিয়ে যাকে ভালোবেসেছিল। সোহিনী তার জীবনে রাধা হয়ে এসেছিল। তার মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গীতগোবিন্দেও ইতি পড়ে গেছে। এই মুহূর্তে কোনো পুলিসি আইন কানুন অব্দি মাথায় নেই। শ্রেষ্ঠা অনেক ঝামেলা পাকিয়েছে। তার দাম চোকাতেই হবে। সোহিনী নেই -এটাই কদিন বিশ্বাস করতে পারেনি। ক্ষুধার্ত বাঘের মতো হয়ে আছে। শিকার এখন সামনে। তর সইছিল না।

'সোহিনীকে তুমিই খুন করেছ।'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক গুলির মতো শোনালো।

'না। আমি করিনি।' শ্রেষ্ঠার গলায় অদ্ভুত স্থৈর্য।

'মারা যাবার আগে ওর সঙ্গে তুমিই ছিলে।' গরগর করছিল।

'আমি তো একা ছিলাম না। সঙ্গে অমৃতাও ছিল।'

'কথা ঘুরিয়ে বাঁচবে না। বাঁচতে দেব না। ওর মৃত্যু হয়েছে পেটে সিঁদুর যাওয়ায়।'

'হতেই পারে, অভিযোগ যে করছেন কিন্তু তার প্রমাণ তো নেই।'

'শিগগিরই পেয়ে যাব। জেলে তোমাকে ঢোকাবই। পরপর এতগুলো খুন... ভাবা যায়? কুত্তি, তোকে আজ আমি...'

'ভাষার দিকে নজর দিন অফিসার। হতে পারে আপনি পুলিস, কিন্তু তা-ই বলে যা খুশি তাই বলতে বা করতে পারেন না... মনে রাখবেন একজন মহিলার বাড়িতে...'

'মহিলা? কে? তুই? মহিলা ছিল সোহিনী। তুই একটা খুনে। মাগি, তোকে আমি...'

'মাথা ঠান্ডা করুন অফিসার। নইলে আমি কিন্তু চেঁচাতে বাধ্য হব। মলেস্টেশনের চার্জ আনতে বাধ্য হব...'

বিকাশও জানে আইন এখন মেয়েদেরই হাতে। নিচু গলায় বলল, 'তাহলে বলছ তুমি সোহিনী বা অন্যদের খুন করোনি?'

'বলেছি তো, না। আর, যদি... তাহলেও প্রমাণ করতে পারবেন যে করেছি? কারো বাড়িতে আমি ছিলাম, সে খুন হল, মানে নিশ্চয় এই নয় আমিই খুনি। আপনি কি জানেন আমাদের পরেও কে বা কারা ও বাড়িতে গিয়েছিল? ডেফিনিট প্রুফ হাতে নিয়ে কথা বলুন অফিসার।' বলতে বলতে ও মোবাইল ঘাঁটতে থাকে,'আমি আমার ল ইয়ারের সঙ্গে কথা বলছি। এবার থেকে উনি না থাকলে কথা বলব না...'

এসির গুনগুন আওয়াজ কানের ওপর আছড়ে পড়ছিল।

***

রোববারের দুপুরের ঘুমটা সুমিতের খুব প্রিয়। ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে আর্মচেয়ারটা টেনে বসেছিল। সামনের গাছগুলোয় পলাশ ফুল ধরেছে। সেদিকেই উদাস চোখে তাকিয়েছিল। আশেপাশে কোনো গাছে

পাতার আড়ালে বসে একটা কাক অবিরাম ডেকে চলেছে। রোদ অনেকটাই পড়ে এসেছে। এইসব মৃত্যুর জট পাকানো ধাঁধার কথাই ভাবছিল। ফিবোনাচ্চি সিরিজের কথা মনে আসতেই মনে হল, যার অঙ্কের সঙ্গে তেমন কোনো যোগ নেই সেও কি এই ধাঁধার জট ছাড়াতে পারবে? পারার তো কথা নয়। হিসেব বলছে শ্রেষ্ঠা, নীল আর অগ্নিভর কথা। কিন্তু নীল আর অগ্নিভ দুজনের কেউই এই মৃত্যুর মিছিলের সঙ্গে কাছের থেকে সম্পর্কিত নয়। প্রমাণের কথা বললে বলতে হবে কেবল শ্রেষ্ঠার কথাই।

আচমকা মাথায় একটা নাম ভেসে এল। অনির্বাণ। অনির্বাণ বসু। তার ছাত্রদের মধ্যে সবথেকে বুদ্ধিমান। দারুণ ছেলে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক থেকে সব পরীক্ষায় ফাটাফাটি রেজাল্ট। অনির্বাণের তার আন্ডারে পিএইচডি করার কথা ছিল।

স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কলকাতায় আই ইন্টারন্যাশানাল ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ওপেন করেছিল। সেখানে বিভিন্ন দেশের বক্তারা তাঁদের রিসার্চ নিয়ে বলতে এসেছিলেন।

অনির্বাণ তখন ফ্রেশার। থিসিস জমা দেবার তোড়জোড় করছে। দেশি-বিদেশি অভ্যাগতদের সামনে বলেছিল,'আমি যদি ফিবোনাচ্চি সংখ্যা নিয়ে আমার রিসার্চ প্রেজেন্ট করি এই ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। এর ফরম্যাটই বদলে যাবে। আমরা জানি ফিবোনাচ্চি সিরিজের বুৎপত্তি হয়েছিল এই ভারতেই, বেদাঙ্গ শাস্ত্রের বিশেষ সংস্কৃত ছন্দের ধারণার মধ্য থেকে। শতপথ ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়। পরে ঋগ্বেদের শ্লোকে বিবর্তিত হয়। এই সব আর এর জনক পিঙ্গলা সবই খ্রিস্টে পূর্বে।'

'অনির্বাণ, অতীত নিয়ে কথা বলার জায়গা এটা নয়। এখানে জড়ো হয়েছি ভবিষ্যতের অগ্রগতির পথ খুঁজতে, ইতিহাস আলোচনা করতে নয়। এ নিয়ে আর কথা না হওয়াই ভালো।' সুমিত সেদিন বেশিই রূঢ়তা দেখিয়ে ফেলেছিল।

তার আপত্তিকে পাত্তা না দিয়ে অনির্বাণ বলে চলে, 'এর এক শতক বাদে পিসার লেওনার্দো তাঁর বই **'লিবের আবাচি'**-তে এঁদের উল্লেখ রেখেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। আমরা ভারতীয়রাই পথ দেখিয়েছি। আমরাই পারব তাকে বৃহত্তর মাত্রায় নিয়ে যেতে।' গলায় অহংকার ঝরে পড়ছিল।

সুমিতের বিশ্রি লেগেছিল ইতালির মানুষ ফিবোনাচ্চিকে অনির্বাণের এরকম বিশ্বের নানা দেশের মানুষদের সামনে অশ্রদ্ধা দেখানোয়। সে নিজেও স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হয়ে বিশ্বে স্বীকৃতি খুঁজছে। এরকম কোনো পদক্ষেপ তার নিজের পোজিশনের পক্ষেও মারাত্মক হতেই পারে। তার মাথার মধ্যে কলোনিয়াল মানসিকতা কাজ করে চলেছে।

হকচকিয়ে গেলেও সামাল দেবার চেষ্টা করেছিল,'বরং পরে এই নিয়ে আলোচনা করব।'

'আমার ভাবনা-চিন্তা তুলে ধরতে দেওয়া হোক।' অনির্বাণ একেবারে একবগগা।

'তুমি সবে ডক্টরেটের জন্যে এনরোল করিয়েছ, এখনো কোনো পেপার নেই, এখানে সবাই যে যার ক্ষেত্রে যথেষ্টই যশস্বী। তাঁরা তাঁদের প্রকাশিত পেপার নিয়ে আলোচনা করবেন। এটা তোমার ব্যক্তিগত মত প্রকাশের জায়গা নয়।'

'তবু স্যার, আমার কথাগুলো যদি বলতে পারি তাহলে হয়ত...' অনির্বাণ মানতে পারছে না। ইচ্ছে এই মুহূর্তেই নিজের কথা সবার সামনে বলে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

সুমিত সহ্য করতে পারেনি। এখানে তার কথাই শেষ। এই জায়গায় কালকের ছেলে কী করে তাকে অমান্য করে? সে যে তারই ছাত্র এটা আর মাথায় রাখতে পারেনি। বলে উঠেছিল, 'নাউ নাউ, অনেক হয়েছে, কথা শেষ হোক। ফিবোনাচ্চি নিয়ে কথা বলার জায়গা এটা নয়। অতীত নিয়ে বকে শ্রোতাদের মূল্যবান সময় নষ্ট কোরো না। অনেক কিছু আলোচনা অপেক্ষা করছে।' যথেষ্ট বিরক্তির সঙ্গেই মুখভঙ্গি করেছিল।

পরে অনির্বাণ আর ইন্সটিটিউটের পথ মাড়ায়নি। এক হপ্তা বাদে শুনেছিল অনির্বাণ আত্মহত্যা করেছে। অনির্বাণের অধ্যায় শেষ হলেও ফিবোনাচ্চি কিন্তু তার পিছু ছাড়েনি। বরং তাকে টেনে এনে ফেলেছে এই

মৃত্যুর মিছিলের মধ্যিখানে। এই সবের মধ্যে কোনো যোগ নেই তো? মনে পড়ে গেল অনঙ্গ বলছিল আশপাশের ব্যক্তিদের অতীত খুঁজে দেখতে, কারণ ওর মতে, এলোমেলো অতীতের জন্যে ভেতরে ভেতরে জমে থাকা রাগ প্রতিশোধ স্পৃহাকে জাগিয়ে দিতেই পারে । সে অগ্নিভকে জড়িয়ে শ্রেষ্ঠার অতীতে ঢুঁ মারতে খুবই চেষ্টা করছে। এমন কি হতে পারে না যে, তার সঙ্গে অনির্বাণের যোগ ছিল, যা আজ লুপ্তপ্রায়!

সব থেকে ভালো অগ্নিভর কাছ থেকে যাচিয়ে নেওয়া। অগ্নিভ অনির্বাণের জুনিয়ারই ছিল। হতেই পারে কোনো ত্রিকোণ প্রেমের গল্প হয়ত ছিল! হতে কি পারে না?

‘অনির্বাণকে মনে আছে?’ অগ্নিভকে ফোনে ধরল।

‘অনির্বাণ... ও হ্যাঁ, ওই তো যে ছেলেটি স্যুইসাইড করেছিল সে?’ অগ্নিভর মনে পড়ে গেল।

‘হ্যাঁ। স্যুইসাইড কেন করেছিল? যদ্দুর মনে আছে ডাক্তারেরা বলেছিল ডিপ্রেশন...’

‘তা-ই! যদিও আরেকটা গল্প ছিল। অনির্বাণ নাকি লুকিয়ে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। মেয়াটি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ায় ওরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে। যদ্দুর জানি ও মারা যাবার পর মেয়েটি অ্যাবোর্শন করিয়ে নেওয়ার কারণে মেন্টাল ব্রেকডাউনের শিকার হয়...’

‘মেয়েটির নাম... কে বলতে পারো মেয়েটি?’

‘ওর নাম...’ এই অব্দি বলেছে কি বলেনি এমন সময় ফোনে শোনা গেল পাশ থেকে কারো গলা ‘শ্রেষ্ঠা আমরির আইসিইউতে ভর্তি হয়েছে। কোমায় আছে। নার্স ডাকছে। সিঙ্ক করছে বলল...’ ফোনটা কেটে গেল। সুমিত হতভম্ব। নামটাও জানতে পারল না।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় বসেছিল সুমিত। সন্ধে নামছে। কাকেরা ডাকতে ডাকতে বাসায় ফিরছিল। গোধূলির অন্ধকার সুমিতকে ঘিরে আসছে । শ্রেষ্ঠার আবার কী হল? আইসিইউতে কেন? অনেক কিছু ভাবছিল। শ্রেষ্ঠা সেরে না উঠলে অনেক কিছুই জানা যাবে না। অগ্নিভ স্বভাবতই এই নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

অগ্নিভ ইচ্ছে করে কিছু আড়াল করছে কি? ধরা পড়ে শ্রেষ্ঠাও কি অনির্বাণের মতো আত্মহত্যা করার চেষ্টা করল?

প্রশ্ন তো অনেক, উত্তর কে দেবে?

***

অগ্নিভর কাছ থেকে এক হপ্তা কোনো খবর নেই। শ্রেষ্ঠার কি হল না জেনে সুমিতও ফোন করতে পারছিল না। এই ফিবোনাচ্চি সিরিজের ধাক্কায় সে এখন রীতিমতো এলোমেলো। সুমিতকে বিমর্ষ দেখে আয়ুষীও চাঙ্গা করতে চাইল, ‘তোমার মনে হচ্ছে একটা ব্রেক লাগবে। সিকিম বেড়ানোটা সেরে নিলে কেমন হয়? অবশ্য ওই মেয়েটিকে ডাকলে গানও শোনা যেত। দারুণ ক্ল্যাসিক্যাল গায় বলছিলে? অন্যরকম অন্তত হয়!’

‘অমৃতার কথা বলছ?’

‘নাম জানি না। তুমিই বলছিলে। ডাকো না ওকে ডিনারে। দারুণ ব্যবস্থা করব। ও কি চার্জ করবে?’

‘বোধহয় না। অ্যামেচার তো! প্রফেশনাল মনে হয়নি...’

ডাক পেয়ে অমৃতাও খুশিই হল। শ্রেষ্ঠার মৃত্যুর পর কেবল সুধা বাদে তার আর কোনো বন্ধু নেই। সুধাও নিজের ছবি নিয়ে ব্যস্ত। আগের মতো হুটহাট বেরোতে পারে না। ফলে... ডাক পেয়েই রাজি হয়ে গেল।

শনিবার বিকেলে গাড়ি নিয়ে সল্ট লেকে চলে এল। লালপাড় সাদা ঢাকাই শাড়ি, বড় বিন্দির টিপে শ্যামলা মেয়েটিকে দারুণ লাগছে। সুমিতের বাড়ির পরিবেশ অমৃতারও দিব্যি লাগল। সাধারণ, কিন্তু সাজানো গোছানো ছিমছাম মাসমাইনের লোকের বাড়ি।

‘ভালো লাগল এলেন...’ আয়ুষী লাউঞ্জে এনে বসাল।

‘যেখানে কেউ গান ভালোবাসে সেখানে ডাক পেলে আমারও ভালো লাগে।’ অমৃতা হাসছিল।

হাসলে শ্যামলা মেয়েটিকে সুন্দর লাগে। সুমিতেরও ঘোর লেগে গিয়েছিল। আয়ুষী ঠিকই বলছিল। এরকম একটা গানের অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক একঘেয়েমি কেটে যায়।

স্ন্যাক্স আর চায়ের পর গান গাইতে বসল অমৃতা। ডিভানে বসে আলাপ শুরু করে গানের মধ্যে ডুবে গেল। রাগ ললিত ধরল। আজ বুঝি মেয়েটি গানে সবটুকু ঢেলে দিচ্ছে। যেন হৃদয়ে দীপাবলির অলৌকিক সুরে আলোয় মেশা মূর্ছনা শান্তির পরিবেশকে আরও মধুময় করে তুলেছে। ললিত গৌরী আলাপ থেকে ঝালায় রাগ ইমন ছুঁয়ে মিশে গেল পুরীয়া সুধাকল্যাণের দিকে। সুরের মধ্যে বুঁদ হয়েছিল সবাই।

মধ্যিখানে আচমকাই সুমিতের ফোন বেজে উঠল। কলটা দেখেই চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। অগ্নিভ। ফোন সেরে যখন ফিরে এল অমৃতা তখন ভূপনাথ হয়ে শাওনী কল্যাণে গড়িয়ে গেছে। সুরের লহরীতে ভেসে যাচ্ছিল।

ডিনারের পর আয়ুষী ডিশ গোছাচ্ছিল। সুমিত আর অমৃতা ড্রাম্বুই নিয়ে সোফায় এসে বসল,‘তুমি ... অনির্বাণের স্ত্রী?’

‘হ্যাঁ...’ একটু কি থামল মেয়েটা?

‘মৃত্যুগুলো কী প্রতিশোধ?’

‘ফিবোনাচ্চি সংখ্যা যে অসাধ্য সাধন করতে পারে এখন নিশ্চয় বুঝেছেন?’ ঠান্ডা গলায় বলল অমৃতা।

সুমিত চুপ। অনির্বাণের স্ত্রী জবাব দিয়েছে ১৩টি খুনের মাধ্যমে। সে ব্যর্থতা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছিল।

‘অনির্বাণ সকলের থেকে ভালো ছিল। আপনি কেবল একজন ভবিষ্যৎ প্রতিভাকেই হত্যা করেননি, সেই সঙ্গে আমারও সর্বনাশ করেছেন। আপনার অহঙ্কার আমাদের স্বপ্ন, আমাদের ভালোবাসাকেও শেষ করে দিয়েছে। আমাদের জন্ম নিতে চলা সন্তানকে দিনের আলো দেখতে দেননি। সবকিছুই শেষ করে দিয়েছেন। আমায় এমন এক শূন্যতা উপহার দিয়েছেন, যা কখনো ভরাট হবার নয়।’

‘আমারই বোঝা উচিত ছিল। তুমি বলেছিলে,**পুলিস এটাকে পাত্তা দেবে না কারণ শৌখিন ফন্টে কোনো টেক্সট এলে তাদের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। ধরেই নেবে বাচ্চারা নিশ্চয় মজা করছে**। এটা প্রথম ভুল। কী করে বুঝলে শৌখিন ফন্টে কোনো টেক্সট পেয়েছি? তার মানে তুমি নিজেই ওগুলো পাঠিয়েছ। ভাবিইনি তোমার পক্ষে আমার ফোনে পৌঁছনো সম্ভব।’

অমৃতা চুপ।

‘শ্রেষ্ঠার হারমোনিয়ামের ভাঙা রিড থেকেই আমি ঠিক পথে আসি - ক্লু পেয়ে যাই ফিবোনাচ্চির। এবং ধরতে পারি, যে এসব করছে সে মিউজিকের সঙ্গে জড়িত।’

‘অন্যের বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। আমিই যদি আপনার মতো বুদ্ধিমানকে শুদ্ধু সব্বাইকে ঘোল খাওয়াতে পারি তাহলে বুঝতে পারছেন অনির্বাণকে দিয়ে কী করানো যেত? সে ইতিহাসকে নতুন করে লিখত। স্রেফ আপনার জন্যে সব বৃথা গেল!’

‘ভুলকে শুধরোনো যায়! কিন্তু মৃত্যুকে তো মোছা যায় না...’

‘ঠিক। আমার অনির্বাণকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন? বলুন... অন্য অনেকে আছে ঠিক কথা। কিন্তু তারা সবাই তো সাধারণ। সে ছিল জন্মগত প্রতিভা! আপনি কেবল তাকে শেষই করে দেননি, সঙ্গে আমাদের অনাগত সন্তানকেও মুছে দিয়েছেন, যে বিশ্বে বিপ্লব ঘটিয়ে নতুন শতাব্দী রচনা করতে পারত। আপনিই অপরাধী। ওদের মৃত্যুর জন্যেই কেবল নয়, মানব সভ্যতা, বিশ্বকে নতুন প্রতিভা থেকে আপনি বঞ্চিত করেছেন। একজন প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছেন।’

‘বলতে পারো নিশ্চয়; কিন্তু আইনের চোখে অপরাধী আমি নই, তুমি।’

‘সেটা আপনার কাছে। যদি না বলে দিতাম আপনি কি অপরাধ প্রমাণ করতে পারতেন?’

'আমি তো আমার হার মেনে নিয়েছি। এবার বলো...' সুমিত ড্রাম্বুইতে চুমুক দিল।

আয়ুষী জিনিসপত্র ধোয়াধুয়ি সেরে এক প্লেট রসগোল্লা নিয়ে এল,'নিউ টাউনের মিষ্টি হাবের রসগোল্লা, না বলতে পারবেন না কিন্তু...'

অমৃতা দুটি তুলে নিল,'বাঙালিদের মুখে কখনো মিষ্টিতে না শুনবেন না। আর রসগোল্লা... কী যে ভালো লাগে!' তারপর সুমিতের দিকে তাকিয়ে বলে চলল,'ক্যালক্যাটা ক্লাবে দেখা হবার পর প্রিয়াঙ্কা লিফট চেয়েছিল। ফেরার রাস্তায় যোগেশকে নিয়ে দুঃখের কথা বলছিল। অন্য মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা। তার মধ্যে সেক্রেটারি অর্চনাও আছে। হতাশা মানুষকে মরিয়া করে তোলে! নিজেও সেইখান থেকেই একজন প্রেমিক জুটিয়েছিল, বড়বাজারের কাপড়ের ব্যবসায়ী আমিশ শাহ। যোগেশ বাইরে গেলেই আসত। বাঁচার আর কোনো পথ পায়নি। এর তো মানে নেই যে, সবাই আমার মতোই কষ্টে জীবন কাটাবে। কেনই বা?'

এটাই কি বর্ডারলাইন পার্সোন্যালিটি ডিজঅর্ডার? হবে নিশ্চয়। অমৃতার মতো শান্ত মেয়েও স্বাভাবিক মানসিকতা থেকে অন্যত্র। ওরা দুজনেই দারুণ আই কিউয়ের অধিকারী, তবে অনঙ্গর থিওরি এখন মিলে যাচ্ছিল এই মেয়েটির সঙ্গেই, শ্রেষ্ঠা নয়।

'ওর একমাত্র চিন্তা ছিল ও আমিশের থেকে বয়েসে বড়। যতই শারীরিক সম্পর্ক হোক এটাই ওদের মিলনের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করছিল। এই জন্যেই বি বনিতে গিয়ে ও হেয়ার ডাই করিয়েছিল যাতে ওর সঙ্গে মানিয়ে যেতে পারে। আসলে দরকার ছিল লং টার্ম সলিউশন। এর জন্যেই কেশকালা দরকার হয়েছিল। ওকে বলি কেশকালা সুপারভ্যাসমল ৩৩ খেলে দীর্ঘকাল কাজ হবে। জানতাম যোগেশ ব্যাঙ্গালোরে। নিশ্চিত হয়ে যাই ও বাড়িতে একা। সাত থেকে আট গ্রাম খাওয়াই যথেষ্ট। ঠিক সময়ে মেডিক্যাল হেল্প না পেলে বাঁচা কঠিন।'

'এত সহজে ওকে খেতে বাধ্য করা গেল?'

'মানসিকভাবে ও যে অবস্থায় ছিল তাতে তখন যে কেউ যা বলবে তা-ই করতে দ্বিধা করত না। বাকিটা ইতিহাস।'

'একটা ছেলের গলা আমায় খবরটা দিয়েছিল...'

'আজকের দিনে এটা কোনো ব্যাপার? মার্কেট থেকে ভয়েস চেঞ্জার কিনে অনায়াসেই করা যায়...'অমৃতা শান্ত।

আয়ুষী এই প্রথম কোনো নির্বিকার খুনেকে চোখের সামনে দেখছে। তার গা শিরশির করছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাচ্ছিল।

'আমিশ শাহ?'

'প্রিয়াঙ্কা তো গেল। ও একা বেঁচে থেকে করবে কী! ইহজীবন বলুন আর পরজীবনই বলুন, ওদের মিলন তো দরকার। ওকেও সাধনোচিত ধামে প্রিয়াঙ্কার পেছন পেছন পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো। রান্নাবাড়া করত না, জৈন শুদ্ধ ভোজনালয় থেকে একজন তার ব্রেকফাস্ট আনত। তার কাছ থেকেই জানতে পারি, সে ডিনার করে গিরনার রেস্তোরাঁয়। যেহেতু আমায় চিনত, ওর ওপর নজর রাখা কোনো ব্যাপারই নয়। কদিন বাদে বুঝলাম, ওখানে ও রোজই যায়। হোটেলের মশলাদার খাবারে ওর রুচি ছিল না। ওর খাবার আলাদা করে রাঁধত হোটেলের বিকেলের রাঁধুনি। ব্যাসিলাস সেরেয়াসের গুটি জিনিসটা তাপ প্রতিরোধী। যেটা দরকার ছিল তা হল চুপচাপ ডাইনিং রুমের ফ্রিজের পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করা। বিকেলের দিকে রেস্তোরাঁয় সাধারণত কাজের লোক কম। সন্ধের রাশ শুরুর আগে সকলেই চেষ্টা করত ব্রেক নিয়ে নিতে। এই সময়টায় কাজ সেরে বেরিয়ে যেতে পারলে কারো নজরে পড়ার সম্ভাবনা কমই ছিল। গুটিগুলো চারটে ঘন্টা পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ থাকলেই গরম পেয়ে বেড়ে যাবে! বিপুল পরিমাণে ব্যাসিলাস সেরেয়াস শুদ্ধু ডিনার। ফল কী হতে পারে সামান্য ডাক্তারি জ্ঞান থাকলেই আন্দাজ করা যায়...'

'স্মার্ট স্টেপ। মাইক্রোবায়োলজি সাবজেক্টটা ভালো জানো!'

‘আপনি কেবল স্ট্যাটিস্টিক্সই জানেন এটাই প্রবলেম। অনির্বাণ অনেক সাবজেক্টই জানত। আপনাদের ফিল্ডের যে কারোর থেকে বেশি জানত। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় আমিও প্রভাবিত।’

‘অচিরা?’

‘সিম্পল। আপনার বাড়িতে ডিনারে আসার কদিন আগেই ওর জন্মদিন ছিল। জানতেনও না। এতটাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, চারদিকে কোথায় কী হচ্ছে দেখার সময়ই নেই...’ বলতে বলতে একবার আয়ুষীকে দেখে নিল,‘ম্যামকে নিয়ে আপনি কতবার ছুটিতে বেরিয়েছেন? অগ্নিভ ওর অনারে ছোট একটা পার্টি দ্যায়, সেখানে নিজের চেনা কয়েকজন স্ট্যাটিস্টিক্সের লোককেও ডেকেছিল। অচিরাও ছিল। আমিও অনির্বাণের বউ হিসেবে ইনভাইটেড ছিলাম। তখনই ওকে অ্যাক্সের একটা বটল গিফট দিই, যাতে বুটেন ছিল। চান্স নিয়েছিলাম ও যদি কোনো দিন ব্যবহার করে। ও খুব নেমন্তন্নে বেরোত না, কিন্তু জানতাম এখানে আসবে। তাই আপনার এখানে আসার সময়েই...’

‘রোনাল্ডোর ইলেক্ট্রোকিউশন?’

‘সিম্পল। রোনাল্ডোই কেবল ওই ফেস্টে নিজের মিউজিক্যাল গিয়ার নিয়ে পারফর্ম করছিল। অন্যরা যখন পারফর্ম করছে তখন ওর জিনিসপত্র গ্রিনরুমে পড়েছিল। শাড়ির নিচে প্লাগটাকে নিয়ে স্ক্রু খুলে আর্থের সঙ্গে লাইভ কন্ট্যাক্ট করে দেওয়া তো ছেলেখেলা। গ্রিনরুমে রেখে বেরিয়ে আসতে খুব বুদ্ধি লাগে কি?’

‘অর্চনা ভানিয়া?’

‘ওটা ফ্লুকই বলতে পারেন। আপনার নাম্বার হ্যাক করে ফেক আইডেন্টিটি থেকে ওকে বলি যে যোগেশের আমার সঙ্গে অ্যাফেয়ার আছে। এতেই ও এলোমেলো হয়ে যায়। সাধারণত লোকে যখন অন্যমনস্ক থাকে তখন ভুলগুলো নিজেই করে। ও নিজেও তা-ই করেছিল। হারপিকের সঙ্গে ক্লোরোক্স মিশিয়ে ফেলল...’

‘সিমপ্লি অ্যাক্সিডেন্ট?’

‘তা-ই। আমার সিকোয়েন্সে মিলে গেল। ওর ফোন আমার এমস্পাই দিয়ে আগেই হ্যাক করে রাখা ছিল। কেবল ক্যামেরায় ওর মারা যাওয়াটা নিশ্চিত করে নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দিই...’ অমৃতা বলছিল।

‘সবসময় তো ফ্লুকে গেমপ্ল্যানের সঙ্গে বাস্তবকে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। তোমার ক্ষেত্রে ভাগ্যও অনেকটা সহায়তা করেছে।’

‘হ্যাঁ। এই কেসটার ক্ষেত্রে। এইটা আন্দাজ করতে বুদ্ধি লাগে। আপনারা কেবল চেয়ার আর ক্রেডিটের পেছনেই দৌড়োন! অনির্বাণ বুদ্ধি ধরত। ও যদি আজ বেঁচে থাকত তাহলে ও কতদূর যেতে পারত আন্দাজ করতে পারেন? কেবল খ্যাতির পেছনে দৌড়তে গিয়ে এই বুদ্ধিমান মানুষটাকেই আপনি...’

‘ঈশিতা যখন মারা যায় আমি ওখানে...’ সুমিত ঈশিতার কেসটার ব্যাখ্যা খুঁজছিল।

‘পাঁচ মাথার মোড় থেকে ও বেনারসি পান কিনেছিল এটা জানেন। কিন্তু সেটা তখনই খায়নি। খেয়েছিল ডিনারের পর। আমার এক বন্ধু ওই প্রেমিসেসেই থাকে, মনোজিতের আত্মীয়। আমি ছিলাম ওরই কাছে। যখন স্নানে গেছে তখন একবার ঢুকে পানটা বদলে গলথেরিয়া অয়েল দেওয়া পান রেখে আসা খুব অসুবিধের কাজ কি?’

‘আর সরসিজ? যে কীটনাশক বেচত...’

‘মণিদীপা সেদিনই সরসিজের সঙ্গে দেখা করেছিল। সে আমার বন্ধু। সেদিন আগেই বালি হাইটসে কেক বানাবার সময়ে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।’

‘শুনলাম ওর সঙ্গে আইনি লড়াই লড়ে যাচ্ছিল? তাহলে কেক...’ সুমিত অবাক হল। মাথায় ঢুকছিল না যার সঙ্গে মহিলার লাঠালাঠি চলছে তার জন্যে সে আবার কেক বানাতে যাবে কেন! হিসেব মিলছিল না।

‘ভাইয়ের মন জয় করার চেষ্টায় ছিল, যাতে ভাই ওকে ওর কোনো আইনি ঝামেলায় না গিয়ে নিজের অংশটা লিখে দেয়। চট করে কেকের সঙ্গে সেলফোস দিয়ে কারিকুরি করে দেওয়া কি খুব কঠিন...’

‘রাবেয়া, ওই টলি অভিনেত্রী?’

‘এইটাই একটু ঝামেলার কাজ ছিল। বড়ুয়া, মানে ওর মেকআপ ম্যানকে আগে থেকেই চিনতাম। ও দূরদর্শনে পার্ট টাইম কাজ করত। আমি ওখানে যখন প্রোগ্রাম করেছি তখন অনেকবার আমার মেকআপ করেছে। একবার ক্যাজুয়ালি কথা বলতে বলতে বলে ফেলেছিল, রাবেয়া শ্যুটের সময়ে নিজের মেক আপ কিট নিয়ে ফাইন্যাল টাচ দিয়ে নেয়। কিছু বিউটি প্রোডাক্ট এমনিতেই টক্সিক হয়। এমনিতে ওগুলোয় কিছু হবার কথা নয়, কিন্তু বাড়তি টক্সিক হয়ে গেলে বিপজ্জনক হয়ে যায়। রাবেয়াকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না। মাঝেমধ্যে এনটি ওয়ানে যেতাম বড়ুয়ারই খোঁজে। মুখ চেনা হতে চাইতাম, যাতে দরকারে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের কাজ মেলে। সেদিন যখন যাই দেখতে পাই রাবেয়া এনটি ওয়ান থেকে বেরোচ্ছে। সম্ভবত বাইরে কারো সঙ্গে দেখা করতে। বাইরে রাখা ওর গাড়িটাই ওর উপস্থিতি জানিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট ছিল। ও নেই দেখে চট করে ওর মেক আপ রুমে ঢুকে দেখি তাড়াহুড়োয় ও নিজের হ্যান্ডব্যাগটা টেবলেই রেখে চলে গেছে। এরপর ওর মেক আপ কিটে হাত সাফাই ক’মিনিটের মামলা?’

‘তোমার ভাগ্য তোমাকে সব সময়ই সাহায্য করেছে এটা মানতেই হবে...’ সুমিত বুঝতে পারছিল নিয়তি কীভাবে হাতের পুতুল করে মানুষকে টেনে নিয়ে বেড়ায়।

‘বল যখন আপনার কোর্টে তখন কীভাবে খেলবেন সেটাও আপনারই ব্যাপার। একবার আপনি আপনার খেল দেখিয়েছেন। এবার আমার পালা। প্রত্যেকেরই দিন আসে, কেবল অপেক্ষায় থাকতে হয়...’

সুমিত বুঝতে পারছিল এই ফিবোনাচ্চি সিরিজ সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে ফাই পয়েন্ট (৬১.৮%)টা ছিল অষ্টম জন অর্থাৎ রাবেয়া।

‘নিউ রয়্যাল হোটেলে পাল চৌধুরী?’ সুমিতের মনে পড়ল।

‘আমার আত্মীয়। ওর জন্যে আমিই টিওভা কিনে আনতাম। সোডিয়াম সায়ানাইড এলডি৫০ দিয়ে ঘোল খাওয়াতে অসুবিধের প্রশ্নই নেই। শ্রেষ্ঠার বাড়িতে রিসিটটা ফেলে এসেছিলাম যাতে মাথা গুলিয়ে যায়। আইরিনের ব্যাপারটা করে রাখা হয়েছিল সিংহানিয়ার যাবার দিন কয়েক আগেই। ১০ গ্রাম মতো ক্যাফিনই যথেষ্ট ছিল। নেসকাফের সঙ্গে একদম পিওর ক্যাফিন পাউডার ন্যুট্রিজা ক্যাফিন ব্লেন্ড করে ওকে প্রেজেন্ট করেছিলাম। সিংহানিয়া ওটা খেলে ওকেও আইরিনের পেছন ধরতে হত।’

‘সিংহানিয়াও মারা গেছে, যদিও পরে...’

‘খুব সিম্পল। আমি আর শ্রেষ্ঠা অ্যাপোলোতে আপনাকে দেখতে গেছিলাম। সিংহানিয়াও পেস মেকারে রুটিন চেঞ্জ করতে গেছিল। টয়লেটে যাব বলে বেরিয়ে গেছিলাম। ক্যাথ ল্যাব আপনার ৩৫৭ নম্বরের ঠিক দুটো ফ্লোর নীচে ডান দিকে। তার সামনে যাই। আগেই মেডট্রনিক পেসমেকার অ্যানালাইজারটা হ্যাক করে রেখেছিলাম। শুধু দরকার ছিল আমার মোবাইলের ওয়াই ফাই থেকে ওটা বেহাল করে দেওয়া। ৩০০ মিটার মতো কাছে থেকে অনায়াসেই সম্ভব হয়েছিল।’

‘তুমি তাহলে মোবাইল হ্যাকিং-এও এক্সপার্ট?’

‘নেট থেকে সব হয়। কেবল নো-হাউটা জানার অপেক্ষা... জরুরি জিনিস ডিকোড করতে পারলেই কেল্লা ফতে---’

‘সোহিনী?’

‘সোহিনীরটা কোনো ব্যাপার হল? ও রাঁধছিল। তখনই আমি আর শ্রেষ্ঠা আইসিসিআরে আমার অনুষ্ঠানের নেমন্তন্ন করতে যাই। শ্রেষ্ঠা যখন কাগজওয়ালা ছেলেটার সঙ্গে কথা বলছে তখন সোহিনী লাউঞ্জে ফোন করছিল। এর মধ্যে সোহিনীর কাশ্মীরি মির্চ মশালার শিশিতে সিঁদুর মিশিয়ে দিলাম।’

‘এতে তো বারো জন হল। তুমি কি শ্রেষ্ঠাকেও মেরেছ?’

‘সিরিজের তেরো জনকে হিসেবে আনতে হবে তো...’ ও হাসছিল। চুপচাপ দুটো রসগোল্লা তুলে নিয়ে আয়ুষীর দিকে তাকাল, ‘দারুণ...’

অন্য সময় হলে আয়ুষীও হেসে যোগ দিত। পুরো রসগোল্লাগুলোই ওর হাতে তুলে দিত। কিন্তু ওর স্বীকারোক্তির ধাক্কায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। যখন খাচ্ছে সুমিত শ্রেষ্ঠার মৃত্যুর ঘটনায় এল,‘কীভাবে ওটা ঘটালে?’

‘এইটা আপনাকেই বার করতে হবে মিঃ জ্ঞানবৃদ্ধ গোয়েন্দামশাই। ধরেই নিয়েছিলেন অনির্বাণের চেয়ে আপনি অনেক বড়, অনেক বেশি বুদ্ধিমান! আমাকেই টক্কর দিতে পারছেন না তো অনির্বাণ! ও আপনার থেকে অনেক অনেক বেশি বুদ্ধি ধরত। অথচ আপনার অহংকারই ওকে বাঁচতে দেয়নি।’ শেষদিকে ওর গলাটা হিসহিস করে উঠল।

‘তোমার ব্যাখ্যা। প্রমাণ করতে পারবে না...’ সুমিত কিছু বলতে যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গের হাসিতে ফেটে পড়ল অমৃতা,‘যা যা বললাম তার একটাও প্রমাণ করতে পারবেন?’

সুমিত চুপ। বুঝতে পারছিল হাতে কোনো প্রমাণই নেই। যদি এই মেয়েটি নিজে না বলে দিত সে কোনো কালেও এগুলো প্রমাণ দূরের কথা, বার করতেই পারত না। ওর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আইনের চোখে সেসব প্রমাণ করা অসম্ভব।

অনেকক্ষণ থেমে থেকে বলল,‘না। পারব না...’

‘জীবন যেমন গড়াচ্ছিল তেমনই গড়াক... ধরেই নিই কিছুই হয়নি...’

অমৃতা অনেক দেরিতে গেল। খুব ক্লান্ত লাগছিল। আয়ুষী সুমিতকে ছেড়ে শুতে গেছে। তখনও সে কেবল ভেবেই চলেছে।

হুইস্কি হাতে বারান্দায় এসে বসল। রাতের তারাভরা আকাশের দিকে ভারাক্রান্ত তাকিয়ে। মোবাইলটা চালাল। ভয়েস রেকর্ডারে অমৃতার গলা। বারবার শুনছিল... আবার... বারবার... দোটানায় বিষণ্ণ বেদনা। আইন মানতে বাধ্য নাগরিকের কর্তব্য মেনে সে এটা পুলিসের হাতে তুলে দিতেই পারে। এই স্বীকারোক্তিই মেয়েটাকে ফাঁসিতে লটকাবার পক্ষে যথেষ্ট। কেবল কি এই মৃত্যুগুলো, তাদের সঙ্গে কি এই মেয়েটির ভালোবাসা, তাদের অনাগত সন্তানের মুছে যাওয়াও যোগ নেই?

কিন্তু তারপর? তারপর সে নিজেও কি আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে? আইন মেনে চলা, বাধ্য নাগরিকের মতো নির্বিকারভাবে জীবন যাপন করতে পারবে? এই মৃত্যুর মিছিলের পেছনে ওর নিজের অবদানও কি নেই? পরোক্ষ ভাবে সে-ও তো দায়ী ওকে এই পথে ঠেলে দিতে। সেও এই মৃত্যুগুলোর শরিক। পুলিস প্রোটোকলে ধরা পড়ে না ঠিকই, কিন্তু বিবেক কী বলে? আজীবন তাকে এর দংশন, কৃতকর্মের ফল বয়ে বেড়াতে হবে।

শান্তির পথ খুঁজছে এই দোনামনায়। কী করবে বুঝতে না পেরে আকাশের দিকে তাকাল। মেঘের আড়াল থেকে সদ্য উঁকি মারা চাঁদ অন্তরের ঝড়ে, অনুভূতির প্রহেলিকায়, সুপ্ত চেতনায় দীক্ষিত করছে। নিশ্চুপ বসে সেই অনুভূতি দিশা খুঁজে পেয়েছে চেতনার নতুন চন্দ্রালোকে।

বারান্দার দরজা লাগিয়ে লাউঞ্জে এল। ডিলিট করে দিল সমস্ত রেকর্ডিং। বুঝতে পারল তাকে ফেরত যেতে হবে স্বাভাবিক জীবনে। আবারও অমৃতার গানের আসরে শ্রোতা হয়ে।

জানত না জীবন কত দিক দিয়েই শেকল বন্দি।

জীবন এইরকম।

এইরকমই।

এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা, চরিত্র এবং সংঘাতই
কাল্পনিক। বাস্তবে কারো সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে মিলে গেলে
তা নিছকই সমাপতন হিসাবে ধরে নিতে হবে।
শ্রদ্ধেয় পাঠকের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ,বাস্তবে এই উপন্যাসের
কিছুই প্রয়োগ না করাই ভালো। প্রয়োগের ফলে ঘটা কোনো
দুর্বিপাকের জন্যে লেখক দায়ী নন।